সাহিত্যানুশীলন

উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য সংকলন

বাংলা ক । দ্বাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

সেমিস্টার-III

আদরিণী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়র উকিল কুঞ্জবিহারীবাবু বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট আসিয়া বলিলেন—''মুখুজ্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ি থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধুমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে, কলকাতা থেকে খেমটা আসছে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি?''

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন— ''কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এস্টেটের বাঁধা মোক্তার?— আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর?''

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইঁহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে, বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মতো কোমল, ইহা যে তাঁহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সে-ই জানিয়াছে। উকিলবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—''না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুজ্যে মশায়? আমরা কি সে ভাবে বলছি? এ জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়— আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য এই ছিল যে, আপনি সে দিন পীরগঞ্জে যাবেন কি?''

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন—''ভায়ারা, বোস।''—বলিয়া সমুখস্থ আর একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিলেন।— উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন—''পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারি কামাই হয়। অথচ না গেলে তারা ভারি মনে দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ?''

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—''যাবার তো খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া তো সোজা নয়। ঘোড়ার গাড়ির পথ নেই। গোরুর গাড়ি করে যেতে হলে, যেতে দুদিন আসতে দুদিন। পালকি করে যাওয়া—সেও জোগাড় হওয়া মুশকিল। আমরা দুজনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুজ্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ি থেকে একটা হাতি-টাতি আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দুজনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতিতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।''

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন—"এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র তো আমার আজকের মক্কেল নন—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যে নাগাদ হাতি এসে যাবে এখন।"

কুঞ্জবাবু বলিলেন—"দেখলে হে ডাক্তার, আমি তো বলেইছিলাম—অত ভাবছ কেন, মুখুজ্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুজ্যে মশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে ছাড়ছিনে।"

"যাব বইকি ভায়া—আমিও যাব। তবে আমার ত ভাই খেমটা শোনবার বয়স নেই—তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পগ্‌গ বেঁধে, একটি থেলো হুঁকো হাতে করে, লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে কে না খেলে দেখব—তদারক করে বেড়াব। আর তোমরা বসে শুনবে— 'পেয়ালা মুঝে ভর দে'—কেমন?" —বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতে আহ্নিক পূজাটা মুখুজ্যে মহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা সমাপন করিয়া জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতির কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, "প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিতজনপ্রতিপালকেষু" পাঠ লিখিয়া, দুই তিনদিনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্বেও আবশ্যক হইলে তিনি কতবার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে। মানুষটি লম্বা ছাঁদের— রঙটি আর একটু পরিষ্কার হইলেই গৌরবর্ণ বলা যাইতে পারিত। গোঁপগুলি মোটা মোটা—কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত। মাথার সম্মুখভাগে টাক আছে। চক্ষু দুইটি বড় বড়, ভাসা ভাসা। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যেন হৃদয় ছাপাইয়া, এই চক্ষু দুইটি দিয়া উছলিয়া পড়িতেছে।

ইঁহার আদিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মোক্তারী করিতে আসেন, তখন এদিকে রেল খোলে নাই। পদ্মা পার হইয়া কতক নৌকাপথে, কতক গোরুর গাড়িতে, কতক পদব্রজে আসিতে হইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটি ছিল। সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইয়া মোক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। এখন সেই জয়রাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালান কোঠা করিয়াছেন, বাগান করিয়াছেন, পুকুর কিনিয়াছেন, অনেকগুলি কোম্পানির কাগজও কিনিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এ জেলায় ইংরাজিওয়ালা মোক্তারের আবির্ভাব হইয়াছে বটে— কিন্তু জয়রাম মুখুজ্যেকে তাহারা কেহই হটাইতে পারে নাই। তখনও ইনি এ জেলার প্রধান মোক্তার বলিয়া গণ্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ? যৌবনকালে ইনি রীতিমতো বদরাগী ছিলেন—এখন রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। সেকালে, হাকিমেরা একটু অবিচার অত্যাচার করিলেই মুখুজ্যে মহাশয় রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিতেন। একদিন এজলাসে এক ডেপুটির সহিত ইঁহার বিলক্ষণ বচসা হইয়া যায়। বিকালে বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মঙ্গলা গাই একটি এঁড়ে বাছুর প্রসব করিয়াছে। তখন আদর করিয়া উক্ত ডেপুটিবাবুর নামে বাছুরটির নামকরণ করিলেন। ডেপুটিবাবু লোক পরম্পরায় ক্রমে একথা শুনিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য, নিতান্ত প্রীতিলাভ করেন নাই। আর একবার, এক ডেপুটির সম্মুখে মুখুজ্যে মহাশয় আইনের তর্ক করিতেছিলেন, কিন্তু হাকিম কিছুতেই ইঁহার কথায় সায় দিতেছিলেন না। অবশেষে রাগের মাথায় জয়রাম বলিয়া বসিলেন—''আমার স্ত্রীর যতটুকু আইন-জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নেই দেখছি।'' সেদিন আদালত-অবমাননার জন্য মোক্তার মহাশয়ের পাঁচটাকা জরিমানা হইয়াছিল। এই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট অবধি লড়িয়াছিলেন। সর্বসুদ্ধ ১৭০০ টাকা ব্যয় করিয়া এই পাঁচটা টাকা জরিমানা হুকুম রহিত করিয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জন করিতেন, তেমনি তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, গরীব লোকের মোকর্দমা তিনি কত সময় বিনা ফিসে, এমন কি নিজে অর্থব্যয় পর্যন্ত করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্নকালে পাড়ার যুবক-বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয়ের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাস পাশা খেলিয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছেন—পূর্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকিলবাবুও আছেন। হাতিকে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিস্কৃত করা হইতেছে, হাতি রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাসুদ্ধ কয়েকটা কলাগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে,—মোক্তার মহাশয় সে সমস্ত তদারক করিতেছেন। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় আসিয়া, কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই চারি টান দিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে জয়রাম, বৈঠকখানায় বসিয়া পাশাখেলা দেখিতেছিলেন। এমন সময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল— ''হাতি পাওয়া গেল না।''

কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—''অ্যা!—পাওয়া গেল না?''

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—''তাই তো! সব মাটি?''

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—''কেন রে, হাতি পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস?''

ভৃত্য বলিল— ''আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বললেন, বিয়ের নেমতন্ন হয়েছে তার জন্যে হাতি কেন? গোরুর গাড়িতে আসতে বোলো।''

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিতস্বরে, ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—"হাতি দিলে না! হাতি দিলে না!"

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"তার আর কি করবেন মুখুজ্যে মশায়! পরের জিনিস, জোর তো নেই। একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে রাত্রি দশটা এগারোটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন। ঐ ইমামদ্দি শেখ একজোড়া নূতন বলদ কিনে এনেছে—খুব দ্রুত যায়।"

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন—"না। গোরুর গাড়িতে চড়ে আমি যাব না। যদি হাতি চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নইলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিনজন জমিদারের হস্তী ছিল। সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়া দিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মাদী-হাতি আছে—এখনও বাচ্চা। বিক্রি করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত?"

"দুই হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্চা?"

"না, সওয়ারি নিতে পারবে।"

"কুছ পরওয়া নেই। তাই কিনব। এখনই তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতি আসে। লাহিড়ি মশায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতির সঙ্গে যেন কোন বিশ্বাসী কর্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতি দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।"

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্মচারী রীতিমত স্ট্যাম্প-কাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়িতে হাতি আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই একজন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল—"হাতি, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ির বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুজ্যে মহাশয় বিপত্নীক—তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটীতে জল লইয়া সভয় পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই

জল একটু একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দূরে তাহার ললাট রাঙা করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে, রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।—

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে হস্তী প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরেরও অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকর্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—''মুখুজ্যেমশায়, ও হাতিটি কার?''

মুখুজ্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন—''আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতি।''

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—''আমার হাতি। কই ও-হাতি তো কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?''

''আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।''

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন—''আপনি কিনেছেন?''

''আজ্ঞে হ্যাঁ।''

''তবে বললেন আমার হাতি?''

বিনয় কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন—''যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি—আমিই যখন আপনার—তখন ও-হাতি আপনার বই আর কার?'' সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েকদিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে—এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

নূতন নিয়মে পাশ করা শিক্ষিত মোক্তারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। শিথিল নিয়মের আইন-ব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে ক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্বে যত উপার্জন করিতেন এখন তাহার অর্ধেক হয় কিনা সন্দেহ। অথচ ব্যয় প্রতি বৎসর বর্ধিতই হইতেছে। তাঁহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ—বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কর্ম করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে—সেটি যদি কালক্রমে মানুষ হয় এইমাত্র ভরসা।

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আর সে অনুরাগ নাই—বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তারগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া (মুখোপাধ্যায় পাগড়ি বাঁধিতেন, সেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহার করিতেন না।) তাঁহার প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া ফর ফর করিয়া ইংরাজিতে হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পার্শ্বস্থিত ইংরাজি জানা জুনিয়রকে জিজ্ঞাসা করেন,—''উনি কি বলছেন?''—জুনিয়র তর্জ্জমা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে অন্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের জবাব মুখেই রহিয়া যায়—নিষ্ফল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা ছাড়া, পূর্বে হাকিমগণ মুখুজ্যে মহাশয়কে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকার নব্য হাকিমগণ আর তাহা করেন না। ইঁহাদের যেন বিশ্বাস, যে ইংরাজি জানে না, সে মনুষ্যপদবাচ্যই নহে। এই সকল কারণে স্থির করিয়াছেন, কর্ম হইতে এখন অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে কোনও রকমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবেন। প্রায় ষাট বৎসর বয়স হইল—চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি যদি মানুষ হইত—দুই টাকা যদি রোজগার করিতে পারিত—তাহা হইলে এতদিন কোন কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়িতে বসিয়া হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশি দিন চলে না। তথাপি আজি কালি করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল।

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকর্দমা উপস্থিত হইল। সেই মোকর্দমার আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। একজন নূতন ইংরাজ জজ আসিয়াছেন-তাঁহারই এজলাসে বিচার।— তিনদিন যাবৎ মোকর্দমা চলিল। অবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া 'জজসাহেব বাহাদুর ও এসেসার মহোদয়গণ' বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতাশেষে এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিলেন—জজসাহেবও তাঁহাদের অভিমত স্বীকার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিলেন।

জজসাহেবকে সেলাম করিয়া, মোক্তার মহাশয় নিজ কাগজপত্র বাঁধিতেছেন, এমন সময় জজসাহেব পেশকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—''এ উকিলটির নাম কি।''

পেশকার বলিল—''উঁহার নাম জয়রাম মুখার্জি। উনি উকিল নহেন, মোক্তার।''

প্রসন্নহাস্যের সহিত জজসাহেব জয়রামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—''আপনি মোক্তার?''

জয়রাম বলিলেন—''হ্যাঁ হুজুর, আমি আপনার তাঁবেদার।''

জজসাহেব পূর্ববৎ বলিলেন—''আপনি মোক্তার! আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি উকিল। যে রূপ দক্ষতার সহিত আপনি মোকর্দমা চালাইয়াছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি এখানকার একজন ভাল উকিল।''

এই কথাগুলি শুনিয়া মুখোপাধ্যায়ের সেই ডাগর চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। হাত দুটি জোড় করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—''না হুজুর; আমি উকিল নহি—আমি একজন মোক্তার মাত্র। তাও সেকালের শিথিল নিয়মের একজন মূর্খ মোক্তার। ইংরাজি জানি না হুজুর। আপনি আজ আমার যে প্রশংসা করিলেন আমি জীবনের শেষ দিন অবধি তাহা ভুলিতে পারিব না। এই বুড়া ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিতেছে, হুজুর হাইকোর্টের জজ হউন্।''

বলিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া মোক্তার মহাশয় এজলাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ইহার পর আর তিনি কাছারি যান নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্যবসায় ছাড়িয়া কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। ব্যয় যে পরিমাণ সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া ওঠে না। সুদের সঙ্কুলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানির কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত আদরিণীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইঁহাকে বলিতেছিল—''হাতিটি আর কেন, ওকে বিক্রি করে ফেলুন। মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেঁচে যাবে।'' কিন্তু মুখুজ্যে মহাশয় উত্তর করিয়া থাকেন—''তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিনাতিনীদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রি করে ফেল।'' —এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতিটাকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তো কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন: —

হস্তী ভাড়ার বিজ্ঞাপন

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া যাইবে। ভাড়া প্রতি রোজ ৩ টাকা মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১ টাকা এবং মাহুতের খোরাকী।।০ একুনে ৪।।০ ধার্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) চৌধুরীপাড়া

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, শহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোস্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপনের ফলে মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে—কিন্তু তাহাতে ১৫।২০ টাকার বেশি আয় হইল না।— মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার-খরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ প্রতিদিন ৫। ৭ টাকার কমে নির্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল।— বড়বধূ মেজবধূ উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস পরেই আর দুইটি জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে।

এদিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদাপর্ণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। নানাস্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে, কিন্তু ঘর-বর মনের মতন হয় না। যদি ঘর-বর মনের মতন হইল, তবে তাহাদের খাঁই শুনিয়া চক্ষুস্থির হইয়া যায়। কন্যার পিতা এসম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া, তাশ পাশা খেলিয়া, ফুলুট বাজাইয়া বেড়াইতেছে। যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে।— অবশেষে একস্থানে বিবাহের স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল.এ. পড়িতেছে, খাইবার পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা চাহে; নিজেদের খরচ পাঁচ শত—আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়।

কোম্পানির কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে— তাহা হইতে আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর, শুধু তো একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে? —এই সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠপুত্রটি বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল, সে-ও ফেল করিয়াছে।— বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন— ''মুখুজ্যে মহাশয়, হাতিটিকে বিক্রি করে ফেলুন—করে নাতনির বিবাহ দিন। কি করবেন বলুন। অবস্থা বুঝে তো কাজ করতে হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।''

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন না। মাটির পানে চাহিয়া ম্লানমুখে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু বাছুর ঘোড়া হাতি উট বিক্রয়ার্থে আসে। বন্ধুগণ বলিলেন—''হাতিটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন, বিক্রি হয়ে যাবে এখন। দু'হাজার কিনেছিলেন, এখন হাতি বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।''

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—''কি করে তোমরা এমন কথা বলছ?''

বন্ধুরা বুঝাইলেন—''আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মতো। তা মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুড়বাড়ি চলে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে, মায়া হয়ে গেছে, একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রি করলেই হয়। যে বেশ আদর যত্নে রাখবে, কোনও কষ্ট দেবে না— এমন লোককে বিক্রি করবেন।''

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন—''তোমরা সবাই যখন বলছ তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন ভালো খদ্দের ঠিক কর—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।''—মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনের দিন পূর্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি-পাঁচ দিনই জমজমাট বেশি। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্বে হস্তী ভোজন করিতেছে। বাটীর মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেত্রে বাগানে হস্তীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলী খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়ালেন। শেষে তাহার গলায় নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—''আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এসো।''—প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে, এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভকার্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয়পক্ষের আশীর্বাদ হইবে। হস্তী-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হইবে।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্ মস্ করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিক্রয় হয় নাই—উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়িতে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপই মনে হইতে লাগিল।

বাড়ির লোকে বলিতে লাগিল—''আহা, আদর রোগা হয়েছে। বোধ হয় এ ক'দিন সেখানে ভাল করে খেতে পায়নি। ওকে দিনকতক এখন বেশ করে খাওয়াতে হবে।''

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভালো হাতির খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। একজন বলিলেন—''ঐ যে আবার মুখুজ্যে মশায় বললেন 'আদর যাও মা, মেলা দেখে এসো'

তাই বিক্রি হল না। উনি তো আর আজকালকার মুর্গীখোর ব্রাহ্মণ নন! ওঁর মুখ দিয়ে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে সে কথা কি নিষ্ফল হবার যো আছে! কথায় বলে— ব্রহ্মবাক্য বেদবাক্য।”

বামুনহাটের মেলা ভাঙিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে বিক্রয় হয় নাই—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল— ‘‘দাদামহাশয় আদর যাবার সময় কাঁদছিল।”

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—‘‘কি বললি? কাঁদছিল?”

‘‘হ্যাঁ দাদামশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্ ট্প করে জল পড়তে লাগল।”

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—‘‘জানতে পেরেছে। ওরা অন্তর্যামী কিনা। ও বাড়িতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।”

নাতনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—‘‘যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর করে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস নি? —খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর, তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ি গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব—রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব? মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোন অভিমান করিসনে মা।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন বিকালে একটি চাষীলোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দিল।

পত্রপাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যমপুত্র লিখিয়াছে—‘‘বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বিকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আম বাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি চিকিৎসা করিয়াছে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায় তবে তাহার

শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য নিকটেই একটু জমি বন্দোবস্ত লইতে হইবে। সুতরাং কর্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা আবশ্যক।”

বাড়ির মধ্যে গিয়া উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—‘‘আমার গাড়ির বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরি করতে পারব না।” তখনই ঘোড়ার গাড়ির বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধুরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময় গাড়ি ছাড়িল। জ্যেষ্ঠপুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাষী লোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতরে পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিস্পন্দ।—বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—‘‘অভিমান করে চলে গেলি মা ? তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম বলে—তুই অভিমান করে চলে গেলি ?”

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ - ৫ই এপ্রিল, ১৯৩২) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথা সাহিত্যিক, ছোটগল্পকার ও উপন্যাসিক। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্ধমান জেলার, ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স, পাটনা কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন। তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়তে বিলেত যান এবং ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ‘ভারতী’ পত্রিকায় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। পরে গদ্য রচনায় হাত দেন। শ্রীমতী ‘রাধামনি দেবী’ ছদ্মনামে লিখে কুন্তলীন পুবস্কার লাভ করেন। রমাসুন্দরী, ‘নবীন সন্ন্যাসী’, ‘রত্নদ্বীপ’, ‘জীবনের মূল্য’, ‘প্রতিমা’ প্রভৃতি উপন্যাস এর পাশাপাশি ‘নবকথা’, ‘ষোড়শী’, ‘গল্পাঞ্জলি’, ‘গল্পবীথি’ প্রভৃতি গল্পসংকলনগুলি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। সরল ও অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখক হিসাবে প্রভাতকুমার সমধিক প্রসিদ্ধ। বিচিত্রমুখি গল্পের জন্য তিনি বাংলার মোপাসাঁ নামে খ্যাত। ‘আদরিণী’ গল্পটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘গল্প সমগ্র’ দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নেওয়া।

ধর্ম

শ্রীজাত

আবদুল করিম খাঁ-র ধর্ম ছিল গান।
আইনস্টাইনের ধর্ম দিগন্ত পেরনো।
কবীরের ধর্ম ছিল সত্যের বয়ান।
বাতাসের ধর্ম শুধু না-থামা কখনও।

ভ্যান গঘের ধর্ম ছিল উন্মাদনা। আঁকা।
গার্সিয়া লোরকা-র ধর্ম কবিতার জিত।
লেনিনের ধর্ম ছিল নতুন পতাকা।
আগুনের ধর্ম আজও ভস্মের চরিত।

এত এত ধর্ম কিন্তু একই গ্রহে থাকে।
এ-ওকে, সে-তাকে আরও জায়গা করে দেয়।
তবে কেন অন্য পথ ভাবায় তোমাকে?
তোমার ধর্মের পথে কেন অপব্যয়?

যে তোমাকে শিখিয়েছে দখলের কথা—
জেনো সে ধর্মই নয়। প্রাতিষ্ঠানিকতা।

শ্রীজাত : ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি শ্রীজাত নামেই অধিক পরিচিত, বর্তমান সময়ের এক অসামান্য কবি ও গীতিকার। তিনি ২০০৪ সালে তার ‘উড়ন্ত সব জোকার’ কবিতার বই-এর জন্য আনন্দ পুরস্কার পান। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল ‘শেষ চিঠি’ (১৯৯৯), ‘দু-চার কথা’ (২০০০), ‘অনুভব করেছি তাই বলছি’ (২০০১), ‘বর্ষামঙ্গল’ (২০০৬), ‘কিছু কবিতা’ (২০১১), ‘কর্কটক্রান্তির দেশ’ (২০১৪), ‘অন্ধকার লেখাগুচ্ছ’ (২০১৫), ‘লিমেরিক’ (২০১৮) ইত্যাদি। তিনি কবিতা লেখার পাশাপাশি চলচ্চিত্রের জন্য বহু গান রচনা করেছেন। এটি ‘অন্ধকার লেখাগুচ্ছ’ কাব্যগ্রন্থের ১৪ সংখ্যক কবিতা।

দিগ্বিজয়ের রূপকথা

নবনীতা দেবসেন

রক্তে আমি রাজপুত্র। হলেনই বা দুঃখিনী জননী,
দিগ্বিজয়ে যেতে হবে। দুয়োরানী দিলেন সাজিয়ে।
কবচকুণ্ডল নেই, ধনুক, তূণীর, শিরস্ত্রাণ
কিছুই ছিল না। শুধু আশীর্বাদী দুটি সরঞ্জাম।

এক : এই জাদু-অশ্ব। মরুপথে সেই হয় উট,
আকাশে পুষ্পক আর সপ্তডিঙ্গা সাজে সিন্ধুজলে,
তেপান্তরে পক্ষীরাজ। তার নাম রেখেছি : 'বিশ্বাস।'
দুই : এই হৃদয়ের খাপে ভরা মন্ত্রপূতঃ অসি
শাণিত ইস্পাত খণ্ড। অভঙ্গুর। নাম : 'ভালোবাসা।'

নিশ্চিত পৌঁছুবো সেই তৃষ্ণাহর খর্জুরের দ্বীপে।।

নবনীতা দেবসেন : (১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩৮ - ৭ই নভেম্বর, ২০১৯) ছিলেন বিখ্যাত কবি, লেখক এবং শিক্ষাবিদ। তিনি দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কে বাবা-মা'র 'ভালোবাসা' গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নরেন্দ্র দেব ও মাতা রাধারাণী দেবী — সে যুগের বিশিষ্ট কবি দম্পতি। তিনি গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস, লেডি ব্রেবোর্ন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর, হার্ভাড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯-এ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়' প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬-এ প্রথম উপন্যাস 'আমি অনুপম' প্রকাশ পায়। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি উপন্যাস মিলে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আটত্রিশ। ২০০০ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে তিনি ভূষিত হন। এই কবিতাটি 'নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে নেওয়া।

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

[১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারি আমেরিকা-হইতে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে স্বামীজী যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত]

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যারা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভুতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর— সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা— সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক-চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,— লক্ষণ।

যদি বল-ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সে কথা হচ্ছে না— কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হ'য়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ,

সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরেমতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ— আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম— দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে,— 'রাজা আসীৎ'!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা ক'রে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে— তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল— ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন— সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ : (১২ই জানুয়ারি ১৮৬৩ - ৪ঠা জুলাই ১৯০২) কলকাতার শিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত - বিখ্যাত আটর্নি, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। শৈশবে তাঁর ডাক নাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে বি.এ. পাশ করেন। পিতার অকাল মৃত্যুর পর সাংসারিক দায়দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। তিনি শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীতে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি মানবসেবায় দীক্ষা নেন। ঠাকুরের মৃত্যুর পর তিনি পরিব্রাজক রূপে সারাভারত ভ্রমণ করেন। তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ঐ সভায় হিন্দু ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে ভারতকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল — 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি। তিনি উদ্বোধন, মাসিক বসুমতী ইত্যাদি পত্রিকায় লিখেছেন। তিনি 'রামকৃষ্ণ মিশন' (১৮৯৭) এবং 'বেলুড় মঠ' (১৮৯৯) প্রতিষ্ঠা করেন।

পোটরাজ

শঙ্কররাও খারাট

গ্রামের পোটরাজ দামার বাড়ির আবহাওয়া ভারী। সমস্ত জায়গায় কেবল লোকেরা হাঁটুর উপর মাথা রেখে ব'সে। দামার বৌয়ের চোখ জল ভরা। থেকে-থেকেই সে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। পাড়ার বৌ-ঝিরা আসছে, একটুক্ষণ থেকেই চ'লে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝেই কেউ-না কেউ এসে দোরে দাঁড়াচ্ছে।

লোকে এসে শুধোচ্ছে, 'দুরপত, পোটরাজ কেমন আছে?'

'এখনও প্রাণটুকু আছে খালি, বাবা।' করুণ মুখে জবাব দিচ্ছে সে।

'ভেবো না, ভালো হ'য়ে যাবে, ভালো হ'য়ে যাবে। কাঁদছো কেন? সারা গাঁয়ে একই অবস্থা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই একজন অন্তত বিছানায়।'

'জানি, বাবা। তাও ভয় লাগে।'

'দুরপত, কারু যাওয়ার সময় হ'লেই সে যাবে। আর যার সময় হয়নি, যা-ই রোগ হোক-না কেন, সে টিকে যাবে।'

'জানি বাবা। ঠিক। কিন্তু বড়ো কঠিন রোগ।'

'কেউ না বলেছে? এখন ঠাকুরের মুখে চাওয়ার সময়। হয়তো এবার মা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর কাছে সক্কলে সমান।'

ঠিক এইসময়ে বাড়ির সামনের নিমগাছে একটা কাক চেঁচিয়ে ওঠে। দুরপত বলে, 'এই বাচ্চারা! মার বেজন্মাকে। পোটরাজকে ডাকে রে।'

কাকটা ডেকেই চলে। দুরপতের ছেলে তার দিকে ঢিল ছোড়ে। ডাকতে-ডাকতেই কাকটা উড়ে পালায়।

'সবসময় বেজন্মাটা আমাদের শাপমণ্যি করছে।' দুরপত গজগজ করে আপনমনে।

এ হ'লো আষাঢ় মাস। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। সমানে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। মাটি কাদায় আঠাল হ'য়ে এলো। গুমোট। গাছের পাতা একটুও নড়ছে না, স্থির। তা থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরছে।

দামার বাড়ির দরজায় একটা কুকুর টানা চীৎকার জুড়ে দিলে। শুনে দুরপতের প্রাণ শুকোয়। সেই আওয়াজের উপর দিয়ে সে চ্যাঁচায়, 'হে ভগবান, গোর দেয় না কেন কেউ কুত্তাটাকে।'

'ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতের কথা বলছে গো।' দুরপতের পাশে বসা বৌটি বলে। তখন দুরপতের অন্য পাশে বসা বঞ্চলা বলে, 'দুরপা, মারী-আই-এর যাত্রায় গিয়েছিলি তো?'

'যেতে ভুলি কী ক'রে?'

'তা বলিনি। ভাবলাম এই বিপদের সময়ে যদি ভুলে গিয়ে থাকিস?'

'না, মেয়ে, মা যদি নিদয়াও হন তাঁকে তো কিছু দিতেই হবে।'

'ছাড়্ তো। হঠাৎ কথাটা মাথায় এলো ব'লে বললাম।'

'সব দেবতার মধ্যে ওঁরে তুচ্ছি করি সাধ্যি কী। ওঁরে কেউ হেলা করেছে কি টেরটি পেয়েছে। ক্রোধ তেনার বন্ননার বাইরে। ওঁরে তুষ্ট রেখে ভালো করেছিস। এবার সে ভালো হ'য়ে যাবে।'

মেয়েটি দুরপতের মুখে তাকিয়ে যোগ করে, 'এই দ্যাখো, কাঁদিস কেন? কাঁদলে অমঙ্গল হয়। দুরপা, তোর সোয়ামির কিছু হবে না রে। মা ওকে দেখবেন।'

'সে তো বটেই। ওর বাপ-মা মায়ের কাছে মানত করেছিলো ওকে। সে-জন্যেই তো ও পোটরাজ।'

বঞ্চলাবাঈ বলে, 'তা'হলে? এই তো বুঝেছো। দামা হ'লো গিয়ে মায়ের পোটরাজ। তাঁর ভক্ত। নিত্যি তাঁর পুজো করে। মা কি তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন না? তাঁর রোষে সে পড়ে কী ক'রে? ব্যাপারটা কী? উনি কি দেখতে পান না এ-ঘরে ছোটো ছেলেপিলেরা রয়েছে?' দুরপা বলতে শুরু করে, 'এ-সব কথাই মনে জেগেছে গো। হে মা, তোমার রোষে পড়লাম কেন? এ-বাড়িতে ঢোকা ইস্তক মঙ্গলবারে শুক্কুরবারে তোমার নামে উপুশ করেছি। হে মা, বছর-বছর তোমার যাত্রা করি। তোমায় দুধে, দই-এ চান করাই। সবুজ শাড়ি পরাই। কপালে হলুদ, কুমকুম দিই। তোমার সুমুখে ভোগ দিই, নারকেল দিই। প্রতি আষাঢ়ে অমাবস্যায় তোমার সামনে স্নানের পর ভেজা শাড়িতে গড়ান দিই। বছর-বছর যেমন পারি তোমায় দিই। ছাগল দিতে না-পারলে কুঁকড়ো দিই। তোমার দোরে রক্তের ছড়া দিই।

'মা, এ-বাড়িতে যেদিন থেকে বৌ হ'য়ে এসেছি তোমার সামনে পিদিম দিয়েছি। কখনো তোমায় আঁধারে রেখেছি, বলো মা? তোমারে এত ভক্তি করি তবু আমার কপালে এমন কেন মা?'

'মা, তোমার লিলে বুঝি না।'

দুরপত ব'লেই চলে, ব'লেই চলে। তার গলায় আর্তি। শেষে মারী-আই-এর মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে হাত জোড় ক'রে সে প্রার্থনা করে।

'দেবী, আমি কি কোনো ভুল করেছি? কী ভুল করেছি? ভুল ক'রে থাকলে শাস্তি দাও। কিন্তু আমার সোয়ামিকে বাঁচাও। তার হাগা বমি বন্ধ ক'রে তাকে ভালো করো মা।'

আবহাওয়া থমথমে। গাঁয়ের সর্বত্র কান্না আর চীৎকারের আওয়াজ। আর দুরপতের বাড়ির বাইরের নিমগাছে ব'সে একটা কাক ডাকছে।

শুনে তার হাত-পা স্থির।

রাতে একটা ফেউ বাড়ির চাদ্দিকে চক্কর দিতে-দিতে তীক্ষ্ণ চীৎকারে অন্ধকারকে চেরে। আর দুরপতের বুকের ধুকধুকি পলকের জন্য থমকায়।

তারপর নতুন দিন হয়।

আকাশে মেঘ ঘন ক'রে আসে। চাদ্দিক অন্ধকার, খাঁ-খাঁ লাগে। সমানে বিষ্টি পড়ছে। সূর্য উঁচু হ'য়ে যায়, কিন্তু মেঘের জন্য চোখে পড়ে না। এমন সময় গাঁয়ের মোড়ল আর তার চেলা দুয়ারে আসে। চেঁচিয়ে বলে, 'দামা, বাড়ি আছো নাকি, দামা?'

পোটরাজের বাড়ির ভিতর থেকে কোনো জবার আসে না। এমনকি ফিশ-ফিশানিও না। তাতে মোড়ল গলা চড়ায়, 'ওহে দামা, পোটরাজ বাড়ি আছে?' শেষ পর্যন্ত কেউ-একজন উকি মারে এবং লোক চারজনকে দেখে বলে, 'গ্রামমণ্ডলের লোকেরা এয়েছে গো।'

বঞ্জলাবাঈ বলে, 'সে তো সত্যি। পোটরাজ কেমন আছে দেখতে লোকে তো আসবেই। তিনদিন হ'য়ে গেলো পোটরাজ রোঁদে বেরোয় না।'

'তাছাড়া প্রায় সব বাড়িতেই একজন ক'রে বিছানায়।'

'কে যে কাকে বলে।'

'কে কী বলবে। কেই জানে না আজ তার কপালে কী ঘটবে।'

'তা ঠিক। তাও সবাই অন্যকে জিগেশ করে।'

'ভুলো না, দামা গাঁয়ের পোটরাজ। আর এখন যখন মা খেল শুরু করেছেন যে-ই তাঁর সামনে পড়বে সে-ই তাঁর কোপে পড়বে। তাই এই দোরে লোককে আসতে হবেই।' মেয়েরা যখন কথা বলছিলো দুরপত দরজার কাছে গেলো। বাইরে আসতে-আসতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো দুরপত। মোড়ল-এর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'পেন্নাম হই।'

তার অবস্থা দেখে মোড়ল শুধোলে, 'দামা কোথায় এ-কদিন?'

'ঘরে বিছানায়।'

'বিছানায়? কেন?

'মায়ের দয়া।' বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফ্যালে। মুখ ঢাকে সে।

'বলো কী, মা নিজের ভক্তকেই হেনেছেন?' মোড়ল অবাক হয়।

আরেকজন বলে, 'নয় কেন? মানুষ তো সে।'

'তা ঠিক, কিন্তু তার সকাল-সাঁঝ মায়ের ছায়ায় বসবাস।'

'কিন্তু দেবীর চক্কর যখন শুরু হয়েছে কে যে কোপে পড়বে আর কে পড়বে না তার ঠিক নেই।'

'তা ঠিক,' মোড়ল বলে। তারপর দুরপতের দিকে ঘুরে তাকায়, 'দুরপত, আমাদের আরেকবার যাত্রা করতেই হবে।'

'হ্যাঁ। করতেই হবে। মাকে খুশি করতেই হবে।' কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে বলে দুরপত।

'কিন্তু আমাদের সেবাইৎকে না-হ'লে যাত্রা করা যাবে কী ক'রে?'

'ঠিক, কিন্তু মরদটা আমার প'ড়ে আছে যে।'

'দুরপত, মাকে গাঁয়ের সীমানায় নিয়ে যেতে হবেই।'

'ঠিক। না-হ'লে মার চক্কর গাঁয়ের উপর থেকে কাটবে না।' আরেকজন যোগ করে। 'তাই দেবীকে মিছিল ক'রে গাঁয়ের সীমানার বাইরে রেখে আসতে হবে তো।'

'জানি, কিন্তু পোটরাজ যে বিছানায় প'ড়ে আছে। কী ক'রে করবে?'

মোড়ল এই কথা বলতে দুরপত বললে, 'যদি শুধু পোটরাজ বিছানায় প'ড়ে থাকে সারা গাঁ ''যাত্রা''য় যাবে না কেন?'

'তা কী ক'রে হয়? সে হ'লো দেবীর পোটরাজ। তাকে ছাড়া ''যাত্রা'' হবে কী ক'রে?'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সে তো উঠতেই পারছে না। নড়তেই পারছে না।'

দুরপত এই কথা বলতে গাঁওবুড়োরা নিজেদের মধ্যে শলায় লাগলো। হঠাৎ মোড়লের মাথায় একটা কথা খেললো, 'আরে! তোর বড়ো ছেলে তো বাড়িতেই আছে, আছে না?'

'ওই হাইস্কুলে পড়ছে এখন যে-ছেলেটা? হ্যাঁ, আছে।'

'ওর কথাই বলছি।'

'হ্যাঁ, বাড়িতেই ব'সে আছে।'

'তা ওর বাবার জায়গায় ও যদি ''যাত্রা''টা করে তো ক্ষতি কী!'

'অতটুকু বাচ্চা পারবে কী? ওকে কি এখনই পোটরাজ বলা যায়?'

'পোটরাজ যদি নাও হয় এখন ওকেই পোটরাজ ব'লে ধরতে হবে। ওর বাবা না-থাকলে তোর বাড়িতে তো একজন পোটরাজ থাকতে হবেই।'

'তা তো হবেই। কিন্তু শুধু বাক্যিতে কি পোটরাজ হয়। তার জন্য দরকার ''যাত্রা'' করা। তাছাড়া দেবীর কাছে কিছু-একটা মানত করাও দরকার।'

'করুক-না ও, কী এসে-যায়! তাছাড়া গাঁয়ের জন্যে একজন পোটরাজ তো দরকারই।'

দুরপতের বড়ো ছেলে আনন্দ সব কথাই শুনতে পেলে। সে যতই শোনে ততই ঘামে। বাকিটা জীবন দেবীকে পিঠে ক'রে ব'য়ে বেড়াতে হবে ভাবতেই তার রাগ হ'তে থাকলো। নিঃশ্বাস ঘন হ'য়ে এলো। বুকের ওঠাপড়া দ্রুত হ'লো।

ইতিমধ্যে মোড়লের সঙ্গে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে একটা লোক সবজান্তার মতো ব'লে উঠলো, 'ও রাজি না-হ'লে গোটা গাঁ-টাই মায়ের কোপে পড়বে।'

'হ'তে পারে, কিন্তু একবার পোটরাজ হ'লে সারা জীবনই তো ওকে পোটরাজ থেকে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, তো সে খারাপ কী? ভালোই তো।'

'তোমরা বলছো! ছেলে আমার হাইস্কুলে ইংরেজি পড়ছে।'

'তো? পোটরাজ হ'লে স্কুল কি পালিয়ে যাবে?'

'তুমি তা বললে কী হবে, কিন্তু ওর কেমন লাগে, তা তো ভাবতে হবে।'

'বাঃ, কেবল ছেলের কথাই ভাবছিস, বাকি গাঁ-টার কী হবে?'

'দু'জনের কথাই ভাবতে হবে।'

হঠাৎ মোড়লের সঙ্গে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে একজন একরোখা গোছের লোক কর্কশভাবে ব'লে উঠলো, 'ছাড়্ তো, ওকে পোটরাজের পোশাক পড়িয়ে পাঠাচ্ছিস কি না? হ্যাঁ, না, না? গাঁয়ের ধারে মিছিল নিয়ে যেতেই হবে!' এই ধমকানোর সুর শুনে আনন্দ রাগে কাঁপতে শুরু করলে। লাফিয়ে উঠে সে হাত মুঠি করলে। রাগে তার চোখ ঠেলে বেরুচ্ছে। দুরপত ঠিক সেই সময় জবাব দিলে, 'এ-র'ম কথায় মায়ের রাগ কি পড়বে?'

মোড়ল দুরপতকে বলে, 'কথা ঘোরাস না। কাজের কথা বল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বল হ্যাঁ কি না?' ভয় দেখিয়ে গ্রামমণ্ডলের লোকেরা ফিরে গেলো। দুরপত বোঝে না কী করবে। ঘরে গিয়ে কপাল চাপড়ে মেঝেতে পড়ে সে। দামা শূন্যদৃষ্টিতে বৌ-এর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর আনন্দ দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দুরপত ভাবে ছেলেটা দৌড়ে গেলো কেন? ভাবতে-ভাবতে উঠে সে দরজায় যায়। দ্যাখে সে মারী-আই-এর থানের দিকে হনহনিয়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে ডাকে, 'আনন্দ, আনন্দ।'

কিন্তু আনন্দ দ্রুত চ'লে যায়।

সেদিন অনেক রাত্রে সে বাড়ি ফিরে আসে। তাকে দেখে মনে হয় কোনো একটা ঘোরের মধ্যে আছে। রাত্রি যায়। সকাল আসে। সূর্য উঠলে সে চুপচাপ কাছের নদীতে চান করতে যায়। চান সেরে ধীরে-ধীরে বাড়ি ফিরে বাবার পাশে এসে বসে। বাড়িতে তখনও যারা আছে তাদের কথা শোনে সে। মন দিয়ে শোনে।

'শুনেছো! মা নিজের গাঁয়ের ধারে গিয়ে ব'সে আছেন।'

'হা ভগবান! গেলেন কী ক'রে?'

'বলিস কী রে, গেলেন কী ক'রে'! দেবতা তো। আজ এখানে, কাল ওখানে। বিশ্বসংসার ওনারই হাতে।'

'ঠিক কথা! দেবীর লীলা!'

'পেত্যয় যায় না।'

'যা বলিস বল্। দেখে মনে হ'লো মা খুশিতে ব'সে। নতুন একটা সবুজ শাড়ি পরেছেন। গলায় অনেকগুলো সবুজ বালা দিয়ে তৈরি একটা নতুন হার। রুপোর চক্ষু সামনে চেয়ে আছে।'

'তা-ই কী খালি! সারা গাঁ সেখেনে ভেঙে পড়েছে।'

দুরপত মাঝে এসে পড়ে, 'সত্যি? সত্যি নাকি?' তার এখনও সন্দেহ যায়নি। 'সত্যি তো বটেই। মা নিজেই গাঁয়ের ধারে চলে গেছেন। বসার জায়গাটাও নিজে বেছেছেন। গাঁয়ের লোকের বিশ্বেস দেবীর চক্কর এবার কেটে যাবে।'

'ঠিক। এতেই বোঝা যায় দামাকে দেবী কী চোখে দ্যাখেন। পোটরাজ বটে!'

'বলছো তাই?' দুরপতের আর খুশি ধরে না, 'লোকে বলছে বটে দামার ভক্তির জোরেই মা গাঁয়ের ধারে গেছেন।'

'লোকে বলছে দামা বড়ো পুণ্যবান।'

দামা, যে এতক্ষণ মরার মতো শূন্যচোখে শুয়েছিলো, শুনতে পেলো। দেহে যেন সে বল ফিরে পেলো। উঠে ব'সে জল চাইলো সে। খুব তেষ্টা পেয়েছে এইভাবে জল খেলো। তারপর একটু গরম ভাতের পায়েস খেলো। বেশ ভালো বোধ করতে লাগলো সে।

তাকে উঠে বসতে দেখে দুরপত একটু ঠান্ডা হ'লো। তার স্বামী হঠাৎ খাড়া হ'য়ে উঠেছে। এবার বেশ লাগছে তার। আকাশের দিকে স্পষ্টতই ভক্তি-ভরা চোখে তাকিয়ে সে হাত জোড় করলে।

'হ'তে পারে, কিন্তু সকাল-সাঝ দেবীর ছায়ার বাস।'

'সে-কথা ঠিক। আর দেবীর চক্কর যখন শুরু হয়েছে কে তাঁর কোপে পড়ে ঠিক কী!'

'সে তো বটেই। সবাই থালায় নারকোল আর নিভোদ নিয়ে গাঁয়ের ধারে চলেছে। যে-কোনো জায়গা থেকে পুজোর আওয়াজ শুনতে পাবে।'

'সবাই খুশি।'

ইতিমধ্যে মিছিল দামা পোটরাজের বাড়ির সামনে পৌঁছোয়। ঢাক বাজছে, ঘণ্টা বাজছে, গান হচ্ছে। দেবীর পূজা সেরে মিছিল ফিরছে। ভক্তেরা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মারী-আই কি জয়!'

উল্লাসের চীৎকার শুনে দামার হাতে পায়ে বল ফিরে আসে। তার মনে হয় ফের শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হ'লো। উঠে সে আস্তে-আস্তে দরজায় এসে দাঁড়ায়। দরজার কাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরো মিছিলটা এখন তার বাড়ির সামনে। নারী-পুরুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় উল্লাসধ্বনি : 'মারী-আই কি জয়! দামা পোটরাজ কি জয়!'

সেই চীৎকারে দামার মুখ আলো হ'য়ে যায়। তারপর মিছিল থেকে একজন এগিয়ে এসে তার গলায় হলুদ ফুলের মালা পরিয়ে দেয়, আর আবার সকলে তার নামে জয়ধ্বনি দেয় — 'দামা পোটরাজ কি জয়!'

আনন্দ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। অন্যমনস্কভাবে সে মিছিলটাকে লক্ষ করে। তার মুখ শক্ত হ'য়ে যায়। মিছিল গাঁয়ের দিকে এগোয়। দামা ঘরে ঢুকে আসে। দুরপত বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে! আনন্দ মায়ের কাছে এসে ফিশফিশ ক'রে বলে, 'মা, মারী-আই-কে আমি গাঁয়ের ধারে রেখে এসেছি।'

চমকে ওঠে দুরপত, গভীর আতঙ্কে জিগেশ করে : 'সত্যি? সত্যি করেছিস নাকি, বাবা?'

'হ্যাঁ, মা। মিছিলকে গাঁয়ের ধারে নিতেই হবে, তাই না?'

আনন্দের কথা শুনে দুরপতের মাথা নেমে আসে। পা কাঁপে। ছেলেকে হঠাৎ কাছে টেনে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, 'আনন্দ, ভুলিস না। কাউকে কখনো বলবি না, আমার মাথার দিব্যি। কাউকে না।' এই ব'লে তাকে আবার জড়িয়ে ধরে।

এবারে হাসে আনন্দ।

অনুবাদ : সুনন্দন চক্রবর্তী

শঙ্কররাও খারাট: (১১ই জুলাই ১৯২১ - ৯ই এপ্রিল ২০০১) জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহারাষ্ট্রে। সম্পূর্ণ নাম শঙ্কররাও রামচন্দ্র খারাট। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ড: বি. আর. আম্বেদকারের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি মারাঠওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর লেখায় মূলত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। জীবদ্দশায় খারাট ছয়টি উপন্যাস, আটটি ছোটগল্পের সংগ্রহ, একটি আত্মজীবনী এবং বেশ কয়েকটি অ-কল্পকাহিনীমূলক বই লিখেছিলেন, যার সব কটিই দলিত সংগ্রামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা, 'তারাল অন্তরাল'— একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে। তাঁর অ-কাল্পনিক ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে মহারাষ্ট্রতিল মহারাঞ্চ ইতিহাস (মহারাষ্ট্রে মাহারদের ইতিহাস) অন্যতম।

তার সঙ্গে

পাবলো নেরুদা

সময়টা খুব সুবিধের না। আমার জন্যে অপেক্ষা করো।
দুজনে মিলে খুব সম্‌ঝে একে পার করতে হবে।
তুমি তোমার ঐ ছোট্ট দুটি হাত আমার হাতে রাখো
কষ্টেসৃষ্টেও উঠে দাঁড়াবো
ব্যাপারটা বুঝবো, আহ্লাদ করবো।

আমার আবার সেরকম এক জুড়ি
যার স্থানে-অস্থানে বেঁচেবর্তে এসেছে
পাথরে-ফাটলেও যাদের বাসা বানাতে আটকায় নি।

সময়টা মোটেই সুবিধের না। রোসো, আমার জন্যে দাড়াও,
কাঁকে ঝুড়ি নাও, শাবল নাও
জুতো পরো, কাপড়চোপড় সঙ্গে নিয়ে নাও, যা পারো।

এখন আমাদের একে অপরকে লাগবে
শুধু কারনেশন ফুলের জন্যে না
মধু তালাসের জন্যেও না
আমাদের দুজনের হাতগুলোই লাগবে
ধুয়ে মুছে আগুন বানাবার জন্যে।
এই যে সুবিধের-নয়-সময় মাথা যতোই উঁচু করুক
আমরা আমাদের চার হাত চার চোখে একে যুঝবোই।

অনুবাদ — শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পাবলো নেরুদা : (১২ই জুলাই ১৯০৪ – ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) ছিলেন চিলির বিখ্যাত কবি, কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ, তাঁর প্রকৃত নাম নেফতালি রিকার্দো রেয়েস বাসোয়ালতো। তিনি তাঁর ছদ্মনাম পাবলো নেরুদা নামে সমাধিক পরিচিত। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর কবিতা রচনার সূত্রপাত। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ Twenty love poems and a Song of Despair ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। প্রতিবাদী কবিতা রচনার পাশাপাশি লিখেছেন পরাবাস্তববাদী কবিতা, রাজনৈতিক ইস্তাহার। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পান। ১৯৭১ এ তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 'পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে নেওয়া।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

দ্বাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

সেমিস্টার - III

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গানের ইতিহাস — সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

সংগীত মানুষের আদিমতম শিল্প। যখন অন্য কোনো উপায়ে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি, তখনও সুরই ছিল তার প্রকাশের একমাত্র হাতিয়ার। সম্ভবত প্রকৃতির কাছ থেকে পশুপাখির ভাষার অনুকরণেই মানুষের মধ্যে সুর জেগে উঠেছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দ অনুকরণের চেষ্টা মানুষের বাগ্‌যন্ত্র তথা স্বরযন্ত্রকে দ্রুত বিবর্তিত করেছে। আদিযুগে মানুষের ভাষার বিকাশ সম্ভব হয়েছে সংগীতেরই সূত্রে।

সভ্যতার সেই আদিসময়ে মানুষ নিজের শরীর থেকেও পেয়েছে তাল, লয় ও ছন্দের ধারণা। মানুষের প্রথম সাংগীতিক যন্ত্র তার কণ্ঠ। প্রথম তালযন্ত্র হিসাবে হাতে হাতে তালি বা তালে তালে পা ফেলার আওয়াজকেই ধরা হয়। ক্রমে পাথর, গাছের ডাল, শামুক বা কচ্ছপের খোল প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ থেকে মানুষ বানিয়েছে বিভিন্ন রকমের সুর ও তালযন্ত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উপকরণের বৈচিত্র্য মানুষকে প্রাণিত করেছে বিচিত্র সমস্ত যন্ত্র উদ্ভাবনে। ভারত তথা বাংলার যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রকে চারটি ভাগে নিবদ্ধ করা সম্ভব। (১) তারযন্ত্র, (২) বাঁশির মতো ফুঁ দিয়ে বাজানোর যন্ত্র, (৩) খোল-ঢোল-তবলার মতো মধ্যে ফাঁপা, একদিক বা দু-দিক চামড়া বা অন্য আচ্ছাদনে ছাওয়া তালবাদ্য এবং (৪) ধাতুনির্মিত করতাল, ঘুঙুর, খঞ্জনি জাতীয় নিরেট ও ঘন তালযন্ত্র।

যে-কোনো জাতির সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে সেই জাতির সংগীতের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অন্যদিক থেকে বলা যায়, ছাপাখানা-পূর্ব সময়ে মানুষের যে-কোনো সাহিত্যই মূলত মৌখিক ঐতিহ্য-নির্ভর। আর মনে রাখার জন্য এই মৌখিক ধারার সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সুর ও তাল। মধ্যযুগ পর্যন্ত পৃথিবীর যে-কোনো দেশের, যে-কোনো ভাষার সাহিত্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে তাই সংগীত আখ্যা দেওয়া উচিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও তাই অন্তত মধ্যযুগ অবধি বাংলা সংগীতের ইতিহাসকে অঙ্গীকার করেই গড়ে উঠেছে।

বাংলা সংগীতের আদিতম লিখিত নিদর্শন নিশ্চয়ই চর্যাপদ কিন্তু ‘চর্যাপদ’ বা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নয়, বাঙালির আদি গানের ইতিহাস সন্ধান করা উচিত তার বিভিন্ন আদিবাসী ও লোকসংগীতের অত্যন্ত সমৃদ্ধ পরিসরে। করম পূজা বা গারাম ঠাকুরের গানে, বিভিন্ন ব্রতের অনুষ্ঠানে যেসব গান গাওয়া হয় তার সঙ্গে মানুষের প্রজনন-সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা এবং নানাবিধ জাদুবিশ্বাস-সম্ভূত আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতির গবেষকরা মনে করেন, কোনো জাতির আদি সংগীতের রূপভেদের সংরক্ষণ একমাত্র এই ধরনের ধর্মীয় আচারমূলক মন্ত্র, ছড়া বা গানেই অনেকাংশে পাওয়া সম্ভব।

তবে এই ছোটো পরিসরে বাংলা গানের বিস্তৃত ভুবনটিকে সংক্ষেপে আলোচনার স্বার্থে আমরা ‘চর্যা’ থেকে যথাসম্ভব কালানুক্রম অনুসারে এগোতে থাকব। বাংলার অত্যন্ত সমৃদ্ধ লোকগানের ধারা এবং আরও কতগুলি বিশিষ্ট ধারার সংগীত পৃথকভাবে আলোচনার অবকাশ থাকে বলেই সেগুলিকে আলাদাভাবে সন্নিবেশ করা হল। বাংলা-গানের ক্ষেত্রটি এত জটিল ও ব্যাপক বলেই এমনটা করতে হল। আলোচনার সুবিধার্থে কালানুক্রম এবং বিষয় ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভাজন — এই দুই রীতিকেই আমরা অল্পবিস্তর অনুসরণ করব। আপাতত কালানুক্রম মেনে চর্যা থেকেই আলোচনা শুরু হল।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে **চর্যাগানের** মোট সংখ্যা ৫১, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত এই পদগুলির রচয়িতা লুই পা, কাহ্ন পা, ভুসুক পা, চাটিল পা, ঢেণ্ঢন পা প্রমুখ তেইশজন বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য। বস্তুত বৌদ্ধ ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের হাতেই বাংলা ভাষা প্রথম সাহিত্যিক রূপ পরিগ্রহ করে। চর্যা-র প্রতিটি পদের শীর্ষে রাগের নাম থাকায় এগুলি যে গান তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চর্যা-র যুগে সংগীতে ছয়টি অঙ্গ দেখা যায়। এগুলি ছিল — স্বর ও বিরুদ (স্তুতিবাচক), পদ, তেনক (মঙ্গলবাচক), পাট (তালের বোল উচ্চারণ) এবং তাল। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে পটহ বা ঢোল, মাদল, করন্ত, কসাল, ডমরু, বীণা, একতারা প্রভৃতির ব্যবহার ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একমাত্র প্রামাণ্য সাহিত্যিক নিদর্শন। এটি মূলত নাটগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রতিটি পদেই রাগ ও তালের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি কাব্য ও সংগীত — উভয়তই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই

যুগের সংগীত সম্বন্ধে জানতে বইটি অপরিহার্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি। মোট ৩২টি রাগ-রাগিণীর ব্যবহার দেখা যায়। ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীগুলির কিছু চেনা যায়। কিছু নাম অপরিচয়ের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে। এদের নাম এরকম — আহের, ককু, কহু, কহুগুর্জরী, কেদার, কোড়া, কোড়াদেশাগ, দেশবরাড়ী, বসন্ত, বিভাস, বেলাবলী, ভাটিয়ালী, ভৈরবী, মল্লার ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই — তিনটি চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি পদই কোনো না কোনো চরিত্রের উক্তি। এমনকি বিভিন্ন পদের শীর্ষভাগে সংস্কৃতে অভিনয় নির্দেশ থাকায় এই পদগুলি গাওয়ার সময় যে অভিনয়ও চলত তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কেবল 'রাধাবিরহ' অংশটি এর ব্যতিক্রম। এই অংশের পদগুলি কেবলই গেয়, আর অভিনয়ের প্রয়োজন নেই। প্রকরণের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এমন গঠন অত্যন্ত মৌলিক ও আকর্ষণীয়, সন্দেহ নেই।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর বাংলা সাহিত্যে দেখা যাবে একদিকে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের ধারা আর অন্যদিকে মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রমুখ লৌকিক দেবদেবীকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদে মঙ্গলকাব্য বা শিবায়ন জাতীয় কাব্যের ধারা। রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত থেকে অনূদিত আখ্যায়িকাগুলি গাওয়া হতো পাঁচালির সুরে। **পাঁচালি** মূলত বাংলার লোকগানেরই বিশিষ্ট একটি সুর। প্রাচীন 'গোরক্ষবিজয়' বা 'ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান'-এর মতো নাথপন্থী সাহিত্য, বৌদ্ধ ত্রি-রত্নের প্রতীক দেবতা ত্রিনাথের পাঁচালি, শনির পাঁচালি বা পরবর্তী সময়ে সত্যনারায়ণের পাঁচালি, মানিকপিরের পাঁচালি, লক্ষ্মীর পাঁচালি — সর্বত্রই একই সহজ, সরল লৌকিক সুরের প্রচলন লক্ষিত হয়। লৌকিক সুর বলেই কোনো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনূদিত গ্রন্থগুলি যে পাঁচালির ছন্দে অর্থাৎ পয়ার বা মহাপয়ারে, কখনো কখনো ত্রিপদী বা লাচাড়ি ছন্দে গাওয়া হতো তার প্রমাণ বইগুলির নামেই পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস ওঝা, মাধব কন্দলি বা শঙ্করদেবের লেখা রামকথার নামই ছিল 'শ্রীরাম পাঁচালি'। মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের কাব্যেরও নাম ছিল 'পাণ্ডববিজয় পাঞ্চালিকা'।

মঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্গলগীতি নামে পরিচিত ছিল। দেবদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক ও শ্রোতার মঙ্গল-বিধায়ক পদযুক্ত গীত কৈশিকী বা বোট্টা রাগে বিলম্বিত লয়ে মঙ্গল নামক ছন্দে গাওয়া হতো। অবশ্য 'মঙ্গল' নামক ছন্দ বা পূর্বোদ্ধৃত রাগগুলির প্রকৃত পরিচয় আর পাওয়া সম্ভব নয়। 'লাচাড়ি' নামক লৌকিক ছন্দেই মঙ্গলকাব্যগুলি গাওয়া হয়। মঙ্গলকাব্যগুলি আখ্যায়িকা এবং সচরাচর ষোলোটি পালায় বিভক্ত। আটদিন ধরে অহোরাত্র গাওয়া হতো।

মধ্যযুগে বাঙালি হৃদয়ের গীতিময়তা প্রাণ পেয়েছিল বৈষ্ণব পদাবলিতে। বস্তুত রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামের বাসিন্দা জয়দেব গোস্বামীই এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের মর্যাদা পাবেন। তাঁর লেখা 'গীতগোবিন্দম্' সংস্কৃতে রচিত হলেও পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলির ধারাটি শুরু হয়েছিল ওই গ্রন্থটিরই অনুপ্রেরণায়। রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়লীলা এবং সেই লীলার বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক বর্ণনাই বৈষ্ণব পদাবলির মূল বিষয়। এই পর্যায়গুলি বৈষ্ণব রসবেত্তাদের অভিনব সংযোজন। চৈতন্যদেব-উত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তাঁকে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি রূপে স্বীকার করায় গৌরলীলাও এর অন্তর্গত হল। বিষয়ানুসারে (১) রাধাকৃষ্ণ প্রণয় পদাবলি, (২) গৌর পদাবলি, (৩) ভজন পদাবলি অর্থাৎ গুরু-মহন্তদের উদ্দেশ্যে বন্দনা ও প্রার্থনার পদ এবং (৪) রাগাত্মক পদাবলি বা উপমা ও হেঁয়ালির অন্তরালে আধ্যাত্মিক গীতিকবিতা — এই চারটি শ্রেণিতে বৈষ্ণব পদাবলিকে সাজানো যায়।

বৈষ্ণব পদাবলিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে **কীর্তন গান**। ঈশ্বরের নাম, লীলা ও গুণাবলির উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণাকেই বলা হয় কীর্তন। মারাঠি ভক্তকবি তুকারামের অভঙ্গগুলিকেও 'কীর্তন' বলা হয় বটে, কিন্তু বাংলায় যেভাবে কীর্তন একটি স্বতন্ত্র সংগীতধারার সৃষ্টি করেছে এমনটা আর কোথাও দেখা যায় না। উত্তর ভারতীয় ভক্তি সংগীত 'ভজন'-এর সঙ্গেও কীর্তনের স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। নৃত্য-গীত এবং বাদ্যের সমাহারে ভাবের গভীরতা ও উদ্দামতায়, ভাবস্ফূর্তির সম্মেলক চরিত্রে কীর্তন সত্যিই বিশিষ্ট। কথিত আছে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কীর্তনকে নামকীর্তন বা সংকীর্তন এবং লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন — এই দুইভাগে শ্রেণিভুক্ত করেন। প্রহর ব্যাপী, অষ্টপ্রহর, এমনকি চব্বিশ প্রহরব্যাপী বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ও তালসহ ঈশ্বরের নাম নেওয়াকেই বলা হয় নাম সংকীর্তন। কৃষ্ণনাম অথবা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম-ই সচরাচর গাওয়া হয়ে থাকে। অপরপক্ষে বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, ঝুলন, মাথুর, মান,

সুবলমিলন প্রভৃতি রাধা-কৃষ্ণলীলার পর্যায়ভিত্তিক পদাবলি নিয়ে হয় লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। কীর্তনের অঙ্গ পাঁচটি। যথাক্রমে — কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট। এছাড়া ঝুমুর নামেও ষষ্ঠ একটি অঙ্গের কথা পাওয়া যায়।

এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে বাংলার বিশিষ্ট কয়েকটি লোকসংগীতের ধারা নিয়ে আলোচনা করা হল—

সারিগান : সারিবন্ধভাবে একত্রে কাজ করতে করতে যে গান গাওয়া হয় তাকে সারিগান বলা যায়। তবে বিশেষত নৌকার মাঝিমাল্লারা একযোগে নৌকা বাইতে বাইতে শ্রম অপনোদনের জন্য যে গান গায় তাকেই সারিগান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নৌকার হাল ধরা পাটমাঝি গান ধরলে অন্য মাঝিরাও তান ধরেন। গোটা বহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একই গানের সুর। পাটমাঝিকে বয়াতী-ও বলা হয়। কর্মছন্দের তালে তালে এই গানের চলন নির্ভর করে। গানের বিষয় বিস্তৃত। রাধাকৃষ্ণ, শিব-পার্বতী, লৌকিক নায়ক-নায়িকার প্রেম-বিরহ ইত্যাদিই এই গানের বিষয়। রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নৌকাবাইচের প্রতিযোগিতা হতো। প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় দলের মাঝিমাল্লাদের তাতানোর জন্য দামামা, ঢোল, কাঁসি-সহযোগে দ্রুতছন্দের বীরসাত্মক গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। এখনও এর চল রয়েছে।

ভাটিয়ালি : সারিগানের মতোই ভাটিয়ালিও মাঝিমাল্লাদের গান। তবে সারি হল কোরাস, অর্থাৎ সমবেতভাবে গাওয়ার গান। ভাটিয়ালি একান্তভাবেই একলা গাওয়ার গান। এইধরনের গান প্রায় কখনোই আখ্যানধর্মী নয়, বরং লিরিকাল ও মেলোডিয়াস। ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগঘন উচ্ছ্বাস, গভীর অনুভব ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা এই গানে ফুটে ওঠে। কোনো বাদ্যযন্ত্র এই গানে আবশ্যিক নয়। সুর আর কণ্ঠই এর অবলম্বন। নদীর জলে নৌকার মন্থর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই গানের চলনও ধীর, আর নদীর বিরাট বিস্তার ও প্রসারের ছাপই যেন পড়ে ভাটিয়ালি গানের স্বরের বিভিন্ন পর্দায় বিচরণে। এই সুর ও গান বহু প্রাচীন, এমনকি ভুসুকুপাদের লেখা একটি চর্যাও 'ভাটিয়ার' বা ভাটিয়ালি রাগে বাঁধা। আধুনিক সময়ে জসীমুদ্দিন এবং আব্বাসউদ্দিন আহমেদ ভাটিয়ালি গানকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ভাওয়াইয়া : ভাওয়াইয়া গাওয়া হয় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, কুচবিহার, দার্জিলিং জেলার সমভূমি, রংপুর, গোয়ালপাড়া-ধুবড়ি জেলার বিস্তৃত ভূখণ্ডে। ভাওয়াইয়া গানের গায়কদের বলা হয় 'বাউদিয়া'। এই গানের ভাষা রাজবংশী বা কামরূপী। সম্ভবত 'বাউড়া' বা 'বিবাগি' শব্দ থেকে বাউদিয়া এবং 'ভাব'-শব্দ থেকে ভাওয়াইয়া কথার উৎপত্তি হয়েছে। বাউদিয়ারা ঘড়ছাড়া, বিবাগি মানুষ। এঁরা সামাজিক সংস্কার বা প্রচলিত ধর্ম বড়ো একটা মানেন না। ভাওয়াইয়া গানে তাই বাউল, বৈষ্ণব, ফকিরি, সুফি, দরবেশী'—বিভিন্ন ভাগ ও সুর এসে মিশেছে। এই অঞ্চলে প্রচলিত দেহতত্ত্বের গান 'খেপা খেপি'-র সঙ্গেও ভাওয়াইয়ার মিল আছে। এই গানে বৈষ্ণবদের মতোই বিচ্ছেদ, অন্তরা, পূর্বরাগ ও পরকীয়া প্রেমের বড়ো স্থান আছে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ নয়, নিজস্ব জগতে, নিজের পরিমণ্ডলে, নিজেদের অভিজ্ঞতাই বাউদিয়াদের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে ওঠে। দৈবপ্রসঙ্গহীন এমন লোকসংগীত বাংলায় বিরল। ভাওয়াইয়া গানে 'গাড়োয়ালি', 'মৈষাল' ও 'চট্কা' প্রভৃতি বিভাগ রয়েছে। গোরু বা মোষের গাড়ির চালককে উদ্দেশ্য করে গাওয়া গান গাড়োয়ালি। আর মহিষকুঁড়ায় যাওয়া প্রেমিকের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় মৈষাল বন্ধুর গান। মূলত বিরহভিত্তিক এই গান। রাগে পাহাড়ি ও ঝিঁঝিট-এর সঙ্গে মিল আছে ভাওয়াইয়া সুরের। চট্কা হলো চুটকি বা রঙ্গ-রসিকতার গান। দীর্ঘ বা বিলম্বিত খেয়ালের পর যেমন ছোটো দ্রুত খেয়াল গাওয়া হয়, তেমনই ভাওয়াইয়ার পর গাওয়া হয় চট্কা গান। এতে থাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ। সমাজের দোষত্রুটিকে গানে বিদ্ধ করা হয়। ভাওয়াইয়া ও চট্কা গান গাওয়া হয় দোতারা-সহযোগে, এমনকি এই ধারার গানকেও 'দোতারা' বলা হয়ে থাকে।

ঝুমুর : ঝুমুর আঞ্চলিক লোকসংগীত হলেও এক ব্যাপ্ত ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে এর প্রচলন আছে। সমগ্র ছোটনাগপুর থেকে মধ্যভারত, এমনকি গুজরাটের সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত ঝুমুরের ব্যাপ্তি। আদিবাসী ও সাঁওতালদের মধ্যেও ঝুমুর সুর রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের সমস্ত এলাকায় ঝুমুর জনপ্রিয়তম লোকসংগীত। রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথাই এর প্রধান উপজীব্য হলেও বিভিন্ন লৌকিক বিষয়, রাজনীতি-সমাজনীতি

এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও বর্তমান ঝুমুরগানে পরিবেশিত হয়ে থাকে। 'নাচনি' -নামে খ্যাত নারীশিল্পীদের নৃত্যধারার সঙ্গে ঝুমুর গানের গভীর যোগ রয়েছে এবং নাচের নাম অনুযায়ী এসব গানের নাম হয়েছে — পাতানাচের ঝুমুর, খেমটি নাচের ঝুমুর, দাঁড়িপাল্লার ঝুমুর, কাঠিনাচের ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর, সিঁদুরিয়া ঝুমুর, দরবারি ঝুমুর ইত্যাদি। আর বীররসাত্মক ছৌনাচের সঙ্গে যে ঝুমুর হয় তা ছৌনাচের ঝুমুর নামে খ্যাত।

জারি : জারি শব্দের অর্থ ক্রন্দন। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার মুসলমান সমাজেই এই গান সর্বাধিক প্রচারিত। কারবালা প্রান্তরের শহিদ হাসান-হোসেনের বীরত্ব এবং হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা কাশিমসহ সকলের মৃত্যুতে হোসেন-কন্যা সাকিনার বিলাপ-ই এই গানের মূল। প্রধানত মহরমের সময়ে প্রধান গায়ক বা বয়াতী এবং তাঁর সঙ্গী বা দোহার-রা সমবেতভাবে করুণসুরে এই গান গেয়ে থাকেন।

বাউল ফকিরি ও অন্যান্য দেহাত্মবাদী গুরুবাদী সাধকদের গান : চর্যার সময়েও দেখা যাবে নানা দেহবাদী গুহ্য সাধনার ধারায় গোপনীয়তার আড়ালে বিশেষ কিছু অভিসন্ধিত শব্দ ও চিত্রকল্পের আড়ালে গূঢ়তত্ত্বকে আড়াল করার প্রয়োজন ছিল। এই ধারাটি অত্যন্ত নিভৃতভাবে অথচ প্রবল মাত্রায় এখনও এপার-ওপার বাংলার প্রায় গোটাটা জুড়েই এখনও বহতা ও সৃজনশীল।

লালন ফকির, কুবির গোঁসাই, লালশশী, হাউড়ে গোঁসাই, পাঞ্জু শাহ, যাদু এবং তাঁর সাধনসঙ্গিনী বিন্দু, দুদ্দু শাহ, আর্জান শাহ, জালালুদ্দিন, কাঙাল ফিকিরচাঁদ, হাসন রাজা, রাধারমণ, দীন শরত, রাধেশ্যাম, নীলকণ্ঠ, রাধাবল্লভ, বলরাম হাড়ি, মোকসেদ শাহ, খোদাবক্স শাহ, বাউল আব্দুল করিম শাহ প্রমুখ কিংবা একটু অন্যধারায় হলেও ভবা পাগলা, বিজয় সরকার, আব্দুল করিম (সিলেট) বা প্রায় সমসাময়িক রশিদ সরকার, মাতাল রাজ্জাক, বুহি ঠাকুর, হাসান, গনি পাগল বা আজহার ফকিরদের গানে এই ধারার ঐতিহ্য বেঁচে রয়েছে তীব্রভাবে। ভেলুকানা, বাঁকুড়ার সনাতন দাস, কালিদাসী বা আজকের পূর্ণদাস বাউল, কালাচাঁদ দরবেশ, সোমেন বিশ্বাস, দেবদাস বাউল, অন্ধ কানাই, সত্যানন্দ, তারক দাস বাউল আর খেজমত ফকির, বীরেন দাস বাউল, রনজিৎ গোঁসাই, মনসুর ফকির, আরমান ফকির, গোলাম ফকির, মমতাজ, মিনতি মহান্ত, রেহানা ফকিরানিরা পাল্লাগানের আসরে বা আখড়ার নির্জনে এখনও এই গানের চর্চাকে ধারাবাহিক রেখেছেন। তাঁদের গান থেকেই সাধারণ মানুষ হৃদয়ে বৃন্দাবন খোঁজার আশ্বাস পান, দেল কাবায় খোঁজ করেন 'বাতুন' বা গোপন কোরান শরীফের। প্রাণময় সাকার মানবদেহে বা আহাদ -এই খোঁজেন আহম্মদ বা সৃষ্টিকর্তাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই ভারত তথা বাংলার শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। নবাবি অপশাসন, বিলাসব্যসনমত্ততা, স্থানীয় ভূস্বামীদের মাত্রাহীন শোষণ ও অত্যাচার, বর্গির হাঙ্গামা, পোর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ — সাধারণ বাঙালির জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এই রকম সময়ে বাঙালি হৃদয় আশ্রয় খুঁজল তার পুরাতন মাতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যে। এই পর্যায়ের বিশিষ্ট ফসল শাক্ত পদাবলি বা শ্যামাসংগীত। শাক্তপদাবলি মাতৃসংগীত, কালী সংগীত, চণ্ডী গীতি, মালসী গান এবং আগমনী ও বিজয়া পর্বে বিভক্ত। শাক্তগানের নিম্নরূপ পর্যায় বিভাগও পাওয়া যায় — বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কী ও কেমন, ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা, মাতৃপূজা, সাধনশক্তি, নাম মহিমা ইত্যাদি। বাৎসল্য, প্রতিবাৎসল্য, বীর, দিব্য, অদ্ভুত এবং শান্তরসগুলি এই পদাবলির অঙ্গীরস। সুগভীর তত্ত্ব এবং বাঙালির পল্লিনির্ভর জীবনের পারিবারিকতা ও সামাজিকতার নিবিড় সুর — উভয়ই আশ্চর্য দক্ষতায় শ্যামাসংগীতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভক্ত হৃদয়ের আকুতি।

শাক্তসংগীতের প্রথম ও প্রধান কবি 'কবিরঞ্জন' রামপ্রসাদ সেন। আনুমানিক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার হালিশহরে তাঁর জন্ম। তাঁর গানে রাগসংগীত ও দেশি সুর — উভয়েরই প্রভাব রয়েছে। রামপ্রসাদ রচিত বিদ্যাসুন্দর, কালিকামঙ্গল, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তনেরও খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্ট গায়কী আজও 'রামপ্রসাদী সুর' নামে খ্যাত।

রামপ্রসাদের মতোই এই ধারার আর একজন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় গীতিকার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (আঃ ১৭৭২-১৮২১ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর গানে টপ্পারীতির প্রভাব সম্ভবত বাংলায় টপ্পাগান প্রচলনের অন্যতম পুরোধাস্থানীয় ব্যক্তিত্ব কালিদাস চট্টোপাধ্যায়

বা কালী মীর্জা (আঃ ১৭৫০-১৮২০ খ্রিস্টাব্দ)-র সঙ্গ করার ফল। অন্য পদকর্তাদের মধ্যে দাশরথি রায়, মহারাজ শিবচন্দ্র, আশুতোষ দেব, মহারাজ রামকৃষ্ণ, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নরেশচন্দ্র, গোপেশ্বর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, রূপচাঁদ পক্ষী, হরিনাথ মজুমদার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এমনকি মধুসূদন দত্ত বা রবীন্দ্রনাথ-ও মাতৃসংগীত লিখেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অথবা পরবর্তী সময়ে নজরুল ইসলামের নামও এপ্রসঙ্গে অবশ্য স্মর্তব্য। এই পদকর্তাদের প্রায় সকলেই নিজেরাও গায়ক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্যামাসংগীত গায়ক হিসেবেই যাঁরা জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভবানীদাস, মৃণালকান্তি ঘোষ বা কিছু পরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং পান্নালাল ভট্টাচার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা গানের অন্য যে ধারাগুলি বিশেষ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল তা কবিগান, পাঁচালি এবং আখড়াই-হাফ আখড়াই গান, যাত্রাগানের ধারা। ঈশ্বর গুপ্তের মতে কবিগানের জন্মভূমি শান্তিপুর। মনে করা হয় সেন রাজাদের আমলে নৃত্যগীত সহযোগে যে শাস্ত্রীয় গীতের প্রচলন ছিল, তারই একটি শাখা 'আখড়াই' নামে পরিচিত হয়েছিল। অন্যমতে 'গীতগোবিন্দ' উল্লেখিত 'প্রবন্ধম্' শৈলীই নানা বিবর্তনে নাটগীতি থেকে আখড়াই গানের রূপ নিয়েছে। এই আখড়াই সংগীতই কালক্রমে স্বভাবকবিদের জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে 'কবির লড়াই' তথা কবিগানের রূপ পরিগ্রহ করল। **কবিগান** যাত্রাগানের মতো উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বা সংলাপধর্মী। পাঁচালি ও ঝুমুর গানের সঙ্গেও চরিত্র ও সুরের দিক থেকে কবিগানের মিল আছে। কবিগানে বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই প্রভাবই দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিগানই বাংলার জাতীয় সাহিত্য। জনমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং সময়ে সময়ে নানা সামাজিক দাবিতেও স্বভাবকবি বা কবিয়ালদের কণ্ঠ সচল থেকেছে। ক্রমে ইউরোপীয় ভাবধারার অভিঘাতে রুচি ও মানসিকতার বদলে এই ধারা ক্রমশ স্তিমিত হয়েছে। কবিগানের গৌরবময় শতবর্ষব্যাপী স্বর্ণযুগের কবিয়ালদের মধ্যে গোঁজলা গুই, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, রাসু ও নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নীলু ঠাকুর, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব ময়রা, ঈশ্বর গুপ্ত, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতুরায়, নীলমণি পাটুনী, ভীমদাস মালাকার, উদয়চাঁদ সহ আরও অনেকেই স্মরণীয়।

আগেই বলা হয়েছে **পাঁচালি গান** বহু প্রাচীন একটি ধারা, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবৃত্তি ও গানের সমাহারে পাঁচালি গানের নতুন একটি রূপ তৈরি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় কবিগান, আখড়াই ও টপ্পার প্রভাবে পাঁচালির আবার সংস্কার ঘটে। পাঁচালিতে আদতে উক্তি-প্রত্যুক্তির ঢং না থাকলেও কবিগানের প্রভাবে কলকাতায় উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক পাঁচালির চল হয়েছিল। আধুনিক পাঁচালির রূপকার ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস ও গঙ্গানারায়ণ নস্কর। লক্ষ্মীকান্তই প্রথম পাঁচালি গানে শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের ব্যবহার করেন। তবে পাঁচালি রচয়িতাদের মধ্যে দাশরথি রায় ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। এছাড়া ঠাকুরদাস দত্ত, রসিক চন্দ্র রায়, ব্রজমোহন রায়, আনন্দ শিরোমণি প্রমুখ পাঁচালিকারেরাও স্মরণীয়।

আখড়াই গানের উৎস যে বেশ প্রাচীন তা আগেই আলোচিত হয়েছে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' থেকেও জানা যায় যে গায়ক-বাদক ও নর্তকদের যৌথ সম্প্রদায়কে 'আখড়া' বলা হতো। শাস্ত্রীয় রাগ-তাল সমন্বিত প্রেমগীতিই পরিবেশন করতেন তাঁরা। মনে করা হয় গৌড়বঙ্গে উদ্ভূত হয়ে, শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে অবস্থিতির পর অষ্টাদশ শতকে চুঁচুড়া হয়ে **আখড়াই গান** কলকাতায় প্রবেশ করে। ঈশ্বর গুপ্তের মতে, শান্তিপুরের খেউড় আর প্রভাতীগানের সমন্বয়ে আখড়াই গানের উৎপত্তি। প্রথম দিকে এই গান ছিল মূলত আদিরসাত্মক। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ও তাঁর আত্মীয় কুলুইচন্দ্র সেন আখড়াই গানের সংশোধন করেন। নিধুবাবুর প্রভাবে টপ্পার গায়নরীতি এবং তানপুরা, বেহালা, সেতার, বীণা, বাঁশি, জলতরঙ্গ, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সমাহারে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে বাজানো **'সাজের বাজনা'** বা অর্কেস্ট্রা এই গানে স্থান করে নিল। এইভাবে আখড়াই গান উচ্চাঙ্গের বৈঠকি গানে পর্যবসিত হয়। আখড়াই গানে রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তবে তাঁকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আসা যাবে বাংলায় হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা এবং বিশেষত টপ্পাগানের প্রসঙ্গে। অন্য রচয়িতাদের মধ্যে শ্রীদাম দাস, রামঠাকুর, বাবুমোহন বসাক, হলধর ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আখড়াই গানে উক্তি-প্রত্যুক্তির ব্যাপার ছিল না। নিধুবাবুর শিষ্য গায়ক মোহন চাঁদ বসু কবিগানের আদর্শে চাপান-উতোরের মতো উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রবর্তন করে **হাফ আখড়াই** গানের জন্ম দেন। এখানে অবশ্য চাপান-উতোর না বলে বলা হত ধরতা-উতোর। হাফ আখড়াইয়ের পর্যায়গুলি ছিল, (১) ভবানী বিষয়ক বা শারদা বিষয়ক (চিতান, পরচিতান, ফুকা, দ্বিতীয়

ফুকা, মেলতা), (২) সখী সংবাদ (মহড়া, খাদ, ফুকা, দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় মেলতা), (৩) খেউড় (দ্বিতীয় চিতান, দ্বিতীয় পরচিতান, ফুকা, তৃতীয় ফুকা, তৃতীয় মেলতা)। হাফ আখড়াই গানের তুকবিন্যাস কবিগানের অনুরূপ। এই গানে অন্তরা থাকত না আর কবিগানের মতো দাঁড়িয়ে নয়, বরং বসেই গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। মোহনচাঁদের জীবদ্দশাতেই হাফ আখড়াই গানের ধারা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এই সময়ের গানের ধারায় **যাত্রাগান** অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও 'যাত্রা' শব্দটির বর্তমান অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দী থেকে মোটামুটি আজকের চেহারায় যাত্রাগানের প্রচলন শুরু হয়। প্রথম যুগের যাত্রা ছিল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। কালক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, লোককথা, লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি অবলম্বনেও যাত্রাগানের প্রসার ঘটে। এই সময়ের কালীয়দমন যাত্রা, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি জনপ্রিয় ছিল। যাত্রায় গানের অংশ বেশি থাকলেও পয়ার ও চতুষ্পদী ছন্দে আবৃত্তির অংশও কিছু কম ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রাপালার অনেক সংস্কার ঘটে। সেবিষয়ে যথাসময়ে আলোচনা করা হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে যখন কবিগান ও পাঁচালিরই তুঙ্গ জনপ্রিয়তা, তখন বাংলার চারজন অবশ্যস্মরণীয় সংগীতব্যক্তিত্ব পশ্চিমা কলাবতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্থানি সংগীতচর্চায় ব্রতী হন। হিন্দুস্থানি মার্গসংগীত বলতে আমরা ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, খেয়াল ও ঠুংরিকে বুঝব। এই চারজন হলেন রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯), কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মীর্জা (আঃ ১৭৫০-আঃ ১৮২০), দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আঃ ১৭৬১-১৮৫৩)। এঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন গুরুর কাছে সংগীতের নানা স্বতন্ত্র অঙ্গের সাধনায় সিদ্ধ হন। বস্তুত এই চারজনেরই প্রচেষ্টার ফলে বাংলা ভাষায় টপ্পা, ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি অঙ্গে সংগীত রচিত হয় এবং বাংলাদেশে রাগসংগীতের প্রচলন ঘটে।

রামনিধি গুপ্ত বা **নিধুবাবু** ভারতীয় সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা '**টপ্পা**'-কে বাংলায় প্রচলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। মনে করা হয় পাঞ্জাবের লোকগান 'ডপা' বা 'টপে' থেকে টপ্পা-র সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষেত্রমোহন সেনের মতে — ঠুংরি, গজল, সোহেলা, হোরি প্রভৃতি সবই টপ্পা শ্রেণিভুক্ত। এটি মূলত মেয়েদের গান। এর বিষয় নর-নারীপ্রেম এবং নারীহৃদয়ের আকুতি। স্থায়ী এবং অন্তরায় টপ্পা নিবদ্ধ। হিন্দুস্থানি টপ্পা দ্রুতলয়ে গঠিত। 'জমজমা' বা বিশিষ্ট প্রকারে স্বরের যোজনা এবং 'গিটকিরি' বা বিশেষ একটি স্বরকে অলংকৃত করার শৈলীসহ হিন্দুস্থানি টপ্পায় আদ্যন্ত সুরের উল্লম্ফন লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীতসূত্রসার'-এ লিখেছেন 'টপ্পা' শব্দের আদি অর্থ 'লাফ', সেখান থেকে রূঢ়ার্থে তা বোঝায় সংক্ষেপ। ধ্রুপদ ও খেয়াল থেকে যে গান সংক্ষেপতর, তার নাম টপ্পা। নিধুবাবু প্রবর্তিত বাংলা টপ্পা দ্রুততানের আধিক্য, জমজমার আতিশয্য এবং সুরের উল্লম্ফনের আকস্মিকতাবর্জিত ছিল। তাঁর গানে আছে অন্তরের গভীর আবেগ ও মাধুর্যপূর্ণ কাব্যসংগীতের সমাহার। ঈষৎ বিলম্বিত লয়ে দোলন সহযোগে তানের প্রয়োগে পৃথক একটি ভাব ও আবেগ তৈরি হয়। এইটিই নিধুবাবুর কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা **কালী মীর্জা** নিধুবাবুর থেকে বয়সে কিছু ছোটো হলেও বাংলাদেশে টপ্পা শৈলীর প্রচলনে তিনিও সমান প্রভাবশালী একজন ব্যক্তিত্ব। এমনকি কালানুক্রমিক বিচারে তিনিই পথিকৃতের মর্যাদা পাবেন। তবে নিধুবাবু ও তার প্রবর্তিত টপ্পাগানের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল।

বর্ধমানরাজের দেওয়ান সংগীতগুণী **রঘুনাথ রায়** ছিলেন নিধুবাবু ও কালী মীর্জার সমসাময়িক মানুষ। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম রাগসংগীতের অপর একটি ধারা '**খেয়াল**'-এর চর্চা শুরু করেন। তাঁর খেয়ালচর্চার প্রায় তিরিশ বছর পরে বিষ্ণুপুরের কানাইলাল ও মাধবলাল চক্রবর্তী খেয়াল গাওয়া শুরু করেন। 'খেয়াল' আরবি শব্দ। এর অর্থ যথেচ্ছাচার। মনে করা হয়, আলি জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত কৈবাড় প্রবন্ধ থেকেই খেয়ালের উৎপত্তি। অন্য মতে, একতালী ও রাসক্ প্রবন্ধ খেয়ালের উৎস। অনেকে মনে করেন, 'কাওয়ালি' নামক উত্তর ভারতীয় লোকসংগীত থেকে খেয়ালের উৎপত্তি।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম বাংলায় ধ্রুপদ রচনা করেন। ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে ধ্রুপদের প্রচলন থাকলেও অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রামশঙ্করের হাতে বিষ্ণুপুরে এর প্রবর্তন এবং পরবর্তীকালে এই ধারাই '**বিষ্ণুপুর ঘরানা**' নামে খ্যাত হয়। মল্ল বংশের রাজা রাজমল্লের সময় (খ্রিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী) থেকেই বিষ্ণুপুর সংগীত সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ। রামশঙ্করের শিষ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন **যদুভট্ট**, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

এই সময়ের আরেকজন বিশিষ্ট ধ্রুপদিয়া ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। যদুভট্ট, কিশোর রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকতাসূত্রেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এরপর এই ঘরানার যে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীর নাম না করলেই নয়, তাঁর নাম **জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী** বা **জ্ঞান গোঁসাই**। তিনি গোপেশ্বর, কাকা রাধিকাপ্রসাদের কাছে ধ্রুপদের তালিম যেমন নেন, তেমনই বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর এবং ফৈয়াজ খাঁ-র কাছে খেয়ালও শিক্ষা করেছিলেন।

বাংলার একমাত্র সংগীত ঘরানা হিসেবে বিষ্ণুপুর স্বনামধন্য। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। এই ধ্রুপদ সরল, অলংকারবিরল, গমকাদির প্রাবল্যবিহীন এবং ঠাটের আতিশয্য-বর্জিত। তাছাড়া রাগরূপে ব্যতিক্রমী স্বরপ্রয়োগ, যেমন বসন্ত রাগে শুদ্ধ ধৈবত বা ভৈরবের অবরোহণে কোমল নিষাদের ব্যবহার প্রভৃতি বিষ্ণুপুরী ঘরানার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার।

কৃষ্ণনগরে **বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী** (১৮০৪-১৯০০) -কে কেন্দ্র করে ধ্রুপদ ও বাংলাভাষায় রাগসংগীতের অনুশীলন বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের আহ্বানে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ও কলকাতা আগমনের ফলে তাঁরই প্রচেষ্টায় রাগভিত্তিক বাংলা ব্রহ্মসংগীতের প্রচলন হয়। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংগীতশিক্ষক ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল অগ্রজের তিনি গুরু। রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম সংগীতশিক্ষক তিনিই। কলকাতায় অন্যতম আদি খেয়াল গায়কের মর্যাদাও তাঁরই। এই সময়ের বিখ্যাত পাখোয়াজ বাদকদের মধ্যে গঙ্গাবিষ্ণু চক্রবর্তী, রামচন্দ্র চক্রবর্তী, রাজচন্দ্র বসু, গোলাম আব্বাস, লালা কেবলকিষেন, নিতাই ও নিমাই চক্রবর্তী, কেশব মিত্র, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য।

বাংলা খেয়ালের ধারাটি তুলনায় ক্ষীণস্রোতা হলেও পরবর্তী সময়ে যাঁদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে তাঁদের কয়েকজনের নাম করা হল — ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বোস, **তারাপদ চক্রবর্তী**, হিমাংশু দত্ত, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী এবং তাঁর শিষ্যপরম্পরায় হারু বাবু, এ.টি. কানন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, গীতা দাস, আরতি দাস, রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমানে রশিদ খান প্রমুখ।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আর একধরনের লঘু শাস্ত্রীয়সংগীত বাংলার সংস্কৃতিতে স্থান করে নিয়েছিল। এই গানের নাম **ঠুংরি**। কথিত আছে লখনউ-এর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ ঠুংরি গানের প্রবর্তক। পরবর্তী সময়ে সনদ, কদর, দয়াসখী, কৃপাসখী প্রমুখ এই গানের নানাভাবে সমৃদ্ধি ঘটান। অন্যমতে, উত্তরপ্রদেশের প্রচলিত লোকসংগীত চৈতী ও কাজরী গানের রূপান্তরই ঠুংরি। কেউ মনে করেন ঠুংরি একটি স্বতন্ত্র রাগিণী, কেউ মনে করেন এটি একটি তাল। এর উৎসরূপে বাইজি সংগীতকেও নির্দেশ করেছেন কেউ কেউ। মোটের উপর আকারে ছোটো, বৈচিত্র্যপূর্ণ, চটুল প্রকৃতির গান ঠুংরি। ১৮৫৬ সালে ওয়াজেদ আলি শাহ-র কলকাতা আগমনের পরেই মেটিয়াবুরুজকে কেন্দ্র করে ঠুংরি গানের প্রসার ঘটে। বাংলাদেশে একসময় পঁছাওয়া, পূর্বিয়া ও পাঞ্জাবি — এই তিনপ্রকার ঠুংরি প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে খেয়াল ভঙ্গিমার (পঁছাওয়া) বিলম্বিত লয়ের 'লচাও ঠুংরি'-ই সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। বড়ে গুলাম আলি খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ ঠুংরিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলা ঠুংরির গায়ক হিসাবে **বেগম আখতার**, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অজয় চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কালপর্বে একদিকে যেমন বাংলায় রাগসংগীতের চর্চা ও প্রভাব বাড়ছিল, অন্যদিকে জনমনোরঞ্জনী ধারায় কবিগান, পাঁচালি, কীর্তন প্রভৃতির রমরমাই ছিল প্রধান। এছাড়া ছিল যাত্রাগান, ঢপগান, তরজাগান, রামায়ণ গান প্রভৃতি। উনিশ শতকে গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় যাত্রাপালার আমূল সংস্কার করেন। রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রথম ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'নন্দবিদায়' যাত্রাপালায় আখড়াই ও হাফ আখড়াই গানের প্রয়োগ করেন। মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তন করেন রাগ-রাগিণী সংবলিত **'জুড়ির গান'**। এই শতকের যাত্রাগানের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল 'বিদ্যাসুন্দর পালা'। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, প্যারীমোহন এবং বিশেষত **গোপাল উড়ে** এই ধরনের যাত্রাগানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোপাল উড়ে দক্ষ টপ্পা গায়ক ছিলেন এবং বিদ্যাসুন্দর পালায় খেমটা নাচ যোজনাও তাঁর কীর্তি।

পাঁচালি ও কথকতারীতির সঙ্গে কীর্তন গানকে মিশিয়ে তৈরি হয়েছিল '**ঢপ কীর্তন**'। 'ঢপ' শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ সৌষ্ঠবসম্পন্ন'। এই রীতিতে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় সংলাপ, ছড়া এবং সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করার চল ছিল। বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা। বাউল সমাজে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ঢপকীর্তন জনপ্রিয় ছিল। রূপচাঁদ অধিকারীই ঢপকীর্তনের প্রবর্তক বলে জানা যায়। পরবর্তী সময়ে অঘোর দাস, দ্বারিক দাস, শ্যাম দাস, মোহন সরকার এবং বিশেষত **মধুসূদন কিন্নর** বা **মধুকান** ছিলেন এই ধারার বিখ্যাত শিল্পী। মধুকানের পর ঢপকীর্তন মূলত বৈষ্ণব বাউল ও মেয়ে কীর্তনিয়া সমাজে প্রচলিত ছিল। পান্নাময়ী, বাণী কীর্তনী এবং জগমোহিনী কান ছিলেন ঢপগানের তিন বিশিষ্ট মহিলা শিল্পী। ঊনবিংশ শতকের কলকাত্তাই বাবু সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল **পক্ষীর দলের গানে**। কথিত আছে, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পারিষদ শিবচন্দ্র ঠাকুর পক্ষীর দলের প্রতিষ্ঠাতা। ঈশ্বর গুপ্তের মতে, শোভাবাজার বটতলা-নিবাসী রামচন্দ্র মিত্রের আটচালায় বাবু রামনারায়ণ মিশ্র এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের সবচেয়ে বিখ্যাত সদস্য ছিলেন **গৌরহরি দাস মহাপাত্র** বা **রূপচাঁদ পক্ষী** (১৮১৫-১৮৯০)। নিধুবাবু নিজেও নাকি এই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রব রাখতেন। রূপচাঁদ আগমনী-বিজয়া, বাউল, দেহতত্ত্ব এবং নিধুবাবুর প্রভাবে প্রচুর টপ্পাগান রচনা করেছিলেন। 'পক্ষীর জাতিমালা' নামে সখের পাঁচালি দল গড়ে তিনি খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন। বিধবাবিবাহ, কন্যাদায়, রেলগাড়ি প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক সমস্যা বা সাংবাদিক বিবৃতিধর্মিতা তাঁর গানে উঠে এসেছে। হাস্যরসাত্মক গান রচনাতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল।

এই সময়ের অন্যান্য গানের ধারায় **থিয়েটারের গানের** উল্লেখ করতে হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফের প্রচেষ্টায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনা 'The Disguise'-এর অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গান ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। শাস্ত্রীয় ও লঘু — উভয়প্রকার সংগীতেরই ব্যবহার এই নাটকে করা হয়েছিল। গোপাল উড়ে-কৃত বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। ১৮৫৭-য় নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রযোজনার জন্য গান লেখেন কবিচন্দ্র। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', 'রত্নাবলী', 'নব-নাটক' ও 'মালতী মাধব' নাটকের প্রয়োজনে গুরুদয়াল চৌধুরী ও বনোয়ারিলাল রায়ের গীত রচনার কথা জানা যায়। মধুসূদন দত্তের নাটকে পাশ্চাত্যরীতির প্রভাবে গানের সংখ্যা হ্রাস পেলেও 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে গানের প্রয়োগে তিনি সাহায্য নেন সংগীতজ্ঞ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। বস্তুত যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন এই সময়ের অধিকাংশ নাটকেই সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু), শরৎচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রযোজনায় 'নবনাটকের সংগীত পরিচালনা করেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী'। আবার 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' এবং পরবর্তী সময়ে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' প্রযোজিত নাটকগুলির সংগীত পরিচালক ছিলেন হিঙ্গুল খাঁ। গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, কবিচন্দ্র, মণিমোহন সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদয়াল চৌধুরী, মধুসূদন দত্ত, গোপাল উড়ে, **শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর**, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দুর্গাদাস কর, **গিরিশচন্দ্র ঘোষ** প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাটকের প্রয়োজনে কম বেশি ১৩৭০ টি গান রচনা করেছিলেন। এই সময়ের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে গানের ব্যবহার সমধিক। পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের সুচিন্তিত ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর নাটকের গান একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের গান প্রসঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা গানের ভুবনে বিষয় অনুসারে অন্য একটি ধারা সংযোজিত হল। একে বলা যেতে পারে **ভারত সংগীত** বা **স্বদেশ সংগীত**। প্রথম স্বদেশ সংগীত হিসেবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সুরারোপিত 'ভারত সংগীত' কবিতাটি উল্লেখনীয়। ১৮৬৪ সালে রচিত কবিতাটি ইমন বেলাবলী রাগে ও ঢিমে তেতালায় সুরনিবন্ধ হয়েছিল। এই যুগের বিখ্যাত স্বদেশ সংগীতের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে বল ভারত রে', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' বা 'জয় ভারতের জয়' প্রভৃতি পড়বে। 'জয় ভারতের জয়' গানটির খাম্বাজ রাগিণীতে সুর করেছিলেন বিষ্ণুচন্দ্র

চক্রবর্তী। ১৮৭৬ সালে হিন্দুমেলার উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জাতীয় সঙ্গীত' পুস্তিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রমুখের লেখা এবং 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', শরৎ সরোজিনী', 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি ইংরেজবিরোধী নাটক থেকে নেওয়া বিভিন্ন স্বদেশি গান সংকলিত হয়। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার স্পৃহা পর্যায়ক্রমে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের গানের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়েই পাশ্চাত্য স্টাফ নোটেশনের আদলে বাংলায় **আকারমাত্রিক স্বরলিপি**র প্রবর্তন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর**।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা জুড়ে রাগসংগীতের প্রসার, নাগরিকতার বৃত্তে এসে লৌকিক সংগীতের বিভিন্ন ধারার নতুন রূপ পরিগ্রহণ, ইউরোপীয় ভাবধারার প্রচণ্ড অভিঘাত এবং স্বাদেশিকতার অভ্যুত্থান — এই বিচিত্র ও ঘটনাবহুল প্রেক্ষাপটে বাংলা গানের ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিলেন **রবীন্দ্রনাথ**। তাঁর গানে সুর ও বাণীর আশ্চর্য ও দুর্লভ সংগতিসাধন হয়েছিল। সুরের বৈচিত্র্যে এবং বাণীর প্রায় সর্বত্রগামিতায় রবীন্দ্রসংগীত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া বাংলার গানে এর আগে 'সঞ্চারী' পর্যায় বা 'তুক'টি অনুপস্থিত ছিল। স্থায়ী ও আভোগ ছাড়া অন্তরার সুরেই বিভিন্ন কলি বারবার গাওয়া হত। বাংলা গানে সঞ্চারীর প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথের একটি অমর কীর্তি। বাঙালির সংস্কৃতি ও মানসের গভীরে তাঁর গান সঞ্চারিত হয়েছে। সংস্কৃতি ও জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আনুমানিক মোট ২২৩২ টি গান তিনি রচনা করেছিলেন। এই গানগুলি 'গীতবিতান' নামের গ্রন্থে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বরবিতান' গ্রন্থে আনুমানিক ১৯৩১টি গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের গানকে 'পূজা', 'প্রেম', 'স্বদেশ', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি পর্যায়ভুক্ত করলেও সুর ও বাণীর দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে অন্যভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা চলে। সুরের দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে অন্তত পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় —

ধ্রুপদ ও ধামার : শৈশবে বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত ধ্রুপদিয়া যদুভট্টের কাছে তালিমপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ হিন্দি গানের সুর নিয়ে মোট ৭৭টি ধ্রুপদ রচনা করেছেন। চৌতাল, তেওড়া, সুর ফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তাল এই সবক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এই রকম খুব বিখ্যাত দুটি গান হলো 'প্রথম আদি তব শক্তি' (মূলগান ঃ প্রথম আদি শিবশক্তি' — সোহিনী/সুর ফাঁকতাল) এবং 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' (মূলগান ঃ 'মহাদেব মহেশ্বর' — ইমন কল্যাণ/তেওড়া)। ধামার একটি চোদ্দোমাত্রা বিশিষ্ট তাল। এই তালে রচিত মূলত হোলি বিষয়ক গানকেই বলা হয় 'ধামার'। হিন্দি ধামারের অনুসরণে মোট ১৪টি গান রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেন। যেমন — 'অমৃতের সাগরে' (মূলগান ঃ মৈ তো না যাউঁ— কামোদ/ধামার)। এছাড়াও সম্পূর্ণ মৌলিক ২৭টি ধ্রুপদ এবং ২টি ধামার তিনি রচনা করেন। যেমন — 'সদা থাকো আনন্দে' (খট/ঝাঁপতাল ধ্রুপদ) এবং 'গরব মম হরেছ প্রভু' (দেশ-ধামার/ধামার)।

খেয়াল ও ঠুংরি : উচ্চাঙ্গ সংগীত ব্যবহার করে প্রায় তিনশো গান রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রেও হিন্দি খেয়াল ও ঠুংরির অনুসরণে কিছু গান সৃষ্ট হয়েছিল। যেমন খেয়ালের ক্ষেত্রে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' (মূলগান ঃ 'লাগি মোরে ঠুমক' — মালকোশ/ত্রিতাল) আর ঠুংরির ক্ষেত্রে 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' (মূলগান ঃ কৈ কছু কহো রে' — খাম্বাজ/কার্ফা) গান দুটির নাম করা যায়। এইরকম খেয়াল ভাঙা গান মোট ৭০টি এবং ঠুংরি-ভাঙা গান ২টি তিনি রচনা করেছিলেন। আবার মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে খেয়াল রচনা করেছিলেন ৫৫টি। যেমন, 'অনেক দিয়েছ নাথ' (আশাবরী/ত্রিতাল) গানটি। আর রবীন্দ্রনাথ রচিত মৌলিক ঠুংরির সংখ্যা মাত্র ২টি। যেমন — 'এরা পরকে আপন করে' (পিলু-বারোয়াঁ/ খেমটা) গানটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের গানে রবীন্দ্রনাথ সচরাচর ব্যবহার করেছেন ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, যৎ, রূপকড়া, নবতাল, খেমটা, দ্বিমাত্রিক লাওনী ঠেকা প্রভৃতি তালগুলি।

টপ্পা : হিন্দি টপ্পার অনুসরণে ১৪টি এবং নিজস্ব শৈলীতে ২৫টি টপ্পাঙ্গের গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। হিন্দি ভাঙা টপ্পা, যেমন, 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হলো' (মূলগান ঃ মিয়া বে মানু লে — ঝিঁঝিট/মধ্যমান)-র মতো গানে মধ্যমান, আড়াঠেকা ও

তেওড়া তালের ব্যবহার করলেও নিজস্ব সৃষ্টিগুলির ক্ষেত্রে তিনি তাল বর্জন করেছেন। এই কারণেই 'অন্ধজনে দেহ আলো', 'সার্থক জনম আমার' বা 'তবু মনে রেখো'-র মতো গানগুলি তাল ছাড়াই গাওয়া হয়ে থাকে।

লোকসংগীত : রবীন্দ্রনাথের বহুগানেই বাংলার লোকসংগীতের ছায়া পড়েছে। বাউল সুরে বাঁধা অজস্র গানের মধ্যে 'মেঘের কোলে কোলে' বা 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' প্রভৃতি গানের নাম করা যায়। কীর্তনের সুরেও পাওয়া যায় অজস্র রবীন্দ্র রচনা। তার মধ্যে 'ও হে জীবন বল্লভ' গানে তো আখর-ও ব্যবহার করা হয়েছে। এরকমই আর একটি গান 'সখী বহে গেল বেলা'। তাঁর বেশ কিছু গানে রামপ্রসাদী সুরেরও প্রভাব দেখা যায়। যেমন, 'আমরা মিলেছি আজ' বা 'আমিই শুধু রইনু বাকি' প্রভৃতি। এছাড়াও সারি গানের সুরে 'এবার তোর মরাগাঙে', ভাটিয়ালি সুরে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' বা ঝুমুর সুরে 'ওরে বকুল পারুল' প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যায়।

ভাঙা গান : শুধু হিন্দি গানই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সুর এবং পাশ্চাত্য সংগীত থেকেও অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বহু গান রচনা করেছেন। এই ধরনের গানকেই 'ভাঙা গান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় গানে দেখা যায় হিন্দি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও টপ্পার পাশাপাশি তেল্লেনা বা তারানা, হিন্দি লঘু সংগীত, ভজন, যন্ত্র সংগীতের গৎ, পল্লীগীতি এবং পাশ্চাত্য সংগীত — কিছুই তিনি বাদ রাখছেন না। মহীশূরী, গুজরাটি, কর্ণাটকি, পঞ্জাবি, মাদ্রাজি কিংবা আইরিশ ও স্কট — বিভিন্ন প্রদেশের সুরকে আত্মস্থ করে তিনি নির্মাণ করেছেন বাংলা গান। কখনও প্রসিদ্ধ তেল্লেনা ভেঙে বাঁধছেন 'সুখহীন নিশিদিন' (মূল ঃ 'দারাদিম্ দারাদিম্' – নটমল্লার -বেহাগ)-এর মতো গান। কখনও হিন্দি লঘুসংগীতের সুরে 'ওরে ফাগুন লেগেছে বনে বনে' (মূলগান ঃ 'এরি মা সব বন অমুয়া' — পরজ-বাহার/কার্ফা)-র মতো গান তৈরি করে নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। মীরার ভজন 'মেরে গিরিধর গোপাল' (ভৈরবী/একতাল) ভেঙে 'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ' বা সেতারের গৎ থেকে 'এসো শ্যামলসুন্দর' (দেশ/ত্রিতাল)-জাতীয় গানও এই শ্রেণিতেই পড়বে। লালনগীতি 'আমি কোথায় পাব তারে'-র সুরে রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' (দাদরা তাল)-কেও ভাঙাগানের পর্যায়েই রাখতে হয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক সুরের প্রভাবে তৈরি গানগুলির মধ্যে মহীশূরী সুরে ষষ্ঠী তালে বাঁধা 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর' বা গুজরাটি সুরে দাদরা তালে বাঁধা 'এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি' প্রভৃতি গানের নাম করা যেতে পারে। এছাড়া কর্ণাটি সুরে 'বড়ো আশা করে' (মূলগান ঃ 'সখী বাবা'), পাঞ্জাবি সুরে 'বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে' (মূলগান ঃ 'বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ') অথবা মাদ্রাজি সুরে 'বাজে করুণ সুরে' (মূলগান ঃ 'নিতু চরণমূলে') প্রভৃতি গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য সুর ভাঙা অজস্র গানও তিনি রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে সম্ভবত জনপ্রিয়তম গানটি 'পুরানো সেই দিনের কথা' (মূলগান ঃ 'Auld Lang Syne')। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সুরের অনুকরণে মোট ১২টি গান তৈরি করেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) এবং 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)-এই তিনটি গীতিনাট্যেই মূলত বিদেশি সুরাশ্রিত গানের ব্যবহার দেখি। গীতিনাট্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে 'পুরানো সেই দিনের কথা' ছাড়া রবীন্দ্রনাথ মাত্র ২টি এই রকম গান রচনা করেন, 'ওহে দয়াময় নিখিল' একটি পুরানো স্কটিশ ব্যালাডের সুরে তৈরি হয়েছিল।

বিষয় ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে রবীন্দ্রনাথের গানের আরও কিছু শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এই বিভাজন সর্বজনস্বীকৃত কোনো রীতিসাপেক্ষ নয়, বরং আলোচনার সুবিধার্থে এমনটা করা হল—

আধ্যাত্মিক সংগীত : রবীন্দ্রনাথ প্রায় সাড়ে ছ'শো গান লিখেছিলেন যেখানে মরমী আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। মূলত 'পূজা' পর্যায়ের গানগুলিই এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট হলেও প্রায়শই রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীত আধ্যাত্মিকতাকে ছুঁয়ে গেছে আর সেই আধ্যাত্মিকতাও মানবীয় আনন্দ-বেদনাময় হৃদয়কে অঙ্গীকার করেছে। 'প্রেম' ও 'পূজা' মিলেমিশে গেছে। তবে এই বিভাজন গীতিকারের স্বকৃত, সুতরাং, অনস্বীকার্য। এই ধরনের কয়েকটি গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হল — 'অন্তর মম বিকশিত করো', 'এই লভিনু সঙ্গ তব', 'আর রেখো না আঁধারে', 'আমার সকল রসের ধারা' প্রভৃতি।

প্রেমসংগীত : এই ধরনের গানের সংখ্যাও প্রচুর, সাড়ে চারশো। আগেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীত ও আধ্যাত্মিক সংগীত প্রায়ই একে অপরের সম্পূরক। তেমনই ঋতু ও প্রকৃতি বিষয়ক অনেক গানও বস্তুত প্রেমসংগীতের কোঠায় পড়ার

যোগ্য। 'প্রেম' পর্যায়ের কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হলো — 'আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'সেদিন আমায় বলেছিলে' প্রভৃতি।

ঋতু ও প্রকৃতি বিষয়ক : রবীন্দ্রনাথের বহুগানেই প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে সমধিক পরিমাণে। বহুগান সরাসরি বিভিন্ন ঋতুকে উদ্দেশ্য করে রচিত। এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনে আচরিত বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি ঋতু উৎসব উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপনকে প্রকৃতিলগ্ন করে তোলায় রাবীন্দ্রিক প্রচেষ্টাটি স্মরণীয়। বর্ষা ঋতুকেন্দ্রিক গান রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সর্বাধিক ১১৫টি, বসন্ত ও শরৎ নিয়ে যথাক্রমে ৯৬টি ও ৩০টি। এছাড়া গ্রীষ্ম নিয়ে ১৬টি, শীত নিয়ে ১২টি এবং হেমন্ত ঋতুকে নিয়ে ৫টি গান রবীন্দ্রনাথ লেখেন। 'দারুণ অগ্নিবাণে', 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা', 'শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি', 'হায়! হেমন্ত লক্ষ্মী', 'এল যে শীতের বেলা', 'এস এস বসন্ত ধরাতলে' প্রভৃতি তাঁর লেখা বিভিন্ন ঋতুবিষয়ক গান।

দেশাত্মবোধক গান : মূলত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রচিত এই ধরনের গানের সংখ্যা মোট ৬২টি। এই জাতীয় গানে মূলত বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী প্রভৃতি খাঁটি বাঙালি সুরই রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই দেশের হৃদয়ের সুরকে ছুঁতে চেয়েছেন। তাঁর লেখা 'জনগণমন অধিনায়ক' এবং 'আমার সোনার বাংলা' স্বদেশ সংগীত দুটি যথাক্রমে ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের স্বীকৃতি পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই গৌরব আর কোনো কবি বা গীতিকারের নেই।

ভানুসিংহের পদাবলী : রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা নিয়ে ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে বৈষ্ণব পদাবলির অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ মোট ২২টি পদ রচনা করেছিলেন। 'ব্রজবুলি' ভাষায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম ও শেষ কাব্যপ্রচেষ্টা। বর্তমানে অবশ্য মাত্র ৯টি পদই গান হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন, 'আজু সখি মুহু মুহু', 'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে' প্রভৃতি।

আনুষ্ঠানিক সংগীত : শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক জীবনের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত বিভিন্ন গানকেই রবীন্দ্রনাথের লেখা আনুষ্ঠানিক গান বলা যেতে পারে। এর মধ্যে 'হে নূতন, দেখা দিক আরবার' (জন্মদিন উপলক্ষ্যে), 'প্রেমের মিলন দিনে' (বিবাহ উপলক্ষ্যে), 'নয়ন ছেড়ে গেলে চলে' (মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে), 'দিন অবসান হলো' (বর্ষশেষ উপলক্ষ্যে), 'জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়ের' (নববর্ষ উপলক্ষ্যে), 'এসো গৃহদেবতা' (গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে), 'আমরা চাষ করি আনন্দে' (হলকর্ষণ উপলক্ষ্যে), 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও' (বৃক্ষরোপণ উপলক্ষ্যে), 'কঠিন লোহা, কঠিন ঘুমে' (শিল্পোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত) প্রভৃতি উল্লেখ্য।

হাস্যরসাত্মক গান : বিভিন্ন নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য ও নাটকের প্রয়োজনে সামান্য কয়েকটি হাস্যরসাত্মক গান রবীন্দ্রনাথ লেখেন। এর মধ্যে 'অভয় দাও তো বলি' (চিরকুমার সভা), 'যদি জোটে রোজ এমনি' (বিনিপয়সার ভোজ) প্রভৃতি উল্লেখ্য।

শিশু সংগীত : রবীন্দ্রগানের অনেকগুলিই শিশুদের উপযোগী। 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আলো আমার আলো ওগো', 'আমরা সবাই রাজা' প্রভৃতি বহুগানই এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কবিতার গান : রবীন্দ্রনাথের কিছু গান প্রথমে কবিতা হিসেবেই লিখিত হয়। পরে সুর সংযোজিত হয়ে গানে রূপান্তরিত হয়েছে। সুর, ছন্দ, লয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' বা 'হে নিরুপমা'-র মতো গানগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

উদ্দীপক গান : রবীন্দ্রনাথের বহুগান নেতিবাচকতাকে পরিহার করে নব উদ্যমে জীবনকে আস্বাদন করতে উদ্দীপিত করে। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো', 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ' প্রভৃতি গানকে এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

মন্ত্র গান : বেদ ও উপনিষদের কিছু মন্ত্রে এবং কিছু পালি মন্ত্রে তাদের নিজস্ব ছন্দ বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ সুর সংযোজন করেন। এর মধ্যে ঋগ্বেদের ৯টি মন্ত্র, অথর্ববেদের ১টি মন্ত্র, শ্বেতাশ্বেতর-বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদের ১টি করে মন্ত্র এবং ৫টি পালি মন্ত্রে তিনি সুরারোপ করেন। এর মধ্যে ঋগ্বেদের 'শৃন্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' (ভৈরবী), শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং' (ইমন-ভূপালী), পালি মন্ত্র 'ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে' (ভৈরবী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নতুন তালের গান : আজীবন সংগীত নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ছয়টি নতুন তাল উদ্ভাবন করেছেন। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো' গানে ব্যবহৃত ঝম্পক (৩+২=৫ মাত্রা), 'নিদ্রাহারা রাতের এ গান'-এ ব্যবহৃত ষষ্ঠী (২+৪=৬ মাত্রা), 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' গানে ব্যবহৃত রূপকড়া (৩+২+২+২=৯ মাত্রা) অথবা 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' গানের একাদশী (৩+২+২+৪=১১ মাত্রা) বা 'জননী, তোমার করুণ চরণখানি' গানে ব্যবহৃত নবপঞ্চ (২+৪+৪+৪+৪=১৮ মাত্রা) তালের মতো জটিল তাল রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল সংগীতের বাণীকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে। এছাড়াও ৭ মাত্রা, ১০ মাত্রা ও ১২ মাত্রার তালও তিনি তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত ও স্বসৃষ্ট সর্বমোট ২৫ প্রকার তাল রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় প্রয়োগ করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম প্রসার কলকাতার কতিপয় ব্রাহ্ম ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারে, পরে শান্তিনিকেতনে। প্রথম যুগে তাঁর গান গাইতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য, অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতকে স্বরলিপি-নিবন্ধ করার কৃতিত্ব দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। রবীন্দ্রসংগীতকে আপামর বাঙালির কাছে প্রথম জনপ্রিয় করেন পঙ্কজ মল্লিক, কাননবালা, কে এল সায়গল প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে যাঁদের সুকণ্ঠ গায়নকৌশলে রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠল তাঁদের মধ্যে সন্তোষ সেনগুপ্ত, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, কিশোর কুমার এবং সাহানা দেবী, উমা বসু, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, রাজেশ্বরী দত্ত, ঋতু গুহ, পূর্বা দাম, গীতা ঘটক প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর একজন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংগীত ব্যক্তিত্ব ছিলেন **দ্বিজেন্দ্রলাল রায়** (১৮৬৩-১৯১৩)। আগেই বলা হয়েছে তাঁর পিতা কৃষ্ণনগর রাজসভার দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন উনিশ শতকের প্রথম দিকের খেয়ালচর্চাকারীদের অন্যতম। ভারতীয় মার্গসংগীত ছিল দ্বিজেন্দ্রলালেরও অনায়াস বিচরণক্ষেত্র। তবে ১৮৮৪-তে ইংল্যান্ড প্রবাসসূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মতোই বিদেশি সুরকেও সহজাত প্রতিভাবলে আত্মস্থ করে দেশে ফেরেন এবং পরবর্তী জীবনে সংগীতের উভয় ধারার প্রয়োগেই সিদ্ধিলাভ করেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, বাউল, কীর্তন, বৈঠকি, স্বদেশি গান, হাসির গান ও প্যারোডি — বিচিত্র ও বহুমুখী শাখায় রচিত তাঁর গানে ভারতীয় সংগীতের কমনীয়তা ও গভীরতার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রাণশক্তি ও ওজোগুণ মিলেমিশে গেছে। সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে রচিত 'এ কি মধুর ছন্দ', 'এস প্রাণসখা এস প্রাণে', 'এ কি শ্যামল সুষমা', 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' ইত্যাদি গানগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আবার রাগ-রাগিণী বা লোকসংগীত আশ্রিত গানেও পূর্বোল্লিখিত ওজোগুণের প্রকাশ দেখা যায়। 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে' (দেশ), 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে' (জয়জয়ন্তী), 'একবার গালভরা মা ডাকে' (বাউল), 'ও কে গান গেয়ে চলে যায়' (কীর্তন) প্রভৃতি গান এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বাংলা সাহিত্যে মূলত নাট্যকার হিসেবে স্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত নাটকেই সংগীতের ব্যবহার সমধিক পরিমাণে দেখা যায়। 'সোরাব রুস্তম' নাটিকাটি রচিতই হয় অপেরার ঢং-এ, 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'রাণাপ্রতাপ', 'মেবার পতন' — সমস্ত জনপ্রিয় নাটকেরই গানগুলিও জনপ্রিয় হয়েছিল। কোরাস গীতভঙ্গি প্রয়োগেও বাংলায় তিনি পথিকৃৎ-স্বরূপ। পুত্র স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞ দিলীপ কুমার রায় পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের গানকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন — পূজা, দেশ, প্রেম, প্রকৃতি ও বিবিধ। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর রচিত স্বদেশ সংগীতের কারণে। 'ধনধান্যপুষ্পভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', প্রভৃতি গান বাঙালি জীবনে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তাঁর লেখা গানগুলি দুই খণ্ডে 'আর্যগাথা' -গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুজপ্রতিম। স্বল্পকালের জীবদ্দশায় তিনি অসংখ্য স্মরণীয় গান রচনা করে গেছেন। তাঁর গানে হিন্দুস্থানি মার্গ সংগীত এবং টপ্পা, বাউল, কীর্তন প্রভৃতি সুরের প্রভাব দেখা যায়। রজনীকান্তের গানকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। **ভক্তিগীতি :** বাণী, সুর, ভাব, কাব্যমাধুর্য, স্বকীয়তা এবং সহজ চলনে তাঁর লেখা ভক্তিগীতিগুলি বাংলা গানের ভুবনে বিশিষ্ট হয়ে আছে। 'তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে', 'আমি অকৃতি অধম', 'প্রেমে জল হয়ে যাও গলে' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা উমা সংগীতগুলিও ভক্ত হৃদয়ের সহজ আকুতি ও আনন্দকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। 'ওমা, উমা, ও আনন্দ কোথা রাখি বল', 'কে দেখবি আয় আজ গিরিভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায়' ইত্যাদি গানগুলি শুনলেই একথা বোঝা যাবে। **স্বদেশী সংগীত :**

রজনীকান্ত অসামান্য কিছু দেশাত্মবোধক গানেরও রচয়িতা। 'ভারত কাব্য নিকুঞ্জে জাগো সুমঙ্গলময়ী মা', 'শ্যামল শস্যভরা চিরশান্তি বিরাজিত, পুণ্যময়ী', 'স্বস্তি! স্বাগত! সুধী, অভ্যাগত, জ্ঞান পরব্রত', 'সেই চন্দ্র সেই তপন সেই উজলধারা', 'নমো নমো নমো জননী বঙ্গ' এবং বিশেষ করে, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ও ভাই' এই শ্রেণিতে পড়বে।

হাস্যরসাত্মক গান : রজনীকান্ত বেশ কিছু হাসির গানও রচনা করেছিলেন। 'যদি কুমড়োর মতো চালে ধরে রত পানতোয়া শত শত', 'বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইলা দিছি পায়' প্রভৃতি গান এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'বাণী' (১৯০২) ও 'কল্যাণী' (১৯০৫) গ্রন্থদ্বয়ে রজনীকান্তের গানগুলি সংকলিত হয়েছে। মূলত তাঁর ভক্তিগীতির নিবিড়, আন্তরিক ও সারল্যমণ্ডিত কান্তির কারণে বাঙালি সমাজে রজনীকান্ত পরিচিত হয়েছেন 'কান্তকবি' নামে। তাঁর গান প্রসিদ্ধি লাভ করেছে 'কান্তগীতি' নামে। কান্তগীতির গায়কদের মধ্যে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, নীলা মজুমদার, পান্নালাল ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, নিশীথ সাধু, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান, উৎপলা সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অতুলপ্রসাদ সেন : বাংলা সংগীতের ধারায় **অতুলপ্রসাদ সেন** (১৮৭১-১৯৩৪) -এর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর লেখা গানগুলি 'কাকলি', 'কয়েকটি গান' ও 'গীতগুঞ্জ'-এই তিনটি বইয়ে সংকলিত হয়েছে। অতুলপ্রসাদী গানকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

রাগাশ্রয়ী গান : বাণী, কাব্য, ছন্দ ও সুরের চলন— গানের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি রেখে রাগমিশ্রণের কারণে অতুলপ্রসাদ সৃষ্ট রাগাশ্রয়ী গানগুলি অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছে। 'ডাকে কোয়েলা বারেবারে' (গৌড়মল্লার), 'মুরলী কাঁদে রাধে রাধে' (আশাবরী) এবং মিশ্ররাগে বাঁধা 'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'যাব না যাব না যাব না ঘরে', 'সে ডাকে আমারে', 'আমার বাগানে কত ফুল' ইত্যাদি বহু রসোত্তীর্ণ গান অতুলপ্রসাদ বাঙালি শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন।

গজল, টপ্পা, ঠুংরি : বাংলা ভাষায় গজল রচনায় তিনিই পথিকৃৎ। 'কে গো তুমি বিরহিণী', 'জল বলে চল', 'কত গান তো হলো গাওয়া', 'তব অন্তর এত মন্থর ' প্রভৃতি গান এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। লখনউবাসের ফলে অতুলপ্রসাদের টপ্পা ও ঠুংরি রচনাগুলিতে উত্তরপ্রদেশের কাজরী ও লগনী গানের প্রভাব পড়েছিল। 'তবু তোমারে ডাকি বারেবারে', 'কে যেন আমারে বারেবারে চায়', 'কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা' ইত্যাদি গানে সার্থক টপ্পার প্রয়োগ ঘটেছে। পিলুরাগিণী আশ্রিত 'কে আবার বাজায় বাঁশি' অথবা 'ওগো আমার নবীন সাথী' প্রভৃতি গান অতুলপ্রসাদ রচিত রসসিদ্ধ ঠুংরির উদাহরণ।

স্বদেশি সংগীত : অতুলপ্রসাদের লেখা বহু স্বদেশি সংগীতই চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এরমধ্যে 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী', 'বলো বলো বলো সবে', 'হও ধরমেতে ধীর', 'ভারতভানু কোথায় লুকালে' ইত্যাদি গান এখনও সমান জনপ্রিয়।

ঋতুসংগীত : অতুলপ্রসাদের বহু গানেই প্রকৃতি ও বিভিন্ন ঋতুর সার্থক চিত্রায়ণ রয়েছে। মল্লার রাগে নিবন্ধ 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে' বর্ষার মেজাজকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তেমনই বাহার রাগে বাঁধা 'আইল আজি বসন্ত মরি মরি', কিংবা পিলুরাগের আশ্রয়ে 'বন দেখে মোর মনের পাখি ডাকল গো' গানগুলি বসন্ত ঋতুর আবাহনে যথার্থই ঋতুসংগীত হয়ে উঠেছে।

বিবিধ : অতুলপ্রসাদ বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি প্রভৃতি দেশজ সুরে অনেক চমৎকার গান রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা বাউলাঙ্গ -কীর্তনাঙ্গ গানগুলির মধ্যে 'ওগো সাথী মম সাথী', 'আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়', 'যদি তোর হৃদযমুনা' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতুলপ্রসাদী গানের গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে রেণুকা দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন।

কাজী নজরুল ইসলাম : রবীন্দ্রনাথের পর **কাজী নজরুল ইসলামই** (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা গানের দিক্‌পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো কাণ্ডারির ভূমিকা নিয়েছিলেন। বাংলা গানের আসরে তাঁর মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ পসরা নিয়ে সম্ভবত আর কেউ

আসেননি। ১৯২৮-এ গ্রামাফোন কোম্পানির গীতিকার হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময় থেকে ১৯৪২-এ বেতার অনুষ্ঠান চলাকালীন অসুস্থ ও স্তব্ধবাক্ হয়ে পড়ার সময় অবধি মাত্র ১৪টি বছরে আনুমানিক ৩২৪৯টি গান নজরুল রচনা করেন। নজরুলের গানকে নিম্নোক্ত কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রেম ও প্রকৃতি : নজরুলের অধিকাংশ গানেরই বিষয়ভাবনায় প্রেম ও প্রকৃতিই প্রধান। 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানি', 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ঋতুসংগীত : নজরুলের বহু গানেই ঋতুর প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর লেখা ঋতুসংগীতগুলির মধ্যে 'নিদাঘের খরতাপে', 'বর্ষা ঋতু এল বিজয়ীর সাজে', 'এসো শারদপ্রাতের পথিক', 'হৈমন্তিকা এসো এসো', 'পউষ এল গো' বা 'আজি দোলপূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাগাশ্রয়ী গান : বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ব্যবহার করে নজরুল অসংখ্য গান রচনা করেছেন। যেমন 'ভোরের হাওয়া এলে' (রামকেলি/ঠুমরি), 'নারায়ণী উমা' (নারায়ণী) প্রভৃতি। তিনি নিজেও বেশ কয়েকটি রাগ উদ্ভাবন করেন। মৌলিক ও স্বসৃষ্ট রাগ-রাগিণীতে নিবন্ধ গানের মধ্যে 'দোলনচাঁপা বনে দোলে' (দোলনচাঁপা), 'চপল আঁখির ভাষায়, হে মীনাক্ষী' (মীনাক্ষী), 'হাসে আকাশে শুকতারা হাসে' (অরুণরঞ্জনী), 'রুমঝুম্ রুমঝুম্ কে বাজায় জল ঝুমি ঝুমি' (নির্ঝরিণী), 'পায়েলা বোলে রিনিঝিনি (রূপ মঞ্জরী)', 'শোন ও সন্ধ্যামালতী, বালিকাতপতী' (সন্ধ্যামালতী), 'বনকুন্তলা এলায়ে বনশবরী ঝুরে' (বনকুন্তলা), 'শঙ্কর অঙ্গলীলা যোগমায়া' (শঙ্করী), 'ভগবান শিব জাগো জাগো' (শিবানী ভৈরবী), 'জাগো অরুণ ভৈরব জাগো' (অরুণ ভৈরব) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়া 'অঞ্জলি লহ মোর' (তিলং), 'অরুণকান্তি কে গো' (আহির ভৈরব), 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' (দেশ-খাম্বাজ) ইত্যাদি গানে বিভিন্ন রাগে মিশ্র প্রয়োগে অসাধারণ মুনশিয়ানা দেখা যায়। নজরুল সৃষ্ট খেয়ালগুলিও যেমন, 'আসিলে কে অতিথি' (ভূপালি), 'মেঘমেদুর বরষায়' (জয়জয়ন্তী) এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

গজল : মধ্যপ্রাচ্যের গজল অনুসারে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে তৈরি নজরুলের লেখা বাংলা গজলগুলিও রসসিদ্ধ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', 'গুলবাগিচায় বুলবুলি আমি' প্রভৃতি গানগুলির কথা মনে পড়বে।

ইসলামি গান : জনশ্রুতি রয়েছে যে বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমদের অনুরোধেই নজরুল 'রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ' এবং 'ইসলামের ওই সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর'— গানদুটি রচনা করেন। গানদুটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর একে একে 'আল্লা নামের বীজ বুনেছি', 'নাম মোহাম্মদ বল রে মন নাম আহমদ বল', 'আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়', 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়' প্রভৃতি কালজয়ী গান নজরুল রচনা করেন।

অন্যান্য ভক্তিগীতি : নবীবিষয়ক গান ছাড়াও নজরুল বিভিন্ন সময়ে শ্রীচৈতন্য ও রামকৃষ্ণদেব বিষয়ক গান, শ্যামাসংগীত, নটরাজ ও শিবসংগীত, রামচন্দ্রবিষয়ক গান, কৃষ্ণসংগীত এবং সরস্বতী ও দুর্গা বিষয়ক বহু গান লিখেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা', 'বর্ণচোরা ঠাকুর এল', 'শ্যামা বড়ো লাজুক মেয়ে', 'বলরে জবা বল', 'নমো নটরাজ এ নাটদেউলে', 'রঘুকুলপতি রামচন্দ্র', 'বাঁশি বাজাবে কবে', 'জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোকসংগীত : শৈশবেই শেখ চাকরগোদা-র লেটো দলে প্রবেশ করার সুবাদে বহু পালাগান, লেটোগান ও শতাধিক সং-এর গান নজরুল রচনা করেন। পালাগুলির মধ্যে 'সিন্ধুবাদের সং', 'চাষার সং', 'রাজপুত্র', 'মেঘনাদবধ', 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতি উল্লেখ্য। এছাড়াও 'পদ্মার ঢেউ রে' (ভাটিয়ালি), 'ঐ রাঙামাটির পথে লো' বা 'তেপান্তরের মাঠে' (ঝুমুর), 'আমি ভাই খ্যাপা বাউল' (বাউল), 'সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ' (ছাদ পেটানোর গান)— লোকসংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিকে বাঁধা তাঁর বহু গান আছে।

স্বদেশসংগীত : নজরুলের লেখা স্বদেশি সংগীতগুলি তাঁর কবিতার মতোই শাসক ইংরেজের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর লেখা 'কারার ঐ লৌহকপাট', 'ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল' প্রভৃতি গান বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

হাস্যরসাত্মক ও প্যারোডি : হিজলি জেলে কারাবাসকালীন রবীন্দ্রনাথের লেখা 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে'-র বিখ্যাত প্যারোডি 'তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে' এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। এছাড়া 'আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিণামে লুচি', 'পিঁয়াজ বন্দনা' প্রভৃতি তাঁর রচিত বিখ্যাত হাসির গান।

হিন্দিগান : নজরুল হিন্দিভাষাতেও বেশ কিছু গান রচনা করে গেছেন। এর মধ্যে 'আগর তুম রাধা হোতে শ্যাম', 'সুন্দর হো তুম মনমোহন হো', 'পরদেশি আয়া হুঁ দরিয়াকে পার' ইত্যাদির নাম করা যায়।

নতুন তালের গান : নজরুল বেশ কিছু নতুন তালের সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে উল্লেখ্য 'আজ ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে' (মঞ্জুভাষিণী/ ১৮ মাত্রা), 'মঞ্জুল মধুছন্দা' (মণিমালা/২০ মাত্রা), 'জল ছল ছল এসো মন্দাকিনী' (মন্দাকিনী/১৬ মাত্রা), 'মহুয়া বনে বনপাপিয়া' (প্রিয়া/৭ মাত্রা) প্রভৃতি।

প্রভাবিত গান : নজরুলের গানে যেভাবে দেশ-বিদেশের সুরের প্রভাব পড়েছে তা ইতোপূর্বে আর কোনো বাঙালি সুরকারের ক্ষেত্রে বিরল। এই প্রসঙ্গে নাম করা যায় 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে' (মিশরীয় সুর), 'দূর দ্বীপবাসিনী' (কিউবান সুর), 'রেশমী রুমালে করবী বাঁধি (আরবি সুর)', 'পরী জাফরানী ঘাঘরী' বা 'যাই গো চলে যাই' (পাশ্চাত্য সুর) প্রভৃতি গানগুলির। এছাড়া 'কাবেরীনদী জলে' (কর্ণাটকী সুর), 'কাজরী গাহিয়া এস' (কাজরীর সুর) ইত্যাদি বহু গানে নানা প্রাদেশিক সুর নজরুল ব্যবহার করেছেন। নীলাম্বরী, নাগসরাবলী, নারায়ণী প্রভৃতি নানা অপ্রচলিত দক্ষিণী রাগ-রাগিণী ব্যবহারেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

গীতিনাট্য ও গীতি আলেখ্য : 'আলেয়া', 'মধুমালা', 'বনের বেদে', 'অতনুর দেশে', 'গুলবাগিচায়' প্রভৃতি নজরুলের লেখা বিখ্যাত কতগুলি গীতিনাট্য। তাঁর লেখা গীতি আলেখ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আকাশবাণী', 'শারদ শ্রী', 'বিজয়া', 'দেবীস্তুতি' ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র : সবাক্ যুগের শুরু থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত নজরুল বহু চলচ্চিত্রে একাধারে গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা, এমনকি চলচ্চিত্র পরিচালকেরও ভূমিকা নিয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এমন ছবিগুলি ছিল 'ধূপছায়া' (১৯৩১), 'ধ্রুব' (১৯৩৪), 'পাতালপুরী' (১৯৩৫), 'গ্রহের ফের' (১৯৩৭), 'গোরা' (১৯৩৮), 'বিদ্যাপতি' (১৯৩৮), 'সাপুড়ে' (১৯৩৯), 'নন্দিনী' (১৯৪১) এবং 'চৌরঙ্গী' (১৯৪২)।

সবমিলিয়ে বাণী ও সুরের বৈচিত্র্যে ও তাদের সার্থক সমন্বয়ে, প্রয়োজনে নিত্য নতুন রাগ ও তাল উদ্ভাবনে ও প্রয়োগে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ও লোকসুরের অনুসরণে, অপ্রচলিত রাগ-রাগিণীর ব্যবহারে নজরুল ইসলাম বাংলা গানের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসনের মালিক হয়ে আছেন। যাঁরা তাঁদের সুদক্ষ কণ্ঠ এবং যোগ্য গায়নে নজরুলগীতিকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কানন দেবী, যূথিকা রায়, কমল দাশগুপ্ত, ফিরোজা বেগম, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, ধীরেন বসু, পূরবী দত্ত, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, শচীনদেব বর্মন, ফেরদৌসী রহমান, নিলুফার ইয়াসমিন প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুকুন্দদাস : নজরুলের জন্মের কিছু আগে বাংলায় অন্য ধারায় আর একজন সংগীত ব্যক্তিত্ব আপামর জন-মানসে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইনি **মুকুন্দদাস** (১৮৭৮-১৯৩৪), 'চারণ কবি' নামেই যাঁর খ্যাতি সমধিক। মুকুন্দদাসের পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে। প্রথমে বীরেশ্বর দত্তের কীর্তনের দলে তিনি যোগ দেন। ১৯০০ সালে রসানন্দ ঠাকুরের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষান্তে তিনি 'মুকুন্দদাস' নামে খ্যাত হন। স্কুলজীবনে প্রখ্যাত স্বদেশি নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের ছাত্র মুকুন্দদাস ১৯০৫ সালে স্বদেশিকতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 'মাতৃপূজা' নামক বিখ্যাত পালা রচনা করেন। এই পালা নিয়ে বরিশাল, নোয়াখালি, ফরিদপুর সহ প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করার সময়ে মুকুন্দদাস জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রগুলির নজরে আসেন। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের কোপে তাঁকে তিনবছর কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়। পরবর্তী সময়ে মুকুন্দদাস গান্ধিজির আদর্শে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 'মাতৃপূজা' নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁকে বিভিন্ন

সামাজিক সমস্যা নির্ভর পালা লিখতে হয়। এই পালাগুলিতেও অবশ্য গণজাগরণ এবং স্বাদেশিকতার মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে। ১৯৩২-এ মুকুন্দদাস রচিত ‘পল্লিসেবা’, ‘ব্রহ্মচারিণী’, ‘সমাজ ও পথ’ প্রভৃতি সবকটি পালাই বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়। তাঁর লেখা ‘ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী’, ‘বান এসেছে মরা গাঙে’, ‘সাবধান ! ঐ আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড’, ‘আমি গাইব কি আর শুনবে কে’ প্রভৃতি গানগুলি সমসময়ের চাহিদা মিটিয়েও আজ পর্যন্ত সমান জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে।

দিলীপ কুমার রায় : এই সময়ের আর একজন স্মরণীয় সংগীত ব্যক্তিত্ব ছিলেন **দিলীপ কুমার রায়** (১৮৯৭-১৯৮০)। দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র দিলীপকুমার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— উভয় প্রকার সংগীতরীতিতেই সমান দক্ষ ছিলেন। ইউরোপ পরিভ্রমণ করে তিনি প্রাচীন আওনিয়ান, ডোরিয়ান, ফ্রিজিয়ান, লিডিয়ান, মিক্সোলিডিয়ান এবং এওলিয়ান মোডের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের যথাক্রমে বিলাবল, কাফি, ভৈরবী, ইমন, খাম্বাজ এবং আশাবরী ঠাটের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন। দেশে ফিরে পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রবর্তিত সংগীত পদ্ধতির প্রসার ও উন্নতির চেষ্টা করেন। ‘ভ্রাম্যমান’, ‘সাঙ্গীতিক’,‘গীতশ্রী’ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ প্রমুখ গুরুর সঙ্গ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। ভারতীয় রাগ সংগীত শিখন-শিক্ষণের পাঠক্রম রচনায় তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। শেষ জীবনে অরবিন্দ-দর্শন আশ্রিত হয়ে পণ্ডিচেরিতে স্থায়ী বাসগ্রহণের ফলে বাংলা গান বঞ্চিত হলো সম্ভাব্য প্রাপ্য সুর ও বাণীর আশ্চর্য সম্পদ থেকে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ এই পাঁচ বছরে রচিত অধিকাংশ গানই ভক্তিমূলক। হিন্দি রাগসংগীত, বাংলা কীর্তন, লোকসংগীত, পাশ্চাত্য সংগীতের বিভিন্ন ধারা তাঁর রচনায় মিশেছে। অসংখ্য হিন্দি ভজন, গীত ও দোঁহা-র তিনি মরমি অনুবাদও করেছিলেন।

হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চাটি কিছু ক্ষীণ হয়ে পড়লেও অব্যাহত ছিল। এই সময় রাগাশ্রয়ী একধরনের গানে কাব্যসংগীত ও রাগসংগীতের চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই ধরনের গানের নাম দেওয়া হল ‘**রাগপ্রধান গান**’। এই নামকরণের কৃতিত্ব সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর। রাগপ্রধান গানে শুদ্ধ ও শাস্ত্রীয় রাগ সর্বদা ব্যবহৃত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই, তবে গানটির কাঠামোয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ভাব ও অবয়ব প্রকাশ পেতে হবে। বাংলা গানের ক্ষেত্রে রাগপ্রধান গান বাঙালির একেবারে নিজস্ব সৃষ্টি। শুরুর দিকে এই গানকে যাঁরা জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রমথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ রায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, ইন্দুবালা, বিভূতি দত্ত, শচীনদেব বর্মন এবং কাজী নজরুল সবিশেষ উল্লেখ্য। এঁদের কিছু পরে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, তারাপদ চক্রবর্তী, দীপালি নাগ, চিন্ময় লাহিড়ি, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই ধারাটিকে আরও ঐশ্বর্যবান করে তুলেছেন। বর্তমানে অজয় চক্রবর্তী ও হৈমন্তী শুক্লা রাগপ্রধান গানের ধারাকে বহমান রেখেছেন।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে এমনকিছু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন বাঙালির ইতিহাসে এসেছে যা তার জীবনভঙ্গি, রুচি, অভ্যাস, মানসিকতা— সবকিছুকেই বদলে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তার ছাপ পড়েছিল বাঙালির সংগীতেও। ১৯৩১ সালে সবাক চলচ্চিত্রের যাত্রারম্ভ, রেডিয়োর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, গ্রামাফোনের ব্যাপ্ত প্রসার এবং আরও নানা কারণে বাংলা গানের অনেক শ্রোতা একসঙ্গে তৈরি হলো এইসময়। বাজার ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে গ্রামাফোন কোম্পানি রেকর্ডিং শুরু করল জনপ্রিয় শাখার গান। রেকর্ড ও রেডিয়ো বাহিত সেই গান আবার ওই বাজার, তথা সমগ্র জাতির রুচিকেও গড়েপিটে নিতে লাগল।

এই সময় থেকেই সংগীতের ক্ষেত্রে শিল্প বিভাজন শুরু হল। চর্যা থেকে শুরু করে এর কিছুকাল আগের ধরা যাক, অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত এমনটা ভাবাই যেত না। একটি গান ছিল সুর, বাণী ও কণ্ঠের দিক থেকে একজন স্রষ্টার অখণ্ড ও জৈব একটি নির্মাণ। একটিই গানের ভিন্ন ভিন্ন গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পীর কল্পনাও তখন করা হতো না। জনপ্রিয় গান পরবর্তী শিল্পীরা অবশ্যই গেয়েছেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও গীতিকার ও সুরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন। তাছাড়াও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এমন শিল্পবিভাজন এবং সংগীতের পণ্যায়ন তিরিশের দশকের আগে কখনোই দেখা যায়নি। এই অর্থেই বাংলা গানের ভুবনে এই সময় আবির্ভূত হলো **বাংলা আধুনিক গান**। বাংলা গানের জগতে প্রথম বাজার অর্থনীতি এবং পপ

কালচারের দ্যোতক হয়ে উঠল এই ধারাটি। এই পর্বে বাংলা গানের মূল দুটি ধারা অর্থাৎ আধুনিক গান আর সিনেমার গান উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যাবে বাংলা গানের সমগ্র ইতিহাসকে মন্থন করে, ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেই নতুনকে আবাহন করা হয়েছে। গান হয়ে উঠল বিপণনের সামগ্রী। গানের সঙ্গে শুরু হলো যন্ত্রানুষঙ্গের ধারা। গানে বাঁশি, তবলা, এসরাজ, সারেঙ্গি, সেতার ইত্যাদি দেশি যন্ত্রের সঙ্গে ক্লারিওনেট, বেহালা, চেলো, ড্রাম, অ্যাকর্ডিয়ান, গিটার, ডাবল বাস প্রভৃতি বিদেশি যন্ত্রও ব্যবহৃত হলো। ইতিমধ্যে সবাক্ ছবির যুগ শুরু হতেই বিভিন্ন স্টুডিয়োকে কেন্দ্র করে মাইনে করা গীতিকার, সুরকার ও যন্ত্রশিল্পীরা একযোগে নানাবিধ পরীক্ষায় রত হলেন।

এর পরবর্তীকালে আসবে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ', 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ', 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ' এবং 'গণসংগীত'-এর কথা। বিশ শতকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ — এইসবেরই যুগপৎ প্রবল অভিঘাতে দেশের স্থিতাবস্থা সম্পূর্ণ টলে গিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র জাতি এক অসহন আবেগের তুঙ্গ মুহূর্তে পৌঁছেছিলেন এই সময়। এইসবের ফলস্বরূপ ভারতের শোষিত জনসাধারণের সংগীত এক নতুন জীবনদর্শনে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। এই সংগীতই পরবর্তী সময়ে আখ্যা পেল **গণসংগীত**-এর। 'জাগো দেশবাসী, জাগো রে কিষান', 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ', 'হৈ হৈ হৈ জাপান ঐ, আসিছে ঐ' প্রভৃতি গান এই সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রেল ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহ, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে' বা 'নীল সমুদ্র লাল হয়ে গেল, নাবিকের রক্তধারায়'— জাতীয় বহু সাড়া জাগানো গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছিল, পাশ্চাত্য সংগীত, পাশ্চাত্য বৃন্দগান, দেশীয় সংগীত ও বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীতের ধারা গণসংগীতের সাংগীতিক কাঠামোকে ঋদ্ধ করেছিল। গণসংগীতের বিস্তৃত অঙ্গনে বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, **হেমাঙ্গ বিশ্বাস**, সলিল চৌধুরী, মোহিনী চৌধুরি, পরেশ ধর, নিবারণ পণ্ডিত, প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃদয় কুশারী, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু গুণী মানুষের পদচারণা সম্ভব হয়েছিল। **জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের** 'নবজীবনের গান' বাংলা গানের ইতিহাসে অতুলনীয় একটি সম্পদ। সলিল চৌধুরী সুকান্তের 'রানার', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পালকির গান' অথবা নিজের লেখা 'গাঁয়ের বধূ', গানগুলিতে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের শ্রমদীর্ণ জীবনের টুকরো ছবি ব্যালাডের মতো নানা সুরের ছকে বুনে অপূর্ব নতুনত্ব এনেছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গানগুলি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সলিল চৌধুরী সম্বন্ধে পরে আলাদাভাবে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত প্রমুখ শিল্পীও নিয়মিত গণনাট্য সংঘের হয়ে গণসংগীত পরিবেশন করেছেন। পরবর্তী সময়ে অজিত পান্ডে, সুরেশ বিশ্বাস, মেঘনাদ, নরেন মুখোপাধ্যায়, অনুশ্রী ও বিপুল চক্রবর্তী, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত প্রমুখের মাধ্যমে বহমান থেকেছে।

সলিল চৌধুরী :

বাংলা সংগীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন সলিল চৌধুরী (১৯২৩-১৯৯৫)। প্রথম জীবনে গণসংগীতের স্রষ্টারূপে তিনি বাংলা গানের জগতে এক নবদিগন্তের সূচনা করেন। তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোনো বিশেষ ধরনের গানের ক্ষেত্রে তাঁর মতো বিরল প্রতিভাধর শিল্পী সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না। সুরের জগতে তিনি সবধরনের গানে বাংলা তথা সারা ভারতের সংগীত প্রেমীদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত।

গনসংগীতের ক্ষেত্রে— 'বিচারপতি', 'রানার' 'অবাক পৃথিবী' প্রভৃতি বহু গানের স্রষ্টা তিনি। এক্ষেত্রে কোরাস গায়নপদ্ধতি নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এই পর্যায়ের বিখ্যাত গানগুলি হল— 'ও আলোর পথযাত্রী', 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে', 'হেই সামালো', 'মানব না বন্ধনে' 'আমার প্রতিবাদের ভাষা' প্রভৃতি।

সলিল চৌধুরীর সুরসৃষ্টির ব্যাপ্তি ঘটেছে বাংলা আধুনিক গান ও চলচ্চিত্রের গানে। ১৯৪৯-এ 'পরিবর্তন' ছবির সংগীত পরিচালকরূপে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫৩ -এ 'দো বিঘা জমিন' ছবির সূত্রে হিন্দি চলচ্চিত্রের জগতে তিনি

পা রাখেন। সুদীর্ঘ সংগীত নির্দেশনার জীবনে সলিল চৌধুরী ৪০টি বাংলা ছবিতে, প্রায় ৭৫টি হিন্দি ও ২৬টি মালয়ালম ছবিতে সুরকার রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এছাড়াও ভারতের আরও প্রায় আট-দশটি ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনা করেন। তাঁর সংগীত পরিচালনায় বাংলা ছবিগুলির মধ্যে বাঁশের কেল্লা (১৯৫৩), বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৫৯), গঙ্গা (১৯৬০), কিনু গোয়ালার গলি (১৯৬৪) অয়নান্ত (১৯৬৪), লালপাথর (১৯৬৪), রক্তাক্ত বাংলা (১৯৭২), আকালের সন্ধানে (১৯৮০), হারানের নাতজামাই (১৯৯১), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আর হিন্দি ছবির মধ্যে জাগতে রহো (১৯৫৬), মুসাফির (১৯৫৭), মধুমতী (১৯৫৮), পরখ (১৯৬০), হাফটিকিট (১৯৬২), আনন্দ (১৯৭১), মৃগয়া (১৯৭৭), স্বামী বিবেকানন্দ (১৯৯৪) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

বাংলা আধুনিক গানে সলিল চৌধুরী এমন এক মহান স্রষ্টা, যাঁর প্রভাব আজও অনস্বীকার্য। তাঁর সৃষ্ট আধুমিক গানগুলি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (মনের জানালা ধরে, আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা, দুরন্ত ঘূর্ণি, ধিতাং ধিতাং বলে প্রভৃতি) শ্যামল মিত্র (দূর নয় বেশি দূর ওই, ওই আঁকাবাঁকা পথ, যদি কিছু আমারে শুধাও, যাক ধুয়ে যাক মুছে যাক প্রভৃতি) লতা মঙ্গেশকর (না মন লাগে না, আজ নয় গুনগুন, যারে যারে উড়ে যারে পাখি, কেন কিছু কথা, সাত ভাই চম্পা, কী যে করি প্রভৃতি) সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা, নি সা গামা পা নি সা রে গা, সজনীগো কথা শোনো, ও নীল নীল পাখি, প্রভৃতি) সবিতা চৌধুরী (মরি গো হায় গো হায়, হলুদ গাঁদার ফুল, ও বউ কথা কও বলে পাখি, প্রজাপতি প্রজাপতি, এনে দে এনে দে ঝুমকা, সুরের এই ঝরঝর ঝরনা প্রভৃতি) এছাড়াও আরও বহু শিল্পীর কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর গান অমর হয়ে আছে। সলিল চৌধুরীর প্রতিভা ও অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন এখনও হয়নি। শুধু এটুকু বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের পর এমন বহুমুখী সংগীত প্রতিভা বাংলা গানের জগতে আসেনি।

সলিল চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বম্বে ইয়ুথ কয়্যারের অনুপ্রেরণায় ১৯৫৮ সালে সলিল চৌধুরী এবং সত্যজিৎ রায়ের অভিভাবকত্বে **রুমা গুহঠাকুরতা**র নেতৃত্বে **ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার**-এর যাত্রা শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি.বালসারা প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে কোপেনহেগেন বিশ্ব যুব উৎসবে প্রথম পুরস্কার লাভসহ ভারষবর্ষের স্বাধীনতা লাভের রজত জয়ন্তী, নেলসন ম্যান্ডেলার অভ্যর্থনা এবং নোবেল প্রাপক অমর্ত্য সেনের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানেও ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার সাফল্যের সঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেছে। তাদের বিভিন্ন অ্যালবামগুলির মধ্যে 'বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি', 'মানুষের গান গাই', ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম', 'স্বদেশী যুগের গান', 'শিকল ভাঙার গান', প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা আধুনিক গানের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারার গানে গীতিকারদের মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তুলসী লাহিড়ি, নজরুল ইসলাম, প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, হীরেন বসু, হিমাংশু দত্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত, শ্যামল গুপ্ত, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সুরকারদের মধ্যে পঙ্কজ মল্লিক, অজয় ভট্টাচার্য, হিমাংশু দত্ত, বাণীকুমার, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, দিলীপ কুমার রায়, রাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সুধীরলাল চক্রবর্তী, অনিল বাগচী, কমল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, দুর্গা সেন, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেন দাশগুপ্ত, শচীন দেববর্মন, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখ্য। শিল্পীদের মধ্যে নাম করা যায় দিলীপ কুমার রায়, পঙ্কজ মল্লিক, কে এল সায়গল, সাবিত্রী ঘোষ, ফুল্লনলিনী, প্রফুল্লবালা, মনোরমা, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, যূথিকা রায়, শৈল দেবী, উমা বসু, জগন্ময় মিত্র, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সুখেন্দু গোস্বামী, জটাধর পাইন, শচীন গুপ্ত, উমাপদ ভট্টাচার্য, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, শচীন দেববর্মন, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মান্না দে, সুধীর সেন, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, গীতা দত্ত, অখিলবন্ধু ঘোষ, মৃণাল চক্রবর্তী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, সনৎ সিংহ, দিলীপ সরকার, আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, ইলা বসু প্রমুখ অসংখ্য গুণী মানুষের।

শচীন দেববর্মন : কুমিল্লার মানুষ **শচীন দেববর্মন** ছিলেন বাংলা আধুনিক গান, চলচ্চিত্রের গান, লোক-সংগীত এবং রাগপ্রধান গানের অবিস্মরণীয় এক শিল্পী। সংগীত পরিচালক হিসেবে বাংলা এবং হিন্দি ছবির দুনিয়ায় দীর্ঘ সময় তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, খলিফা বাদল খাঁ এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এর কাছে সংগীতের পাঠ নিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'সুদূরের প্রিয়ে' (১৯৩৫) ছবিতে সংগীত নির্দেশনার মধ্য দিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রের জগতে প্রবেশ। বিভিন্ন সময়ে 'যখের ধন', 'অমরগীতি', 'ছদ্মবেশী', 'অভয়ের বিয়ে', 'মাটির ঘর', 'কলঙ্কিনী', 'সমর', 'দেবদাস', 'চৈতালি' প্রভৃতি ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কণ্ঠে 'বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে', 'আমি সহিতে পারি না বালা', 'আমি টাকডুম টাকডুম বাজাই', 'শুন গো দখিন হাওয়া', 'তুমি এসেছিলে পরশু', 'বিরহ বড়ো ভালো লাগে', 'বাজে না বাঁশি ', 'মন দিলো না বঁধু', বা 'পদ্মার ঢেউ রে', 'তেপান্তরের মাঠে', 'চোখ গেল, চোখ গেল— কেন ডাকিস রে' প্রভৃতি নজরুলগীতিগুলি চিরকালের জন্য বাঙালির শ্রুতি সুখকর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন বহু পুরস্কার, তার মধ্যে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমী পুরস্কার (১৯৫৮), এশিয়া ফিল্ম সোসাইটি পুরস্কার (১৯৫৮), সেরা পুরুষ গায়কের জাতীয় পুরস্কার (১৯৭০), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার (১৯৭৪) সহ একাধিকবার ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাহুল দেববর্মন পিতার উত্তরাধিকারকে কেবল সার্থকভাবে বহনই করেননি, প্রসারিতও করেছিলেন।

জগন্ময় মিত্র ছিলেন আধুনিক বাংলা গানের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর গায়নভঙ্গিমার বিশিষ্টতায় তিনি বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তাঁর গাওয়া বিভিন্ন গানগুলির মধ্যে — 'নয়নে নয়ন মেলি', 'বৃষ্টি যখন রোদন করে', 'কেমন করে কাটে যে মোর রাত', 'ভুল করে আমি ভালোবেসে' প্রভৃতি গান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে 'তুমি আজ কতদূরে' বা কমল দাশগুপ্তের সুরে 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়' প্রভৃতি গান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তবে ১৯৩৮ সালে গাওয়া নজরুলগীতি ' শাওন রাতে যদি' গানটি তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে।

অখিলবন্ধু ঘোষ ছিলেন আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী। তাঁর গাওয়া বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে 'ও দয়াল, বিচার করো', 'কেন তুমি বদলে গেছো', 'যেন কিছু মনে করো না', 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা', 'আজি চাঁদনি রাতি গো', 'এমনি দিনে মা যে আমার', 'ঐ যে আকাশের গায়ে, দূরের বলাকা ভেসে যায়' প্রভৃতি বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য আধুনিক বাংলা গান এবং শ্যামাসংগীত ছাড়াও শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, কীর্তন, ভজন, নজরুলগীতি, রামপ্রসাদী এবং বাউল গানেও অনায়াস পদচারণা করেছেন। গীতিকার হিসেবেও 'শ্রী পার্থ' এবং 'শ্রী আনন্দ' ছদ্মনামে প্রায় ৪০০-র মতো গান লিখেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে 'যদি ভুলে যাও মোরে', 'রিমঝিম্ একী গো বরষা', 'মাটিতে জন্ম নিলাম', 'এই ঝির্ ঝির্ ঝির্ বাতাসে', 'ঝনন ঝন' প্রভৃতি গান বাংলা গানের ভুবনে চিরস্থায়ী সম্পদ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগের প্রধানতম রূপকারদের মধ্যে একজন। সংগীত শিল্পী, সংগীত নির্দেশক এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন বর্ণাঢ্য ও চমকপ্রদ। হিন্দি ছবির জগতে হেমন্তকুমার নামে তিনি দীর্ঘদিন মুম্বই ফিল্ম জগতকেও শাসন করেছেন। সলিল চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং উভয়ের যুগলবন্দীতে অজস্র স্মরণীয় গানের সৃষ্টি হয়েছে। শৈলেশ দত্তগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৭ সালে বাংলা বেসিক ডিস্কের গানে তাঁর আত্মপ্রকাশ। বাংলা ছবির জগতে ১৯৪১ সালে 'নিমাই সন্ন্যাস' ছায়াছবিতে নেপথ্য শিল্পী হিসেবে হেমন্ত গাওয়া শুরু করেন। রবীন্দ্রসংগীতেও হেমন্ত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। বাংলা ছায়াছবির জগতে 'শাপমোচন', 'হারানো সুর', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'সূর্যতোরণ', 'নীল আকাশের নীচে', 'দীপ জ্বেলে যাই', 'মরুতীর্থ হিংলাজ', '২২শে শ্রাবণ', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সপ্তপদী', 'দাদাঠাকুর', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'সাত পাকে বাঁধা', 'বালিকাবধূ', 'পরিণীতা', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'গণদেবতা', 'দাদার কীর্তি', 'সুবর্ণগোলক', প্রভৃতি অসংখ্য ছবিতে তিনি অমর সমস্ত সুর সৃষ্টি করে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'মুছে যাওয়া দিনগুলি', 'আমায় প্রশ্ন করে', 'ও নদী রে একটি কথা', 'অলির কথা শুনে', 'পথের ক্লান্তি ভুলে', 'কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা', 'এই মেঘলা

দিনে একলা', 'এই রাত তোমার আমার', ' আয় খুকু আয়', 'এই পথ যদি না শেষ হয়', 'নীড় ছোটো ক্ষতি নেই', 'দুস্তর পারাবার পেরিয়ে', 'সূর্য ডোবার পালা' প্রভৃতি গানগুলি বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

মান্না দে-র প্রকৃত নাম ছিল প্রবোধচন্দ্র দে। শৈশবে কাকা সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে এবং পরে ওস্তাদ দবীর খাঁ-র কাছে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম প্রাপ্ত হন। তাঁর অন্যান্য গুরুদের মধ্যে ছিলেন ওস্তাদ আমন আলি খান, ওস্তাদ আবদুল রহমান খান। ১৯৪২ সালে 'তামান্না' ছবিতে সুরাইয়ার সঙ্গে গাওয়া 'জাগো, আয়ি উষা' গানটির মধ্যে দিয়ে তাঁর নেপথ্য শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। সর্বমোট প্রায় ১২৫০ টি বাংলা গান তিনি গেয়েছেন। এর মধ্যে ৬১১টি চলচ্চিত্রে এবং ৩৫৬টি আধুনিক গান তাঁর গাওয়া। এছাড়া ৪৬টি রবীন্দ্র সংগীত, ৮৪টি শ্যামা সংগীত, ৩টি দ্বিজেন্দ্রগীতিসহ আরো কত ধরনের গান যে তিনি গেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। বাংলা ও হিন্দি ছাড়া ভোজপুরী, মৈথিলি, পাঞ্জাবি, অসমিয়া, ওড়িয়া, গুজরাতি, মারাঠি, নেপালি, কন্নড় এবং মালায়লম ভাষাতে তিনি গান গেয়েছেন। 'লালনফকির', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'গণদেবতা', 'দেবদাস', 'ভোলা ময়রা', 'সন্ন্যাসী রাজা', 'ফুলেশ্বরী', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'বসন্ত বিলাপ', 'মর্জিনা-আবদল্লা', 'মৌচাক', 'ছদ্মবেশী', এন্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি ছবিতে গাওয়া তাঁর বিভিন্ন গান বাঙালির চিরস্থায়ী সম্পদ। 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে', 'দীপ ছিল শিখা ছিল', 'চারদেয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে', 'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও', 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা', 'সব খেলার সেরা', 'যদি কাগজে লেখো নাম', 'রিমঝিম ঝিম বৃষ্টি', 'হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা', 'আমি যে জলসাঘরে', 'আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না'-র মতো গান বাঙালির অক্ষয় সম্পদ। তাঁর মতো এমন বহুক্ষেত্রে বিচরণকারী কণ্ঠশিল্পী সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিরল। সংগীতশিল্পে অবদানের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' (১৯৭১), 'পদ্মভূষণ' (২০০৫) এবং 'দাদাসাহেব ফালকে' (২০০৭) পুরস্কারে ভূষিত করেন। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেন।

শ্যামল মিত্র ছিলেন আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন সংগীতশিল্পী, সুরকার এবং প্রযোজক। হিন্দি, অহমিয়া ও ওড়িয়া ছবিতেও তিনি গান গেয়েছেন। কৈশোরেই গণনাট্য এবং সলিল চৌধুরীর সংস্পর্শে আসেন এবং ভগিনী রেবার সঙ্গে 'ও আলোর পথ যাত্রী' গানটিতে কণ্ঠ দান করেন। ১৯৪৯-এ 'সুনন্দার বিয়ে' ছবিতে নেপথ্য শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও ১৯৫২ সালে সুধীরলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর গাওয়া 'স্মৃতি তুমি বেদনার' গানটি তাঁকে খ্যাতির তুঙ্গে তুলে দেয়। সংগীত পরিচালক হিসাবে শতাধিক ছবিতে তিনি কাজ করেছেন, এর মধ্যে— যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ভ্রান্তিবিলাস, দেয়া-নেয়া, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট, বনপলাশীর পদাবলী, অমানুষ, আনন্দ আশ্রম, ধনরাজ তামাং, কলঙ্কিনী, কেনারাম-বেচারাম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর কণ্ঠে 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে', 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা', 'আমি তোমার কাছেই ফিরে আসব', 'তিনটি মন্ত্র নিয়ে যাদের জীবন', 'এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে' ইত্যাদি গান বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় : সংগীতশিল্পী এবং সংগীত পরিচালক হিসেবে **মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়** ছিলেন আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রধান স্থপতি। শৈশবেই কাকা সিদ্ধেশ্বর ও রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত এবং কীর্তনের তালিম নেন। ১৯৫৩ সালে 'নাই চন্দনলেখা শ্রীরাধার চোখে নাই নাই শ্যামরাই' গানটি ডিস্ক আকারে বের হওয়া মাত্র শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁর অন্যান্য গানের মধ্যে 'এমনি করে পড়বে মনে', 'ঘুমায়ো না সহেলি গো', 'আমি পারিনি, বুঝিতে পারিনি', 'ময়ূরকণ্ঠী রাতের নীলে', 'তারই চুড়িতে মন রেখেছি', 'যদি আমাকে দেখো তুমি উদাসীন' প্রভৃতি এবং তাঁর নিজের সৃষ্ট 'আমি এতো যে তোমায় ভালোবেসেছি' গানটি বাঙালির স্মৃতির মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। তাঁর নির্দেশনায় বিভিন্ন ছবির সংগীতের মধ্যে মণি আর মানিক (১৯৫৪), ধুলার ধরণী (১৯৫৪), অনুষ্টুপ ছন্দ (১৯৬৪), উত্তর পুরুষ (১৯৬৬), জয়জয়ন্তী (১৯৭১), দেবী চৌধুরানী (১৯৭৪), ইন্দিরা (১৯৮৩) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুলগীতিতেও তাঁর অসামান্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর গাওয়া স্মরণীয় নজরুলগীতিগুলি হল— 'গাহো নাম অবিরাম', 'তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয়, 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী', 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' প্রভৃতি।

নির্মলেন্দু চৌধুরী বাংলা লোকসংগীত জগতের স্মরণীয় একজন ব্যক্তিত্ব। প্রথম যৌবনে ময়মনসিংহের লোকসংগীতের দুজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব আবদুল মজিদ এবং আবদুর রহিমের কাছে তিনি লোকসংগীতের পাঠ নেন। পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনে অশোকবিজয় রাহার কাছে রবীন্দ্র সংগীতেরও শিক্ষা নেন। লোকভারতী নামে লোকসংগীত চর্চা ও শিক্ষাকেন্দ্র

(কলকাতা) স্থাপন তাঁর অন্যতম বড়ো কীর্তি। বাংলার লোকসংগীতকে দেশে-বিদেশে পরিচিত ও জনপ্রিয় করার ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘের সদস্য নির্মলেন্দুর সংগৃহীত গানের সংকলন 'এপার বাংলা ওপার বাংলার গান' বইটি এই বিষয়ক একটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা পাবে। লোকসংগীতে আজীবনের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁর গলায় বিখ্যাত হয়েছে এমন কয়েকটি লোকসংগীতের মধ্যে 'সোহাগ চাঁদবদনী', 'সাগরকূলের নাইয়া রে', 'তোমার মতো দয়াল বন্ধু', 'বলি ও ননদি', ' ভালো কইরা বাজাও গো দোতারা', ' ও কানাই পার করে দে', 'চাঁদ সদাগর' প্রভৃতি বাংলা গানের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদের মর্যাদা পাবে।

গীতা দত্ত ১৯৪৬ সালে কে. হনুমান প্রসাদের তত্ত্বাবধানে 'ভক্ত প্রহ্লাদ' ছবির সূত্রে নেপথ্য শিল্পী হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। তাঁর স্বামী ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব গুরু দত্ত। গীতা দত্ত বাংলা এবং হিন্দি ছবিতে অভিনেত্রী হিসেবেও কাজ করেন, ১৯৬৭ সালে নির্মিত 'বধূবরণ' ছবিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তাঁর গাওয়া বিভিন্ন বাংলা গানের মধ্যে 'ঝনক ঝনক কনক কাঁকন বাজে', 'কৃষ্ণচূড়া আগুন', 'তুমি বিনা এ ফাগুন', 'এই তো হল পরিচয়', 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়', 'বৃন্দাবনে শ্যাম নাই', 'শচীমাতা গো', প্রভৃতি গান চিরস্মরণীয়।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণকণ্ঠী শিল্পীদের তালিকায় **সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের** নাম একদম প্রথম সারিতে থাকবে। তিনি পণ্ডিত এ.টি. কানন, পণ্ডিত চিন্ময় লাহিড়ী, ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ এবং ওস্তাদ মুনাব্বর আলি খাঁ-র কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নেন। ১৭ বছর বয়সে রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত নির্দেশনায় 'অঞ্জনগড়' ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। তাঁর গাওয়া বিভিন্ন গানের মধ্যে 'চম্পা চামেলি গোলাপের বাগে', 'তুমি না হয় রহিতে কাছে', 'এ গানের প্রজাপতি', ' হারানো হিয়ার', 'তুহুঁ মম মন প্রাণ হে', 'আকাশের অস্তরাগে', ' সাত ভাই চম্পা', 'ওগো মোর গীতিময়', ' উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা', ' ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকিমিকি তারা', ' এ শুধু গানের দিন' প্রভৃতি গান বাঙালি হৃদয়ের পরম আদরের ধন হিসেবে চির অমলিন হয়ে থাকবে। উত্তম-সুচিত্রার জুটির মতোই হেমন্ত- সন্ধ্যা এবং মান্না-সন্ধ্যা জুটিও প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে 'বঙ্গবিভূষণ' পুরস্কারে সম্মানিত করেন।

আরতি মুখোপাধ্যায় : শৈশবে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিমপ্রাপ্ত **আরতি মুখোপাধ্যায়** ১৯৫৮ সালে হিন্দি ছবি 'সাহারা'য় প্রথম নেপথ্য শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা ছায়াছবির জগতে 'কন্যা' ছবির সুবাদে ১৯৬২ সালে তাঁর প্রথম পদার্পণ। 'শত্রু', 'ইন্দিরা', 'অমরগীতি', 'দাদার কীর্তি', 'গণদেবতা', 'বাবা তারকনাথ', 'আনন্দ আশ্রম', 'হংসরাজ', 'হারমোনিয়াম', 'বসন্ত বিলাপ', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার', 'সুবর্ণরেখা' প্রভৃতি ছবিতে তার গাওয়া অজস্র গান স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলা ও হিন্দি ছাড়া অসমিয়া, ওড়িয়া, মণিপুরী, গুজরাতি ভাষাতেও তিনি গেয়েছেন। তাঁর গাওয়া বিভিন্ন গানের মধ্যে 'বন্য বন্য এ অরণ্য', 'তখন তোমার একুশ বছর', 'এই মন জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে', 'যদি আকাশ হতো আঁখি', 'বেশ তো না হয় কিছু না দিতে', 'টাপুর টুপুর সারা দুপুর' প্রভৃতি গান বিশেষ উল্লেখ্য। ১৯৬৭ সালে 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে গানের জন্য 'বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' পুরস্কার, ১৯৭৬ সালে 'ছুটির ফাঁদে' ছবির নেপথ্য শিল্পী হিসেবে ঐ একই পুরস্কার এবং ১৯৮৩ সালে 'মাসুম' ছবির নেপথ্য শিল্পী হিসেবে 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার অধিকার করেন।

নির্মলা মিশ্র শৈশবে পিতা পণ্ডিত মোহিনীমোহন মিশ্রের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম নেন। তাঁর গাওয়া বিভিন্ন গানের মধ্যে 'এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না', 'ও তোতা পাখি রে', 'নয়নে কাজল নেই', 'কেউ কথা বোল না গো', 'বল তো আরশি তুমি', 'তোমার আকাশ দুটি চোখে' গানগুলি রয়েছে। দীর্ঘ সংগীত জীবনে তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মাননার অধিকারিণী হয়েছেন।

হৈমন্তী শুক্লা : শৈশবেই হিন্দুস্তানি রাগ সংগীতে রীতিমতো শিক্ষিত **হৈমন্তী শুক্লার** গুরু ছিলেন তাঁর পিতা পণ্ডিত হরিহর শুক্লা। ১৯৭২ সালে 'এ তো কান্না নয় আমার' গানটি রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে বাংলা গানের জগতে তাঁর পা রাখা। বিভিন্ন সময়ে গান গেয়েছেন 'আমি, সে ও সখা', 'সিস্টার', 'দর্পচূর্ণ', 'ভক্তের ভগবান', 'গান্ধর্বী', 'মুসলমানীর গল্প' প্রভৃতি ছবিতে। 'কেন ঘুম ভাঙালে', 'আমার বলার কিছু ছিল না', 'চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে', 'দে দে সখী, চোখে নীলাঞ্জন', 'মন

বন-পাখি চন্দনা', 'এইবার স্বপ্নের বন্ধন খুললাম', 'সাজানো বন্ধু, ভুল বুঝো না,' 'চঞ্চল ঝিলমিল পাখনায়' প্রভৃতি গান যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বাংলা রাগপ্রধান গানের শিল্পী হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন সুরশৃঙ্গার আকাডেমির মিয়া তানসেন পুরস্কার (১৯৮২) এবং কলাকার পুরস্কার (২০০৫)।

কিশোর কুমার (প্রকৃত নাম আভাসকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র সংগীতের জনপ্রিয়তম পুরুষকণ্ঠ। তাঁর আগে বা পরে অনেক গুণী এবং প্রতিভাবান শিল্পী ছায়াছবির গানকে সমৃদ্ধ করলেও কিশোরকুমারের মতো ভারতজোড়া, আট থেকে আশি সকলের কাছে এমন সর্বমান্য জনপ্রিয়তা আর কেউই পাননি। বাংলা ও হিন্দি ছাড়াও মারাঠি, অহমিয়া, গুজরাতি, কন্নড়, ভোজপুরী, মালয়ালম এবং উর্দু ভাষাতেও তিনি অনেক গান গেয়েছেন। দাদা অশোককুমারের সূত্রে মুম্বাই ফিল্ম জগতের সঙ্গে অত্যন্ত কমবয়সে তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং 'বম্বে টকিজ'-এর হয়ে একজন কোরাস গায়ক হিসেবে কিশোর এই দুনিয়ায় পা রাখেন। ১৯৪৬-এ 'শিকারী' ছবির মাধ্যমে অভিনেতা হিসেবে এবং ১৯৪৮-এ হেমচাঁদ প্রকাশের সংগীত নির্দেশনায় 'জিদ্দি' ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীরূপে কিশোর আত্মপ্রকাশ করেন। আমৃত্যু প্রায় ৪০ বছরের সংগীত জীবনে কিশোরকুমার বাংলা এবং মুম্বাই-এর সমস্ত প্রথম শ্রেণির সুরকারদের সঙ্গে কাজ করেছেন, গান গেয়েছেন সুদীর্ঘ ৪০ বছরের বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের সমস্ত প্রধান ও নেতৃস্থানীয় পুরুষ অভিনেতাদের কণ্ঠে। কিশোর একই সঙ্গে ছিলেন গায়ক, সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা, চিত্রপরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্য রচয়িতা এবং রেকর্ড প্রযোজক। সারাজীবনে মোট ৮ বার ফিল্ম্ ফেয়ার পুরস্কার জিতে নেন, যা এখনো রেকর্ড। মধ্যপ্রদেশ সরকার হিন্দি ছবিতে অবদানের জন্য জাতীয় কিশোরকুমার পুরস্কার চালু করেছেন। কিশোরকুমারের গাওয়া অজস্র গানের মধ্যে 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ', 'আকাশ কেন ডাকে', 'আজ এই দিনটাকে', 'আমার পূজার ফুল', 'বিপিনবাবুর কারণসুধা', 'এই যে নদী', 'আজ এই দিনটাকে', 'একপলকের একটু দেখা', 'এক টানেতে যেমন-তেমন', 'কারো কেউ নই তো আমি', 'মন জানলা খুলে দে না', 'সেই রাতে রাত ছিল' প্রভৃতি অজস্র গান বাঙালি জীবনের পালাপার্বণ, অবকাশ যাপন, প্রেমে পড়া এবং সম্পর্ক ছেদের বিভিন্ন মুহূর্তের অমরসঙ্গী হয়ে উঠেছে।

ভূপেন হাজারিকা : বহুমুখী কর্মপ্রতিভার অধিকারী **ভূপেন হাজারিকা** ছিলেন গীতিকার, সুরকার, গায়ক, কবি এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা। মূলত অহমিয়া ভাষায় গান রচনা করলেও তাঁর বহু গান বাংলা এবং হিন্দি ভাষায় অনূদিত এবং রূপান্তরিত হয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলো। বস্তুত 'বিস্তীর্ণ পারবে' অবলম্বনে 'বিস্তীর্ণ দু-পারে', 'মুই এতি যাযাবর' অবলম্বনে 'আমি এক যাযাবর', 'গঙ্গা মোর মা' অবলম্বনে 'গঙ্গা আমার মা', 'মানুহে মানুহর বাবে' অবলম্বনে 'মানুষ মানুষের জন্য' প্রভৃতি গান বাংলা সংস্কৃতির স্থায়ী অঙ্গ হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে অনুবাদক হিসাবে বিখ্যাত গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভূমিকা অবশ্য- স্মর্তব্য। ভূপেন হাজারিকা সারাজীবনে যা যা পুরস্কার পান তার মধ্যে সেরা সুরকারের জাতীয় পুরস্কার (১৯৭৫), সংগীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৭), দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৯২), পদ্মশ্রী (১৯৯৭), পদ্মভূষণ (২০০১), এবং সংগীত-নাটক- আকাদেমি ফেলোশিপ (২০০৮)। ২০১২ সালে তাঁকে মরণোত্তর 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বাংলা গানে ব্যান্ড ও অন্যান্য ধারা : চার থেকে সাতের দশকে বাংলা সিনেমার গানের যে স্বর্ণযুগ দেখা গিয়েছিল তা ক্রমেই স্তিমিত হতে থাকে। সাতের দশকের মাঝামাঝি, আধুনিক ও ছায়াছবির গানের কথা, সুর ও ভাব— কিছুই সমসময়ের জ্বলন্ত বাস্তবতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার অদম্য বাসনা, জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত না হতে পারার ক্ষোভ ও অপরাধবোধ, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস— এককথায় সময়ের আত্মার শিল্পিত প্রকাশ ঘটাতে সমর্থ হচ্ছিল না। এইরকম সময়েই ১৯৭৬ সালে আত্মপ্রকাশ '**মহীনের ঘোড়াগুলি**'-র। এঁদের কাছে আদর্শ হিসেবে ছিল ৬০-এর দশকে বব ডিলানের নেতৃত্বে নাগরিক লোকগানের প্রচার ও প্রসার। যা পরে আন্দোলনের চেহারা নেয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের রেশ তখনও যায়নি, বাংলায় তখন উত্তুঙ্গ নকশাল রাজনীতির পতনের পালা। মুক্তিযুদ্ধের পর গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে সবে আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। উডস্টকের স্মৃতি তখনও ফিকে হয়নি, বীটলস্, রোলিং স্টোন, পিংক ফ্লয়েড বা লেড জেপলিনের মতো

দল বা ব্যান্ড তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন ও নৈরাশ্যের সার্থক প্রতিফলন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে তাদের বাঁধা গানে। এইরকম পরিস্থিতিতেই বাংলা তথা ভারতের প্রথম প্রাদেশিক ভাষার ব্যান্ড হিসেবে উঠে এল 'মহীনের ঘোড়াগুলি'। **গৌতম চট্টোপাধ্যায়** (১৯৪৮-১৯৯৯) ছিলেন দলনেতা, অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন ঘোষাল, আব্রাহাম মজুমদার, তাপস দাস, তপেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময় পরপর তিনটি অ্যালবাম এই দল প্রকাশ করে— সংবিগ্ন পাখিকুল ও কলকাতা বিষয়ক গান (১৯৭৭), অজানা উড়ন্ত বস্তু বা অ-উ-ব (১৯৭৮) এবং দৃশ্যমান মহীনের ঘোড়াগুলি (১৯৭৯)। দল হিসেবে এঁরা তৎকালীন যুবচেতনা ও সমস্যাগুলিকে ছুঁয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে দল ভেঙে গেলেও পরবর্তী প্রজন্মের ছকভাঙা গায়ক-বাদকদের কাছে গৌতমের প্রেরণা অক্ষুণ্ণ থাকল। আশির দশকের গোড়ায় ইন্দ্রনীল ও ইন্দ্রজিৎ সেনের প্রচেষ্টায় তৈরি হল দ্বিতীয় ব্যান্ড '**নগর ফিলোমেল**'। এঁদের 'সাইকেল', 'বিজনের চায়ের কেবিন' গান দুটি কিছুটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ইতিমধ্যে গৌতমের সঙ্গে যোগ দিলেন 'গড়ের মাঠ' দলের সুব্রত ঘোষ, তরুণ সংগীতকার নীল অধিকারী। ক্রমশ মহীনের ঘোড়াগুলি-র গুরুত্ব বুঝতে শিখল নতুন সময়ের বাংলা গানের শ্রোতা। নব্বইয়ে র দশকে পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'মহীনের ঘোড়াগুলি' পুনরুত্থিত হয়। এই নতুন সময়ের গায়ক-গায়িকাদের সমাহারে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একে একে প্রকাশ পায় আবার বছর কুড়ি পরে (১৯৯৫), ঝরা সময়ের গান (১৯৯৬), মায়া (১৯৯৭), খ্যাপার গান (১৯৯৯) এবং গৌতম (গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের লাইভ অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং—২০০০)। বাঙালি শ্রোতা আর তাঁদের চিনতে ভুল করেননি। বিষয়ের দিক থেকে রাজনীতি, দারিদ্র্য, অবিচার, বিপ্লব, প্রেম, একাকীত্ব, এমন কি ভিক্ষাবৃত্তির কথাও উঠে এসেছে মহীনের ঘোড়াগুলির-র গানে। সেদিক থেকে পরবর্তী সময়ে জীবনমুখী নামে যে গান উঠে আসবে তার পূর্বসূত্র এঁদের কাছেই পাওয়া যাবে। এই সময়ে সরাসরি বাংলা গানের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বিভিন্নভাবে যাঁরা পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কার্লটন কিটো, ঊষা উত্থুপ, অমিত দত্ত, লুই ব্যাঙ্কস, বার্টি ডি'সিলভা, নন্দন বাগচী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য।

সাত থেকে নয়ের দশকের মধ্যে অন্য যে কয়েকটি নতুন বাংলা গানের ধারা প্রচলিত হয় তার মধ্যে বিজ্ঞাপনের গান, দূরদর্শন ধারাবাহিকের গান এবং বিশেষ করে 'রিমেক' ও 'রিমিক্স' বাংলা গানের কথা উল্লেখ করা উচিত। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের গান ও বিশেষ করে আব্দুল গফ্ফর চৌধুরির লেখা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় হতে থাকে। সাতের দশক থেকেই রেডিয়োয় প্রথম **বিজ্ঞাপনী গান** বা '**জিংগল**' প্রচারিত হতে শুরু করে। ১৯৭৫ থেকে টি.ভি.তেও ভিড় করে বিজ্ঞাপন। অনেক বিখ্যাত শিল্পীই এই ধরনের গান গেয়েছেন, তবে বিশেষত শ্রাবন্তী মজুমদারের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। টেলিভিশন সিরিয়াল বা ধারাবাহিকের শীর্ষসংগীতও শুরু হলো এই সময় থেকে। পূর্বজ শিল্পীর গাওয়া গান পরবর্তী শিল্পীরা আগেও গেয়েছেন। তবে নয়ের দশকের শুরু থেকেই '**রিমেক**' শব্দটি প্রথম চালু হয়। অবশ্য নতুন কোনো মূল্য সংযোজিত না হওয়ায় এই গান খুব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। নগর ফিলোমেল-খ্যাত ইন্দ্রনীল সেন, শ্রীকান্ত আচার্য প্রমুখ এই ধারার গায়ক হিসেবে স্বীকৃতি পান।

নয়ের দশক সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে একটি ক্রান্তিকাল। খোলা বাজারের মুক্ত অর্থনীতি এবং ভোগবাদী বাজার সংস্কৃতির আগ্রাসন, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অবসান, রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়হীনতা এবং বাঙালির গতানুগতিক সংস্কৃতিচর্চার অনুবর্তনে বাঙালি হয়ে পড়েছিল ক্লান্ত। 'মহীনের ঘোড়াগুলি', 'মেঘনাদ', অনুশ্রী-বিপুল', প্রতুল মুখোপাধ্যায়— অন্যরকম গানের কাণ্ডারি ছিলেন এরাই। বিশেষত **প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের** গানে ছিল জাগরণের বাণীরূপ। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের মতোই খালি গলায় দীক্ষিত ও অনুরাগী, মূলত নগর কলকাতার বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত তরুণদের প্রতুল গান শুনিয়েছেন।

১৯৯২-এ বাংলা গানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু। **সুমন চট্টোপাধ্যায় (কবীর সুমন)** 'তোমাকে চাই' অ্যালবামের মাধ্যমে বাংলা আধুনিক গানের ধারাবাহিকতাকে সমৃদ্ধ করলেন। এর আগে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তর গানে গীতিকার ও সুরকার একজন হলেও গায়ক ভিন্ন ছিলেন। কিন্তু সুমন একাই গীতিকার সুরকার ও গায়ক রূপে যে দক্ষতার পরিচয় দিলেন তা অভিনব। সেইসঙ্গে যন্ত্রানুসঙ্গও ছিল নিজের। একাধিক বাদ্যযন্ত্র নিজেই বাজিয়ে নিজের কথা ও সুরে স্বকণ্ঠে মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করে তিনি দর্শকদের বিস্মিত করেন। বলাবাহুল্য এই বহুমুখী প্রতিভা কেবল চোখধাঁধানো ছিল না, সংগীতের প্রতি গভীর ভালোবাসা, নিবিড় অনুশীলন ও দক্ষতার জন্যই তিনি বাংলা সংগীত জগতে নিজেকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পেরেছেন। তাঁর গান শুনে অচিরেই নিউসং (Nueva Cancion) আন্দোলন, পিট সিগার, বব ডিলান, জনি ক্যাল, উইলি নেলসন, লেনার্ড কোহেন প্রমুখ নাম উচ্চারিত হয় এবং তুলনা শুরু হয়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্য প্রভাবের অনেক আগেই সুমনের সংগীত চর্চার সূত্রপাত চিরন্তন বাংলা গান তথা ভারতীয় সংগীতের আবহে। বাড়িতে সংগীতমুখর পরিবেশ তাঁর প্রতিভা বিকাশের সহায়ক ছিল। তাই বাংলা লোকগান বিশেষত কীর্তনের আঙ্গিক সুমনের গানে বারবার ফিরে আসে। যে গান বাংলা গানের ধারায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে 'তোমাকে চাই'— তার মধ্যেও কীর্তনের মাধুর্য মিশে আছে। তেমনই 'খাতা দেখে গান গেও না', 'প্রতিদিন সূর্য ওঠে' প্রভৃতি অনেক গানেই বাংলা লোক গানের চিরাচরিত রূপটি ফুটে ওঠে। একে একে ব'সে আঁকো (১৯৯৩) ইচ্ছে হলো (১৯৯৩) গানওলা (১৯৯৮) ঘুমাও বাউণ্ডুলে (১৯৯৫) জাতিস্মর (১৯৯৭) প্রভৃতি অ্যালবামে সুমনের নিজস্ব একটি গানের ভুবন তৈরি হল। যে গানের ভুবনে শ্রোতা আবহমান বাংলাগানের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক যোগ খুঁজে পান। সুমন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। 'অমরত্বের প্রত্যাশা' অবহেলা করে ভালোবাসার সন্ধানী তাঁর গান অবিরাম শ্রোতার হৃদয়ে আনন্দের লহরি তুলে চলেছে।

এই সময়ের আরেকজন বিশিষ্ট সংগীত ব্যক্তিত্ব **নচিকেতা চক্রবর্তী**। আটের দশকেই তাঁর গানবাজনার সূত্রপাত। নয়ের দশকে তাঁর বেশ কিছু অ্যালবাম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের আশা-নিরাশা, ক্ষোভ-প্রতিবাদ, স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা তাঁর গানে বাণীরূপ পায়। মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধ তাঁর গানগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নচিকেতা চক্রবর্তীর উল্লেখযোগ্য অ্যালবামগুলি হল এই বেশ ভালো আছি, কে যায়, চল্ যাবো তোকে নিয়ে ইত্যাদি। তাঁর গানে রাগসংগীতের সঙ্গে সমকালীন সুর-নিরীক্ষার চমকপ্রদ মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। মঞ্চানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও নচিকেতা অত্যন্ত বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার করলেন। মূলত নচিকেতার প্রথম অ্যালবামের বিজ্ঞাপনসূত্রেই গ্রামাফোন কোম্পানি **'জীবনমুখী গান'**— এই নামকরণ করে। এই পথেই একে একে এলেন **অঞ্জন দত্ত** (শুনতে কি চাও, পুরনো গিটার ইত্যাদি), মৌসুমী ভৌমিক (তুমিও চিল হও, এখনো গল্প লেখো ইত্যাদি), পল্লব কীর্তনিয়া, তপন সিংহ, কাজী কামাল নাসের, লোপামুদ্রা মিত্র, শিলাজিৎ প্রমুখ শিল্পীরা। মৌসুমী-র গানে প্রথম কোনো মহিলা গীতিকারের নিজের ভাষায় নিজের কথা শোনা গেল। লোপামুদ্রা অন্যের কবিতায় সুর দিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। অঞ্জন এবং কামালের গানের কথাও জনতাকে স্পর্শ করল।

এরপরেই একে একে বিভিন্ন **বাংলা ব্যান্ড**-এর উত্থান শুরু হলো। সমবেত প্রয়াসে গান সৃষ্টি এবং পরিবেশন শুরু হলো। মূলত বিদেশি সংগীতের প্রভাবে রক, পপ, জ্যাজ, রক এন রোল, কান্ট্রি এবং বাংলার নিজস্ব লোকসংগীতের প্রভাব পড়ল এদের গানে। সমমাত্রিক 'রিদম' এবং ইলেকট্রনিক সাউন্ড প্রাধান্য পেল। প্রাধান্য পেল সাইকেডেলিক আলো এবং বিভিন্ন 'স্টেজ অ্যাক্ট'। 'হাই', 'শিবা', 'ক্রস উইন্ডস্' বা 'হিপ পকেটের' মতো মূলত ইংরেজি গান গাওয়া ব্যান্ডগুলির মতোই 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র অনুসরণে তৈরি হলো 'লক্ষ্মীছাড়া', 'চন্দ্রবিন্দু', 'ভূমি', 'উজান', 'ইনফিউশন', 'অভিলাষা', 'ক্যাকটাস', 'পরশপাথর', 'শহর', 'মরুদ্যান', 'ফসিলস্', 'কালপুরুষ' প্রভৃতি ব্যান্ড। তরুণ ও যুব-সমাজের কাছে এদের আশাতীত গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হল। এখন প্রতিদিনই হয়তো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একটি করে ব্যান্ড তৈরি হয়ে চলেছে। বাংলা গানের ধারায় বাংলা ব্যান্ডের অবদান কতখানি তা নিয়ে মন্তব্য করার মতো যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান তৈরি হয়নি বলেই আপাতত এই আলোচনা এখানেই শেষ করা গেল।

বঙ্গদেশে যন্ত্রসংগীতের ধারা :

বিভিন্ন সময়ে বঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীত-অনুসারী যন্ত্রসংগীতের যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের অনেকেরই পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাদ্যযন্ত্র-অনুসারে আরও কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পীর নাম করা হল —

বীণা ও সুরশৃঙ্গারে বিভিন্ন সময়ে দবীর খাঁ বীণকার, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকামোহন মৈত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। রুদ্রবীণায় বিশেষ করে নাম করতে হয় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেতারে নাম করা যায় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবান চন্দ্র, জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র, এমদাদ হুসেন খাঁ, লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশংকর, ইন্দাস খাঁ, এনায়েত খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, ইমরাত খাঁ, গোকুল নাগ, মণিলাল নাগ, পন্ডিত হরশঙ্কর ভট্টাচার্য, মিতা নাগ প্রমুখের। সেতার ও সুরবাহারে অন্নপূর্ণা দেবী বিশেষ উল্লেখ্য। হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল-ও প্রখ্যাত সুরবাহারবাদক ছিলেন। সরোদে আয়াত আলি খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, বাহাদুর খাঁ, আলি আকবর খাঁ, তিমিরবরণ, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে **আলাউদ্দিন খাঁ** ছিলেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। তিনি রামপুর ঘরানার ওয়াজির খাঁ-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নুলো গোপালও ছিলেন তাঁর আর একজন গুরু। আলাউদ্দিন সেনীয়া ঘরানার একজন প্রখ্যাত সরোদিয়া হিসেবে খ্যাত হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় একজন শিক্ষকের। বহু বাদ্যবাদনে পারদর্শী আলাউদ্দিনেরই শিষ্য ছিলেন পুত্র **আলি আকবর খাঁ** এবং কন্যা অন্নপূর্ণা। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে রবিশংকর, **নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য। মাইহার রাজদরবারে আশ্রিত আলাউদ্দিনের নামে 'মাইহার' ঘরানাও সৃষ্টি হয়েছে। সেতারিয়াদের মধ্যে ইন্দাস খাঁ-র বংশও অসংখ্য রত্নপ্রসূ। **বিলায়েৎ খাঁ** এই বংশেরই উত্তরাধিকারী ছিলেন। শ্রীখোল, মৃদঙ্গ এবং পাখোয়াজে নাম করা যায় মৃদঙ্গাচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য, দানীবাবু প্রমুখের। এস্রাজে শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সারেঙ্গিতে মেহেদি হুসেন খাঁ, বাঁশিতে আফতাবউদ্দিন খাঁ, **পান্নালাল ঘোষ** প্রমুখ বাংলা সংগীত জগতের উজ্জ্বলতম তারকাদের মধ্যে পড়বেন। এছাড়া রবাবে মহম্মদ আলি খাঁ, ভায়োলিনে শিশিরকণা রায়চৌধুরী, সন্তুরে দুলাল রায় বা হারমোনিয়ামে মন্টু মহারাজ, দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি গোহো প্রমুখের নাম অনস্বীকার্য।

তবলাতে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা নাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ**, আবিদ হোসেন, মন্মথ গঙ্গোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার বণিক, হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, শংকর ঘোষ, কুমার বোস, শ্যামল বসু, কানাই দত্ত, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। এছাড়াও আরও অজস্র গুণী বাংলার শাস্ত্রীয় সংগীতের জগৎকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

গত শতকের ছয়-সাতের দশকে মূলত রবিশংকরের উদ্যোগে পাশ্চাত্য যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতের মিলনে নতুন এক ধরনের সাংগীতিক ধারার জন্ম হয়। একে **'ফিউশন মিউজিক'** আখ্যা দেওয়া হল। রবিশংকর নিজে ইহুদি মেনুহিন, ফিলিপ গ্লাস প্রমুখ বিশ্ব বিখ্যাত সংগীত বিশারদের সঙ্গে যেমন কাজ করেছেন, তেমনই 'বীটলস্'-এর মতো গোটা বিশ্বে জনপ্রিয় ব্যান্ডের উপরেও গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই ধারায় আনন্দশংকর, বিক্রম ঘোষ, তন্ময় বসু-সহ অনেকেই নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্বসংগীতের নব-নব দিগন্তকে আবিষ্কার করে চলেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালির বিজ্ঞানচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ঔপনিবেশিক বাংলায় আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত :

ঔপনিবেশিক বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সূচনাপর্বে বহু কৃতবিদ্য বাঙালির অবদান অনস্বীকার্য। চিকিৎসাবিজ্ঞানে রাধাগোবিন্দ কর, মহেন্দ্রলাল সরকার, নীলরতন সরকার প্রমুখের অবদান এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিপ্রাপ্ত বাঙালি বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তী ব্রিটিশ শাসকদের উদ্যোগে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান, যেমন শ্রীরামপুর মিশন, স্কুল বুক সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বাঙালির অবদান :

বাংলা, ভারত তথা বিশ্বের দরবারে চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য যেসব বাঙালির নাম অবশ্যই উচ্চারিত হবে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন :

নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) : জয়নগর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারির প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে সাবঅ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনের চাকরি পাওয়ার পরেও জ্ঞানপিপাসু নীলরতন মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে এফ এ এবং বি এ পাশ করেন। কিছুদিন চাতরা হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষকের চাকরি করার পর মেডিক্যাল কলেজে ফিরে এসে ১৮৮৮ সালে এবং পরের বছরেই একসঙ্গে এম এ ও এম ডি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এই সময় থেকেই তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিসে সাফল্যের সূত্রপাত। ১৮৯৩ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন, ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত আসীন ছিলেন উপাচার্য পদেও। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত স্নাতকোত্তর কলা বিভাগ এবং ১৯২৮ থেকে অবশিষ্ট জীবন স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন। ১৯২০ সালে বিশেষ শিক্ষা মিশনের সদস্য মনোনীত হয়ে ইয়োরোপে গেলে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সফর চলাকালীনই তাঁকে ডি সি এল এবং এল এল ডি উপাধি প্রদান করে। তিনি ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সঙ্গে যৌথভাবে কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের (পরবর্তীকালে কারমাইকেল, বর্তমানে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ) প্রতিষ্ঠায় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের অন্যতম সহায় ছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকদের গ্রামে গিয়ে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল উল্লেখযোগ্য। চিত্তরঞ্জন সেবা প্রতিষ্ঠান ও যাদবপুরে অবস্থিত কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালের সভাপতি এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন বহুদিন। তিনি ১৯১২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতির কারণে দেশীয় শিল্পোদ্যোগী হিসাবে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা অনেকটাই কম আলোচিত। এদেশে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত দূষণমুক্ত ট্যানারি এবং সার ও সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। রাঙ্গামাটি চা কোম্পানি (পরবর্তীকালের ইস্টার্ন টি কোম্পানি) গঠনে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিশ্বভারতী ও ভারতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি সম্পাদক হিসাবে বহু যুবককে শিল্পস্থাপনের প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ছিলেন।

তাঁরই প্রচেষ্টায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা 'সিরোসিস অব লিভার ইন চিলড্রেন'।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ডা. বিধানচন্দ্র রায় সবচেয়ে যশস্বী হন। আমাদের দেশে সিরাম, ভ্যাকসিন এবং অন্যান্য জৈব উপাদান বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। ১৯১৯ সালে ডা. কৈলাসচন্দ্র বসু এবং ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় বেঙ্গল ইমিউনিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ২৫০ রকমের ওষুধ তৈরি হত। কলকাতায় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন পত্রিকা তিনি দক্ষতার সঙ্গে বারো বছর সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় জনস্বাস্থ্যের সমস্ত দিক নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা হত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় সদস্য হিসাবে বহু সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এই যশস্বী চিকিৎসক। ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন ডা. নীলরতন সরকার।

রাধাগোবিন্দ কর (১৮৫২-১৯১৮) : হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর ইনি চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন।

মেডিকেল কলেজে তিন বছরের শিক্ষাক্রম শেষ করে তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড যান। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমআরসিপি ডিপ্লোমা গ্রহণ করে এক বছর বাদে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে শ্যামবাজারে নিজ বাড়িতে ডাক্তার কর চিকিৎসাব্যাবসা শুরু করেন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথমবার প্লেগ রোগ দেখা দিলে ডাক্তার কর পল্লিবাসীদের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে তাঁর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রস্তুত ওষুধ বাজারে চালু করার ব্যাপারে ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু এবং ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। পিতা দুর্গাদাস কর এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ বন্ধুর অনুপ্রেরণায় দেশীয় ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সড়ক নির্মাণই ছিল তাঁর প্রধান স্বপ্ন ও জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এই কলেজের নাম হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ।

জীবদ্দশায় কিংবদন্তী এই চিকিৎসককে নিজের সর্বস্ব দান করার পরেও এই দেশীয় চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণের দুঃসাহসী ব্রত পালনের জন্য প্রায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও তাঁকে এত বড়ো ঝুঁকি না নিয়ে সরকারি দাক্ষিণ্য আদায়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বসতবাটিতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসর্বস্ব দান করে গিয়েছিলেন।

মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা ছিল রাধাগোবিন্দ করের একান্ত স্বপ্ন। মেডিকেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অবসর সময়ে একের পর এক বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর লেখা একটি বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— বাল্যকাল হইতে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দেশে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে মাতৃভাষার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আমার স্বল্প বিদ্যা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর সাধ্য তাহার সমাধানে ত্রুটি করি নাই।'

করপ্রেস স্থাপনে, কারমাইকেল কলেজ (পরবর্তীকালে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ধাত্রীসহায়', 'অ্যানাটমি', 'সংক্ষিপ্ত ভেষজ তত্ত্ব', 'সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালক চিকিৎসা', 'স্ত্রীরোগ চিকিৎসা' প্রভৃতি।

কাদম্বিনী (বসু) গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯২৩) : বাবা ব্রজকিশোর বসু ভাগলপুর স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। ভাগলপুরে ভারতের প্রথম মহিলা সমিতির মহিলা প্রতিষ্ঠাতা ও নারীশিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ ব্রজকিশোর কাদম্বিনীকে পাঠান বালিগঞ্জের হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। স্কুলটি পরে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে যায়। এই স্কুলটিও ১৮৭৮ সালে বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। এশিয়ার প্রথম সরকার-স্বীকৃত বালিকা বিদ্যালয় এই বেথুন স্কুল। কাদম্বিনী বেথুন স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন (১৮৭৮)। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এফ এ পাশ করেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের আন্দোলনের ফলে ১৮৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের দাবি মেনে নেয় এবং ১৮৮২ সালে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম মহিলা স্নাতক হন। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির আগেই কাদম্বিনী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার পর থেকে ডাক্তারি পড়া শুরু করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের খবর সরকারি মুখপত্র এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। স্নাতক হওয়ার পর চন্দ্রমুখী গেলেন

এম এ পড়তে। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে নিজের শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেরণায় কাদম্বিনী গেলেন ডাক্তারি পড়তে, সেকালের প্রেক্ষিতে যে কথা চিন্তা করাটাই কার্যত অসম্ভব ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শ্রেষ্ঠ র‍্যাডিক্যাল, স্ত্রীশিক্ষাব্রতী, অবলাবান্ধব পত্রিকার সম্পাদক অদম্য দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনীর অক্লান্ত প্রয়াসে মেয়েদের জন্য চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার দরজা খুলে গেল এবং এই দুর্গম পথের প্রথম মশালবাহিকা হলেন কাদম্বিনী। তিনি ১৮৮৪ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হন।

কিন্তু অন্তিম পরীক্ষার সময় মেডিসিনের অধ্যাপক ডা. রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় ১ নম্বর কম দিয়ে কাদম্বিনীকে ফেল করিয়ে দিলেন। আবার লড়াই চলল। শেষ অবধি প্রিন্সিপাল সাহেবের সার্টিফিকেট পেয়ে কাদম্বিনী অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার হলেন। অধ্যক্ষ প্রদত্ত 'Graduate of Bengal Medical College' সার্টিফিকেট লাভ করে চিকিৎসক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন।

১৮৯২ সালে তিনি বিলেতে যান এবং সেখান থেকে এলআরসিপি (LRCP) এডিনবরা, এলআরসিএস (LRCS), গ্লাসগো ও জিএফপিএস (GFPS) ডাবলিন উপাধি নিয়ে স্বদেশে ফেরেন। তিনিই হলেন বিলিতি ডিগ্রিধারী প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক যিনি ভারতে ফিরে এসে চিকিৎসার কাজ শুরু করেন।

একটি সরকারি অনুসন্ধান কমিটির সদস্যা হিসেবে কাদম্বিনী ও তাঁর শৈশব-সঙ্গিনী কবি কামিনী রায় মহিলা শ্রমিকদের দুর্দশা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখার জন্যে বিহার ও ওড়িশায় যান। আরও বহু সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডা. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাজমাতার চিকিৎসার্থে নেপালে যান। সেখানে এই মহৎপ্রাণ মানবীর হাত ধরে আধুনিক জনচিকিৎসার সূত্রপাত হয়।

মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) : ভারতে সুশৃঙ্খল প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ মহেন্দ্রলাল সরকারের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী* ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : 'বঙ্গদেশকে যত লোক লোকচক্ষে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মনে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরূপ বিমল সত্যানুরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি অল্প বাঙ্গালীই দেখাইতে পারিয়াছেন, এরূপ জ্ঞানানুরাগ এই বঙ্গদেশে দুর্লভ।'

হিন্দু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৮৬১ সালে আইএমএস ডিগ্রি লাভ করেন । ১৮৬৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি এম ডি (ডক্টর অব মেডিসিন) ডিগ্রি লাভ করেন।

শৈশবে হেয়ার স্কুলে পড়ার সুবাদে শিক্ষাব্রতী হেয়ার সাহেবের জীবনাদর্শ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এম ডি ডিগ্রি পাবার পর থেকেই ডাক্তার সরকার প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন এবং তাঁর অসামান্য রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ক্ষমতার খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহেন্দ্রলালের অন্যতম গুণগ্রাহী ছিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কর্কট ব্যাধির চিকিৎসার জন্য শিষ্য ও ভক্তরা তাঁরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। জীবনের প্রাথমিক পর্বে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে তাঁর অনাস্থার প্রধান কারণ ছিল ওই পদ্ধতিতে অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজির তেমন গুরুত্ব না থাকা। কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্র, রাজেন্দ্রলাল দত্ত, তাঁর বন্ধু কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগরের প্রভাব ও প্রেরণায় নিজের চিকিৎসার ধারা পাল্টে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশ্বের অন্যতম সেরা হোমিওপ্যাথি বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন মহেন্দ্রলাল সরকার।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা। নিজের স্মৃতিকথায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমকালের সেরা ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার স্পৃহা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের কথা জানিয়েছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

লালমাধব মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৪১) : এক বনেদি ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পরিবারে চিকিৎসক লালমাধব মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ফ্রি চার্চ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে লালমাধব মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হন। ফ্রি চার্চ কলেজে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আলেকজান্ডার ডাফ, রেভারেন্ড ডা. এওয়ার্ট এবং রেভারেন্ড ডা. ফিক। পরবর্তীকালে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে শিক্ষক হিসাবে পান সিভার্স, ফেরার, ফ্রান্সিস, ম্যাকনামারা প্রমুখকে। ১৮৬৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। ১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত উড়িষ্যার আর্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য চিৎপুর ও শিয়ালদহে যে 'ফেমিন হসপিটালগুলি অস্থায়ীভাবে চালু করা হয় সেখানে লালমাধবের আর্তসেবার ঐকান্তিক প্রয়াস স্বাস্থ্য বিভাগের পদস্থ আধিকারিকদের মুগ্ধ করে। এরই পুরস্কারস্বরূপ তিনি কলকাতা চক্ষু চিকিৎসালয়ের প্রধান নিযুক্ত হন এবং ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের (বর্তমানে এন. আর. এস. হসপিটাল) চক্ষু বিভাগের শিক্ষকের পদ লাভ করেন। জয়পুরের মহারাজার চোখের সফল অপারেশনের পর শল্যবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ক্যালকাটা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (পরবর্তীকালে The Indian Medical Association (IMA)-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসাবে স্মরণীয়। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাম্মানিক সদস্যপদ তাঁকে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতেও সম্মানিত করেন। কিংবদন্তী চক্ষুবিশেষজ্ঞ সি ম্যাকনামারা প্রণীত 'এ ম্যানুয়েল অফ দি ডিজিজেস অফ দি আই' নামক আকর গ্রন্থের অনুবাদ 'অক্ষিতত্ত্ব'–ই সম্ভবত কালের প্রেক্ষিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি বেথুন সোসাইটির সম্মানিত সদস্য ছিলেন। কলকাতা পুরসভায় নিযুক্ত হয়ে তিনি স্বাস্থ্য সংস্কার বিষয়ে প্রভূত কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৬৫) : চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্য এই দুই জগতের মধ্যে অনায়াস পদচারণায় সক্ষম এক বিচিত্র চরিত্র বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। ব্যঙ্গসাহিত্যিক ও ব্যঙ্গচিত্রকর হিসাবে তাঁর খ্যাতি চিকিৎসক হিসাবে তাঁর দক্ষতাকে যেন ছাপিয়ে গিয়েছিল। আশৈশব মেধাবী ও খেয়ালি এই মানুষটি ছিলেন আদর্শে অনমনীয়, দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতায় অবিচল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখাপাধ্যায়) তাঁকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন এবং এই বিচিত্র প্রতিভার মানুষটির অত্যন্ত নিকটে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। বনফুল তাঁর শিক্ষকের স্মৃতি চিরন্তন করে তুলেছেন '*অগ্নীশ্বর*' উপন্যাসে। এই উপন্যাস অবলম্বনে বনফুলের ভাই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের সৃজিত চলচ্চিত্রটিও অত্যন্ত জনপ্রিয়। উপন্যাসটিতে দৃঢ়চেতা যে চিকিৎসকের ছবি পাওয়া যায় তা সাধারণভাবে অভাবনীয় মনে হলেও অতিরঞ্জিত নয়। বনবিহারী ছিলেন এমনই এক অবিশ্বাস্য চরিত্রের মানুষ।

চিকিৎসাশাস্ত্রের পাশাপাশি সংস্কৃত কলেজ থেকে কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন বনবিহারী। সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক রচনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। অধিকার ছিল দর্শনে, নক্ষত্রবিজ্ঞানে, পক্ষীতত্ত্বে। শনিবারের চিঠি, বঙ্গবাণী, মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা ব্যঙ্গকবিতা এবং কার্টুন সাহিত্যরসপিপাসু পাঠকমাত্রেরই প্রিয় ছিল। তাঁকে কেন্দ্র করে 'বেপরোয়া' নামে একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ১৯২৩ সালে বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ঐ নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। নরকের কীট, দশচক্র, যোগভ্রষ্ট সিরাজের পেয়ালা প্রভৃতি রচনায় তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ও সতর্ক সমাজচেতনার ছাপ স্পষ্ট। জীবনের শেষ পর্বে কলকাতায় ডাক্তারির চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে চলে যান ভাগলপুরে। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৩-১৯৪৬) : স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম জামালপুরে। ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ হাইস্কুল থেকে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করেন। এরপর ১৮৯৩ সালে হুগলি মহসিন কলেজ থেকে গণিত ও রসায়নে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৯৩ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ বি এ, ১৮৯৪-এ স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৮৯৮ সালে মেডিসিন ও সার্জারিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে গুডিভ ও ম্যাকলাউড স্বর্ণপদকে সম্মানিত হন। ম্যালেরিয়া, ব্যাক ওয়াটার ফিভার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রান্তীয় ব্যাধি নিয়ে মৌলিক গবেষণা থাকলেও কালাজ্বরের প্রতিষেধক ইউরিয়া স্টিবামাইন

আবিষ্কারের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৪২ সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেও প্রশাসনিক জটিলতার জন্য এই বিরল সম্মান তাঁর পাওয়া হয়ে ওঠেনি।

১৯০৫ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে প্যাথলজি ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক ছিলেন। আই. এম. এস. না হয়েও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অতিরিক্ত চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি কাজ থেকে অবসর নিয়ে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা করেন। তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখিত বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'Treatise of Kalaazar'। তিনি ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিন-এর সভ্য ছিলেন। তিনি ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৩৪-এ নাইট উপাধি পান। ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন তাঁর জীবনের অনন্য কীর্তি। দেশি ওষুধ প্রস্তুতিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬৫-১৯২১) : জন্ম হুগলি জেলার রাধানগরে। সুরেশপ্রসাদ ১৮৮৯ সালে মেডিসিন ও সার্জারিতে অনার্সসহ এম বি বি এস এবং ১৮৯১ সালে এম ডি ডিগ্রি লাভ করেন। মেয়ো কলেজে অধ্যাপনা ও চিকিৎসা দিয়ে পেশাগত জীবনের সূত্রপাত হলেও স্বাধীনচেতা সুরেশচন্দ্র কিছুদিনের মধ্যেই চাকরি ছেড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত জটিল কিছু অপারেশনের অভাবনীয় সাফল্য তাঁকে শল্যচিকিৎসায় কিংবদন্তী করে তোলে। শুধুমাত্র একটি ছুরি নিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে মারাত্মকভাবে আহত কিশোর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সুস্থ করে তোলা সেই বিখ্যাত অপারেশনগুলির মধ্যে অন্যতম। সুরেশপ্রসাদ-ই যতীন্দ্রনাথের নামকরণ করেন বাঘাযতীন। ১৮৯৫ সালে নীলরতন সরকার এবং আরো কয়েকজন বাঙালি চিকিৎসক মিলে College of Surgeons and Physicians of Bengal নামে একটি বেসরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এটি রাধাগোবিন্দ কর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে মিলে যায়। টানা পঁচিশ বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট-সদস্য এবং সাম্মানিক ফেলো ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আপৎকালীন অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তাঁকে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের লেফটেন্যান্ট কর্নেল উপাধি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন এই উপাধিপ্রাপ্ত একজন অসামরিক ব্যক্তি।

মর্যাদার দিক থেকে দেশীয় চিকিৎসকদের ইউরোপীয় চিকিৎসকদের সমতুল্য করে তোলা ডা. নীলরতন সরকারের মতো তাঁরও জীবনের লক্ষ্য ছিল।

চুনীলাল বসু (১৮৬১-১৯৩০) : চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নে সমান পারদর্শী চুনীলাল বসু ভারতবর্ষের সর্বকালের একজন প্রথম সারির বরেণ্য বিজ্ঞানী। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই প্রথম রসায়নের অধ্যাপক পদ পান (১৮৯৮)। বাংলার লতাপাতা, শাক সবজির খাদ্য ও ভেষজ গুণাবলির অনুসন্ধান তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। কলকাতার দৃষ্টিহীন শিক্ষাকেন্দ্র এবং অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় বহু চিকিৎসা ও রসায়ন বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তাঁর কয়েকটি বহুলপরিচিত গ্রন্থ হল ফলিত-রসায়ন, রসায়নসূত্র, পল্লীস্বাস্থ্য প্রভৃতি।

দেশজ রসায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কাশি মহামণ্ডল তাঁকে রসায়নাচার্য উপাধিতে ভূষিত করে। স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে বহুমূত্র রোগ নিয়ে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল।

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডা. লেবার্ড রজার্স যখন কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য ইনজেকশন প্রস্তুতির গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন চুনীলাল বসু গাইনোকার্ডিক অ্যাসিড থেকে পরিশুদ্ধ দ্রাবক তৈরির ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন।

করবী ফুলের রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার বিশ্লেষণ তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এছাড়া তিনি Indian Association for the Cultivation of Science-এর সহ-সভাপতি ও কলকাতার শেরিফ ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক ছিলেন।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরিশোষিত লবণদ্রবের সাহায্যে বিষপানে মৃত মানুষ ও গো-মহিষাদির অন্ত্রাদিকে কীভাবে পচন থেকে রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে বিশদ গবেষণা করে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেন। পরবর্তীকালে সরকার সেই পদ্ধতি দেশের নানা অঞ্চলে কার্যকর করে।

বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২) : জন্ম বিহারের পাটনায়। আদি নিবাস টাকি, শ্রীপুর, উঃ ২৪ পরগনায়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে মহত্তর মানবসেবার আদর্শেই বিধানচন্দ্রের জীবনের ভিত্তি প্রস্তুত হয়। বিধানচন্দ্র কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে এল. এম. এস. ও এম. বি. পাশ করেন এবং ১৯০৮ সালে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। উচ্চশিক্ষার্থে ১৯০৯ সালে বিলেত গিয়ে মাত্র দু'বছরের মধ্যে এম. আর. সি. পি. (লন্ডন) এবং এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। ছাত্র হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত-ই পরবর্তীকালে লন্ডনের বার্থলোমিউ কলেজের মতো শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ছাত্রদের অধ্যয়নের দরজা খুলে দেয়।

দেশে ফেরার পর তিনি ১৯১১ সালে জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রেরণায় রাধাগোবিন্দ কর প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। তখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তিত হয়ে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল রাখা হয়েছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে রায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার আশুতোষ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নির্দেশে স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে প্রার্থী হয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন বিধানচন্দ্র। তখন থেকেই শিক্ষাকে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত করার জন্য তাঁর সংগ্রাম শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের এক অকুতোভয় যোদ্ধা হিসাবে কারারুদ্ধ হওয়ার পর তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো সংগঠিত ও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি রয়্যাল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজেন এবং ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান সোসাইটি অফ চেস্ট ফিজিশিয়ান-এর ফেলো নির্বাচিত হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বিল পাশ করিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিপ্লব আনেন তিনি। কলকাতা পুরসভার মেয়র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের অভিজ্ঞতাই তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও চিকিৎসক ও শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে কখনো কোনো অনীহা দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। আই আই টি খড়্গপুর এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সদর দপ্তর পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন করানোর জন্য জওহরলাল নেহরুকে রাজি করানোর কৃতিত্বও বিধানচন্দ্রের প্রাপ্য।

তিনি শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। জাহাজ, বিমান ও ইনসিওরেন্স ব্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। দুর্গাপুর অঞ্চলকে একটি বৃহৎ শিল্প এলাকায় পরিণত করার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কল্যাণী শহরকে কলকাতার বিকল্প এক উপনগরী হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল দূরদর্শী বিধানচন্দ্রের। কিংবদন্তী এই চিকিৎসক, শিক্ষক ও দেশসেবক ভারতরত্নে ভূষিত হন ১৯৬১ সালে। ১৯৬২ সালের ১ জুলাই নিজের জন্মদিনেই প্রয়াত হন বিধানচন্দ্র। এই দিনটিকে এখন যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে।

গিরীন্দ্রশেখর বসু (১৮৮৭-১৯৫৩) : জন্ম দ্বারভাঙায়। পিতা চন্দ্রশেখর বসু। ১৯১১ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। গিরীন্দ্রশেখর বসু ছিলেন একাধারে মনোবিজ্ঞানী এবং রসসাহিত্যিক। ভারতবর্ষে সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি তিনিই স্থাপন করেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার্থে কলকাতার উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লুম্বিনি পার্ক। উত্তর কলকাতার ১৪ নম্বর পার্শীবাগানস্থ পৈতৃক নিবাসে ভাই রাজশেখরের সহায়তায় তিনি যে তিন শয্যাবিশিষ্ট মানসিক রোগের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন, আজকের লুম্বিনি পার্ক তারই বিবর্তিত রূপ। তাঁরই প্রচেষ্টায় এককালে মনোবিজ্ঞানের ওপর একটি চমৎকার সুসম্পাদিত মাসিক পত্রিকাও বেরিয়েছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ড. গিরীন্দ্রশেখর বসুর নেতৃত্বে রাধাগোবিন্দ কর প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মনোরোগ বিভাগ চালু হয়, সাধারণ হাসপাতালের ক্ষেত্রে যা এশিয়ার মধ্যে প্রথম।

প্রথম বাঙালি মনোবৈজ্ঞানিক গিরীন্দ্রশেখর বসু ফ্রয়েড সাহেবের ছাত্রস্থানীয় হলেও মনস্তত্ত্বের এই কিংবদন্তী পথিকৃতের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে দ্বিধা করেননি। নিজেদের মধ্যে কুড়ি বছর কথাবার্তা চালিয়ে ফ্রয়েড-বোস করেসপন্ডেন্স তৈরি করেছিলেন। বলতে গেলে এশিয়ার প্রথম মনোরোগ চিকিৎসক গিরীন্দ্রশেখর বসু। মনস্তত্ত্বের ওপর বিস্তর বইপত্র পাওয়া গেলেও, মনোবিশ্লেষণের ওপর বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বই 'স্বপ্ন', যার লেখক গিরীন্দ্রশেখর বসু। কাজের ফাঁকে তিনি নানা বিষয়ে লিখতেন। Everyday Psycho Analysis, Concept of Repression প্রভৃতি তাঁর লেখা অন্যান্য স্মরণীয় গ্রন্থ।

মেডিক্যাল কলেজে শারীরবিদ্যার অধ্যাপকের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি' বিভাগের অধ্যাপকের গুরুদায়িত্ব তিনি সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। মনোবিদ্যার আধুনিক পরিভাষা নির্মাণে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন গিরীন্দ্রশেখর।

মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৫৭) : রাধাগোবিন্দ কর, এম. এল. দে, কুমুদনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বেসরকারি এই মেডিক্যাল স্কুলটির প্রতিষ্ঠা কমিটির সভাপতিত্ব করেন। পরবর্তীকালে স্কুলটি কারমাইকেল কলেজে পরিণত হলে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর অধ্যক্ষ হন। কলেজটিকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। কলেজটির অদূরে মেডিক্যাল কলেজ অবস্থিত হওয়ায় সেই কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে কারমাইকেল কলেজের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। চরম আর্থিক দৈন্যের মধ্যেও চিকিৎসক ও প্রশাসক মহেন্দ্রনাথ দক্ষতার সঙ্গে সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রয়াসী হন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় 'কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সকল ডাক্তারই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতেছেন বলিয়াই গুরুতর টাকার অভাবেও কাজ চলিতেছে।'

কারিগরি ও শিল্পচিন্তা :

কারিগরি ও শিল্পচিন্তাতেও বাঙালি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল। এক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও যাঁদের অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁরা হলেন—

গোলকচন্দ্র নন্দী : ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে থেকে প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন ভারতে এলে তার কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করে অনুরূপ একটি ইঞ্জিন নির্মাণের অনুপ্রেরণা পান গোলকচন্দ্র নন্দী। টিটাগড়ের এই সুদক্ষ কর্মকার কোনো বিদেশি সাহায্য বা বিদেশি উপকরণ ছাড়াই সংক্ষিপ্ত আকারে আরেকটি ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। উইলিয়াম কেরির পরামর্শ অনুসারে গোলকচন্দ্রকে এগ্রি হর্টিকালচার সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় সর্বসমক্ষে এই ইঞ্জিনটি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে প্রদর্শনী শুরু হলে গোলকচন্দ্র তাঁর নির্মিত ইঞ্জিনটির সাহায্যে পাম্প চালান ও জল তোলেন। মডেলটি সোসাইটির প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ীভূত না হলেও দেশজ সেই মডেলের উদ্ভাবনী দক্ষতা লক্ষ করে উৎসাহদানের জন্য এটি প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গোলকচন্দ্রের কারিগরি দক্ষতার নিরিখে তাঁকে প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার বলা অতিরঞ্জন নয়। আমাদের দেশে প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন তিনিই নির্মাণ করেন। ঔপনিবেশিক বাংলায় নানান রাজনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গোলকচন্দ্রের বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফূরণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

শিবচন্দ্র নন্দী : বাঙালির চাকরি করার প্রবণতা মেনে নিয়ে টাঁকশালের সামান্য কর্মচারী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেও কীভাবে আত্মশক্তি, প্রতিভা ও অধ্যবসায়ে সাফল্যের শীর্ষে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ভারতবর্ষের প্রথম ইলেকট্রিক্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার শিবচন্দ্র নন্দীর জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শৈশবে প্রথাগত শিক্ষা না পাওয়া সত্ত্বেও যুগের চাহিদা অনুমান করে শিবচন্দ্র নিজের চেষ্টায় ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন। ভারতে টেলিগ্রাফ যন্ত্র ও পরিকাঠামো নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত উইলিয়াম ও শৌনেসি ব্রুকের সহকারী হিসাবে তৎকালীন প্রেক্ষিতে আধুনিকতম দূরবার্তা প্রযুক্তি বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা পাঠ করে নিজেকে নতুন দায়িত্বের জন্য তিনি প্রস্তুত করে তোলেন। ১৮৫২ সালে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত দীর্ঘ ৮০ মাইল দুর্গম দূরত্ব টেলিগ্রাফের তারে যুক্ত করা ছিল নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন : 'দীর্ঘ ৮০ মাইল লাইনের এক প্রান্তে ডায়মন্ডহারবারে শিবচন্দ্র—আর এক প্রান্তে কলিকাতায় ওসেউনেসি, লর্ড ডালহৌসি ও

কয়জন ইংরেজ রাজকর্মচারী। নির্দিষ্ট সময়ে ডায়মন্ডহারবার হইতে শিবচন্দ্র সাংকেতিক বার্তা প্রেরণ করিলেন কলিকাতায়, তাহা পাওয়া গেল। সাফল্যে অভিভূত বড়লাট লর্ড ডালহৌসি স্বয়ং সাংকেতিকধ্বনি করিয়া সফলসাধন শিবচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন। সে দিনটি স্মরণীয় কিন্তু তাহা কবে জানা যায় নাই।

শতবর্ষ পরে টেলিগ্রাফ বিভাগ কলিকাতা হইতে ডায়মন্ডহারবারের পথে মৃত্তিকা খনন করিয়া শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সেই লাইনের সন্ধান পাইয়াছেন।

ব্রিটিশ সরকার শিবচন্দ্রকে ইনস্পেকটর-ইন-চার্জ নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তীকালে রায়বাহাদুর উপাধি দেন। প্লেগ রোগে আকস্মিক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত টেলিগ্রাফ বিষয়ক মৌলিক উদ্ভাবনে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন তিনি। ধাতব পাইপের বদলে তালগাছের গুঁড়ি ব্যবহার করে কীভাবে স্বল্প ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলে টেলিগ্রাফের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়, সে বিষয়েও রেখাচিত্রসহ বিস্তারিত পরিকল্পনা সরকারে পেশ করেছিলেন এই দেশদরদী 'ইঞ্জিনিয়ার'। ইনসুলেটর হিসাবে বটের আঠা ব্যবহার করার পরামর্শ বিলিতি ইঞ্জিনিয়ারদের মুগ্ধ করেছিল। বড়বাজারের শিবু নন্দীর গলি নামে একটি সংকীর্ণ রাস্তা ছাড়া বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার পথিকৃতের আর কোনো স্মৃতিচিহ্ন আজ চোখে পড়ে না।

স্বদেশি আন্দোলন ও স্বদেশি শিল্প :

সীতানাথ ঘোষ : ইনি স্বদেশি শিল্প প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি সহযোগে বিজ্ঞানের বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদর্শন করতেন। তাঁরই প্রভাবে বালক রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠেন। বস্ত্রবয়ন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা হিসেবে তিনি হিন্দুমেলা ও জাতীয় মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় মেলার প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার প্রসঙ্গে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি ভারতবাসীর কাছে পথ প্রদর্শকস্বরূপ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জাতীয় সভায় বিদ্যুৎ সম্পর্কিত আকর্ষণীয় বক্তৃতা দেন (১৮৭১)। পরবর্তীকালে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার সাহায্যে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রথম বক্তৃতার পর ২৪ মার্চ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর সৃষ্ট যন্ত্রাদির (এয়ার পাম্প, এয়ার ইঞ্জিন) সুখ্যাতি করা হয়।

মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৫৫-১৯৩২) : কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কৃতি ছাত্র, ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক এবং কিংবদন্তী চিকিৎসক মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হলেও মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেই খ্যাতিলাভ করেন। নীরদ সি চৌধুরী, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান'-এ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথা বলেছেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি দেশজোড়া। তাঁর চিকিৎসা ছিল স্বদেশি ও বিজ্ঞানমুখী। তিনি চিকিৎসা ছাড়াও দেশলাইসহ ক্ষুদ্রশিল্প তৈরির কারখানা খোলেন । তিনি ১৮৮৮ সালে নিজের গ্রাম কালীকচ্ছে আট বিঘা জমি জুড়ে একটি লোহার কারখানা স্থাপন করেন। এখানে তৈরি হাত দা, বঁটি, সুপারি কাটার জাঁতি বিখ্যাত ছিল। স্থানীয় তাঁতি ও কর্মকারদের সমবায়ে উদ্বুদ্ধ করেন মহেন্দ্রচন্দ্র। হিন্দুমেলায় নিজের কারখানায় তৈরি কাপড় ও দেশলাই প্রদর্শন করে তিনি উচ্চপ্রশংসিত হন। তাঁর তৈরি লেখার কালি কলকাতার বাজারে রায় ব্রাদার্স ইঙ্ক নামে বিক্রি হত। মহেন্দ্রচন্দ্র নিগৃহীতা, অবহেলিতা নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে স্বনির্ভর, আধুনিক, প্রগতিশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। বিদেশ থেকে আধুনিক যন্ত্র এনে তাঁত, ম্যাচ ও প্লাইউড তৈরির শক্তিচালিত যন্ত্র নিজের বাড়িতে বসিয়ে স্থানীয় লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। মহিলাদের এতে নিযুক্ত করেন। কৃষকদের সমবায় আন্দোলনে শরিক হবার আহ্বান জানান। উন্নত চাষ, যন্ত্র নির্মাণ, উন্নত বীজ ও গবাদি পশুর উন্নতি সাধনে গোয়ালাদের সমবায়ে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থে এই স্বদেশি শিল্পোদ্যোগীর বস্ত্র নির্মাণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। হোমিও চিকিৎসক হিসাবে 'ধন্বন্তরী' খ্যাতি লাভ করেন।

রাজকৃষ্ণ কর্মকার : জন্ম ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। পিতার পক্ষে প্রথাগত শিক্ষা অর্জনের ব্যয়বহন অসম্ভব হওয়ায় শৈশব থেকেই রাজকৃষ্ণকে ছোটোখাটো বিভিন্ন কারখানায় কাজ করতে যেতে হয় এবং এইভাবেই তিনি বিভিন্ন যন্ত্রের কাজ হাতেকলমে করার দক্ষতা অর্জন করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে শিবপুরের আপকার কোম্পানিতে জাহাজ, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বয়লার,

সেতুর কলকব্জা মেরামতের কাজ অতি দ্রুত শিখে নিয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁকে অণুবীক্ষণ, জরিপ ও অন্যান্য গাণিতিক পরিমাপের যন্ত্র ইত্যাদি সূক্ষ্মতর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পলতার জলকল, ঘুসুড়ির চটকল, বালির কাগজকল ইত্যাদির পাশাপাশি তাঁকে কাশীপুরের গোলাবারুদ ও বন্দুক তৈরির কারখানা এবং টাঁকশালে মুদ্রা তৈরির কাজে অর্থসংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হয়। অল্পবয়সে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাজকৃষ্ণ সিমলা পাহাড়ের কাছে কসৌলিতে ছয় অশ্বশক্তিসম্পন্ন বাষ্পীয় বয়লার স্থাপন করে একযোগে তিনটি বেকারি চালানোর পরিষেবা ও পরিকাঠামো তৈরি করেন। এরপর ডাক আসে নেপালের রাজদরবার থেকে ১৮৬৯ সালে। পাঁচ সহকারীকে নিয়ে নেপালে গিয়ে রাজকৃষ্ণ নেপাল টাঁকশাল ও গোলাবারুদ তৈরির কারখানার বিস্ময়কর উন্নতিসাধন করেন। কাবুলের আমিরের ডাকে সেখানে রেললাইন পাতার কাজ করে তিনি পুনরায় নেপালে ফিরে আসেন। তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত হয় বৈদ্যুতিক আলো এবং রাইফেল নির্মাণের প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকীকরণের কাজে। শোনা যায় তিনি উন্নত মানের দেশি পিস্তল, এমনকি মেশিনগান জাতীয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের কাজে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

কালিদাস শীল : কলকাতা শহরে বিজলিবাতির প্রধান নির্মাণ সংস্থা ছিল ৩৬ ওয়েলিংটন স্ট্রিটের দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি। ১৮৮০ সাল থেকে কলকাতার সভাসমিতি, বিভিন্ন সরকারি সৌধ এবং শহরের রাস্তায় নানা ধরনের আলো লাগানোর একচেটিয়া কারবার ছিল এই কোম্পানির। ১৮৯০ সালে এই কোম্পানির মালিক কালিদাস ব্যালান্সড ও বৈদ্যুতিক পাখা তৈরির স্বয়ংক্রিয় মোটরের পেটেন্ট নেন। বিজলিবাতি তৈরিতে কালিদাস শীল ছিলেন এক অনন্যসাধারণ কারিগর। কার্বন আর্ক ল্যাম্পের থেকে নিঃসৃত বিকট শব্দের থেকে সকলকে মুক্তি দিয়ে তিনি এক নতুন ধরনের ইলেকট্রিক আলো শোভাযাত্রায় ব্যবহার করেন, দীপ্তি ও চমৎকারিত্বের দিক থেকে যা ছিল অভূতপূর্ব। ১৫০০ ক্যানডাল ঔজ্জ্বল্যের আলো তৈরি করে নজরে আসেন উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিমান তরুণ কালিদাস শীল। দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি যে নানা ধরনের বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম প্রদর্শন করত, তার মধ্যে ছিল মোটরে চলা সেলাইকল, টেবিল ফ্যান প্রভৃতি। তাঁর সৃষ্টি প্রতিভায় চমৎকৃত হয়ে লর্ড ডাফরিন পর্যন্ত তাঁকে অভিনন্দন জানান। Thacker's Calcutta Directory 1912-তে প্রতিষ্ঠানটির নাম লক্ষ করা যায়। সেটি অবস্থিত ছিল সাগর ধর লেনে, কালিদাস শীলের বাড়িতে।

নীলমণি মিত্র (১৮২৮-১৮৯৪) : কলকাতায় সুপ্রাচীন ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান নীলমণি মিত্র রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম দেশীয় ছাত্র হিসাবে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। দেশীয় বাস্তুবিদ হিসাবে তাঁর কর্মদক্ষতা ও দূরদৃষ্টির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় গঙ্গার খাল নির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকর করার সময়। মূলত এই কাজের সাফল্যের সূত্রেই তিনি তৎকালীন কলকাতা প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী বাস্তুবিদ এবং ১৮২৮ সালে প্রধান সরকারি বাস্তুবিদের পদে উন্নীত হন।

স্বাধীনচেতা নীলমণির সঙ্গে অনতিবিলম্বেই ব্রিটিশ প্রভুবর্গের দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে পেশাগত জীবন শুরু করার চরম ঝুঁকি নেন। তিনি বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়ি, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ এবং এমারেল্ড টাওয়ারের মতো ইমারতের কাজ সুসম্পন্ন করেন। স্বদেশব্রতী নীলমণি অর্থের মোহ পরিত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব প্রার্থনাগৃহ প্রভৃতি তৈরি করেন। মহেন্দ্রলাল সরকারের কালটিভেশন অফ সায়েন্সের মূল ভবন তিনি শুধু বিনা পারিশ্রমিকে গড়ে দেননি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানে ১০০০ টাকা চাঁদাও দিয়েছিলেন।

মেধাজীবী বাঙালির অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার সুবর্ণযুগে বিহারের মধুপুরকে স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ার কারণে বাঙালির বিকল্প বাসস্থান হিসাবে গড়ে তোলার বিশাল পরিকল্পনার রূপায়ণের স্বপ্ন প্রথম দেখেন নীলমণি মিত্রই। ভারতবর্ষে যথোপযুক্ত আয়করের দাবিদাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উদ্যোগেই প্রথম করদাতা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান সভার একজন অত্যন্ত উৎসাহী সদস্য ছিলেন তিনি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি (১৮৬৩-১৯১৫) : আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপেন্দ্রকিশোরের পরিচিতি মূলত মুদ্রণশিল্পে তাঁর মৌলিক অবদানের কারণে। তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা ইউ রে অ্যান্ড সন্সকে তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাপাখানায় পরিণত করেছিলেন। এনগ্রেভিং রীতিতে রঙিন আলোকচিত্র মুদ্রণ যখন ইয়োরোপেও শৈশবাবস্থায়,

সে সময় এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে মুদ্রণপ্রথার দুর্বলতা মোচন আর রঙিন ও হাফটোন ব্লক নির্মাণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটিয়ে তিনি পাশ্চাত্যের মুদ্রণজগৎকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে হাফটোন ব্লকের প্রবর্তন করেন এবং গবেষণার মাধ্যমে এর প্রভূত উন্নতি ঘটান। সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে গবেষণা করে উপেন্দ্রকিশোর রঙিন মুদ্রণের নানা প্রকার ডায়াফর্ম যন্ত্র, স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র, ডুয়োটাইপ ও টিন্ট প্রসেস পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নাম যুক্ত করে রে-স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার ও রে-টিন্ট সিস্টেম নামকরণ করা হয়। তাঁর পরিকল্পনা অনুসরণ করে ব্রিটেনে বাণিজ্যিকভাবে ‘স্ক্রিন অ্যাডজাস্টিং মেশিন’ বানানো হয়। ব্রিটেনের মুদ্রণকলাবিষয়ক অভিজাত পত্রিকা পেনরোজ অ্যানুয়াল ভল্যুম ১৯০৪-০৫ ও ১৯০৫-০৬-এ উপেন্দ্রকিশোরের মুদ্রণবিষয়ক প্রবন্ধ ও তাঁর প্রতি প্রশংসাসূচক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) : বাঙালি শিশু সাহিত্যিক ও বাংলা সাহিত্যে ননসেন্স্-এর প্রবর্তক। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সন্তান। তাঁর পুত্র খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। তাঁর লেখা বই আবোল তাবোল, হয়বরল, গল্প সংকলন পাগলা দাশু এবং নাটক চলচিত্তচঞ্চরী বিশ্বসাহিত্যে সর্বযুগের সেরা।

সুকুমার কলকাতা থেকে ১৯০৬ সালে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় বি.এসসি. করার পর ১৯১১ সালে ‘গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ’ নিয়ে আলোকচিত্র ও মুদ্রণপ্রযুক্তির ওপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং কালক্রমে ভারতের অগ্রগামী আলোকচিত্রী ও লিথোগ্রাফার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। হাফটোন মুদ্রণ প্রযুক্তির ওপর ১৯১২ সালে তিনি ‘Halftone Facts Summarized’ রচনা করেন যা Penrose Annual-এ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি ইংল্যান্ডের ‘Royal Photographic Socicty’-র সদস্য নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির আগে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এরপর ১৯১৩ সালে ‘Penrose Annual’-এর তাঁর রচিত ‘Standardizing the Original’ প্রকাশিত হয় এবং ‘Pin-hole theory’-র ওপর একটি রচনা ১৯১৩-এর জুলাই মাসে ‘The British Journal of Photography’-তে প্রকাশিত হয়। সুকুমারের ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সময়েই পিতা উপেন্দ্রকিশোর উন্নতমানের রঙিন হাফটোন ব্লক তৈরি ও মুদ্রণক্ষম একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং ছোটদের মাসিক পত্রিকা ‘সন্দেশ’-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৩ সালে। সে বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর সুকুমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে স্বদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরেই সুকুমার ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন এবং ১৯৪১ সালে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের’ যুগ্ম সচিব পদে নিযুক্ত হন।

হেমেন্দ্রমোহন বসু (১৮৬৬-১৯১৯) : এইচ বোস নামেই জনপ্রিয় এবং প্রায় কিংবদন্তী হেমেন্দ্রমোহন বসু ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম অবিভক্ত বাংলায় কলের গান, মোটর গাড়ি, বাই-সাইকেল, টর্চলাইট ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরামর্শে গড়ে তুলেছিলেন সুগন্ধি তেলের কারখানা, ‘এইচ বোস, পারফিউম ম্যানুফ্যাকচারার্স’। বাঙালির নিজস্ব শিল্প গড়ার শুরুর দিনের অন্যতম শিল্পপতি ছিলেন হেমেন্দ্রমোহন।

হেমেন্দ্রমোহন বসুই প্রথম তাঁর সুগন্ধি কুন্তলীন ও দেলখোস তেলের প্রচার, বিজ্ঞাপন ও ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য ১৮৯৬ সালে ‘কুন্তলীন’ পুরস্কার প্রবর্তন করেন। বাঙালির মধ্যে প্রথম কলকাতার হ্যারিসন রোডে তিনি মোটরগাড়ি ও বাই-সাইকেলের ব্যবসার সূত্রপাত করেন। কলকাতা শহরে তিনিই ভারতীয় রঙিন আলোকচিত্র গ্রহণের পথিকৃৎ।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্বের বিষয় হল কলের গানের ‘রেকর্ড’ তৈরির কারখানা স্থাপন। ভারত উপমহাদেশে প্রথম গ্রামাফোন নিয়ে আসেন এফ ডব্লিউ গেইসবার্গ। ১৯০২ সালে কলকাতার বাঙালি শিল্পী গওহর জানকে দিয়ে প্রথম বাংলা গানের রেকর্ড করেন। এই উপমহাদেশে প্রথম কলের গানের আগমন হয় ভারতের মুম্বাই ও কলকাতায়। কলের গানের এ দেশে আসা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে। শোনা যায় ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ এক বন্ধুর কাছ থেকে গ্রামাফোন উপহার হিসেবে পান। ১৯০৮ সালের ১৯ জুন কলকাতার বেলেঘাটায় মার্বেল হাউস নামে একটি বাড়িতে হেমেন্দ্রমোহন দ্য টকিং মেশিন নাম দিয়ে সিলিন্ডার রেকর্ডের কারখানা শুরু করেন। সেখানে বিভিন্ন গান, গীত, নাটক ও কৌতুক রেকর্ড করা হতো। ডিস্ক রেকর্ড বাজারে আসার পর সিলিন্ডারের চাহিদা কমে গেলে অদম্য হেমেন্দ্রমোহন প্যাথে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে ‘প্যাথে-এইচ বোস রেকর্ড’ লেবেলযুক্ত গ্রামাফোন রেকর্ড তৈরি শুরু করেন। এটিই সম্ভবত

ভারতবর্ষে কোনো বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে যৌথ কারবার বা ফ্রাঞ্চাইজের দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের যে কণ্ঠস্বরের নমুনাগুলি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে তার অনেকগুলির কৃতিত্ব এই শিল্পোদ্যোগী স্বপ্নদ্রষ্টার।

সত্যজিৎ রায় জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন যে, এইচ. বোস কোম্পানির কলের গান শুনে আর তাঁর তোলা ছবি 'অটোক্রোম স্লাইড' থেকেই পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রেরণা লাভ করেন।

রসিকলাল দত্ত (জন্ম ১৮৪৪) : কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এই কৃতি ছাত্র ডিপ্লোমা লাভ করার পর এম ডি-র শেষ পরীক্ষা দেওয়ার আগেই হাওড়ায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। কুলি জাহাজের চিকিৎসকের কাজ নিয়ে পাড়ি দেন সুদূর ত্রিনিদাদে। তারপর বিলেতের এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বি ডিগ্রি নিয়ে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন। ডাক্তারি পেশায় ঈর্ষণীয় সাফল্যের পাশাপাশি অতন্দ্র ছিলেন মৌলিক গবেষণার কাজে। ক্লোরোপিক্রিন নামক একটি যৌগ প্রস্তুত করার এক নতুন প্রক্রিয়া তিনি উদ্ভাবন করেন। রাসায়নিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রথম ডি এসসি (Doctor of Sciences) উপাধি প্রদান করেন। কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য এবং সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সামাজিক দাবিসমূহের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। কর্মদক্ষতার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত করেন।

বিপিনবিহারী দাস : সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যিনি প্রথম মোটরগাড়ি নির্মাণ করেন তাঁর নাম বিপিনবিহারী দাস। গাড়িটির নামও ছিল 'স্বদেশি'।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটি ছোট্ট মোটর সারানোর কারখানার মালিক বিপিনবিহারী দাস একক প্রচেষ্টায় অন্তত তিনখানা মোটরগাড়ি এবং ইঞ্জিন বানিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি প্রথম স্বদেশি মোটরকারের ক্রেতা ছিল বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এবং সে গাড়ি ব্যবহার করতেন মতিলাল নেহরু ও মদনমোহন মালব্য। তাঁর তৈরি আরেকটি গাড়ি কিনেছিল কলকাতা কর্পোরেশন, যার নাম্বার ছিল ৩৫৯৭৭। তাঁর মোটর নির্মাণের উদ্যোগ প্রত্যাশিত প্রশংসা পায়নি। তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের জন্যও একটি গাড়ি নির্মাণ করেন যেটি বহুকাল সন্তোষজনকভাবে চলে। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার বিশ্বকর্মা বলে পরিচিত প্রথম দেশীয় মোটরকার নির্মাতার জীবনাবসান হয়।

প্রমথনাথ বসু (১৮৫৫-১৯৩৫) : সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল ভাবুক ও কর্মীদের অন্যতম ছিলেন প্রমথনাথ বসু। লন্ডনে ভারতসভার সক্রিয় সদস্য হিসাবে বহু রাজনৈতিক কার্যকলাপে আপসহীনভাবে রত থাকায় সমকালের সেরা ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও ন্যায্য মর্যাদা পাননি। জামশেদপুরে টাটার বর্তমান ইস্পাতসাম্রাজ্য স্থাপনের নেপথ্যে প্রধান কারণ ছিল তাঁর লৌহ আকরিক সন্ধানের সাফল্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হওয়ার পর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম অধ্যক্ষ ও পরিদর্শক ছিলেন প্রমথনাথ। বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখেছেন ইংরাজিতে, যার মধ্যে রয়েছে 'A History of Hindu Civilization under British Rule', 'Epochs of Civilization', 'Swaraj-Cultural and Political' প্রভৃতি। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের রয়্যাল স্কুল অফ মাইনস্ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এসে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে যোগ দেন। তাঁর চাকরিজীবনে তিনি মধ্যপ্রদেশের ধুল্লি ও রাজাহারা লৌহখনি অবিষ্কার করেন এবং তার ফলে ভিলাই কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর কর্মজীবনে বিশিষ্ট কীর্তির মধ্যে রয়েছে ময়ূরভঞ্জের গুরুমহিষানি অঞ্চলের লৌহখনি আবিষ্কার (১৯০৩-০৪)। তার ফলে জামশেদজি টাটাকে তিনি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনে রাজি করান। এছাড়াও রানীগঞ্জ, দার্জিলিং ও আসামে তিনি কয়লার অনুসন্ধান করেন। সিকিমে তামা ও ব্রহ্মদেশে খনিজ বস্তু অনুসন্ধানেও তাকে তৎপর হতে দেখা যায়। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু গঠনমূলক কাজে অংশ নেন। ইংল্যান্ডে ইন্ডিয়া সোসাইটির কর্মসচিবের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর অম্লান হয়ে আছে 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' গ্রন্থে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য তিনি 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার' স্থাপন করেন, যা পরে সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

পি. এম. বাগচি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার :

বাঙালির প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি নাম পি. এম. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি। উনবিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর কলকাতার এক ভাড়াবাড়িতে শ্রীকিশোরীমোহন বাগচি এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর পিতার নাম প্যারীমোহন বাগচি। প্যারীমোহন এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও, পিতার নামের আদ্যক্ষর নিয়ে কিশোরীমোহন কোম্পানির এরূপ নামকরণ করেন। প্রতিষ্ঠার সময় কোম্পানিটির নাম ছিল 'দর্জিপাড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস'। এরপর সেটি 'দর্জিপাড়া কেমিক্যাল অ্যান্ড রবারস্ট্যাম্প ওয়ার্কস'-এ পরিণত হয়। অবশেষে কোম্পানির নাম হয় 'পি. এম. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি'। সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও বিপুল কর্মোদ্যোগে কোম্পানিটি কালি, সুগন্ধি ও প্রসাধন, রবার স্ট্যাম্প, পঞ্জিকা ছাপাখানা, কাঠের ব্লক ও ওষুধ তৈরিতে নিয়োজিত হয়। কোম্পানিটিতে বিভিন্ন ধরনের ও নানান রঙের কালি তৈরি করা হত, যা সারা বিশ্বে রাসায়নিক কালি তৈরি হওয়ার আদিপর্বে যথেষ্ট প্রশংসনীয় ছিল। তরল কালির সঙ্গে সঙ্গে PMB নাম খোদাই করা ট্যাবলেট কালি ও কোম্পানি তৈরি করে। তৈরি হয় পাউডার কালি। সুগন্ধি দ্রব্য ও প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে ছিল স্নো, ক্রিম, পাউডার, সেন্ট প্রভৃতি। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় শিল্পমেলায় উচ্চমানের সুগন্ধি প্রস্তুত করার সুবাদে কোম্পানিটি স্বর্ণপদক লাভ করে। কোম্পানি প্রতিষ্ঠার কিছুকালের মধ্যেই 'দর্জিপাড়া কেমিক্যাল অ্যান্ড রবার স্ট্যাম্প ওয়ার্কস'-এর সূচনা হয়। ক্রমশ কোম্পানিটি পঞ্জিকা প্রকাশ ও ছাপাখানা, প্রকাশনা এবং টাইপ ফাউন্ড্রি নিয়ে কাজ শুরু করে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। সঙ্গে ছাপা হত ডাইরেক্টরি। পরবর্তীকালে কোম্পানি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের উদ্যোগে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পঞ্জিকায় নিজেদের বিজ্ঞাপনে পাশাপাশি বহু স্বদেশি কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। এই প্রকাশনার স্বার্থেই কোম্পানিটি কাঠের ব্লক তৈরি করে। এছাড়াও কোম্পানিটি কবিরাজি ও অ্যালোপ্যাথিক—এই দুই শাখায় অজস্র ওষুধ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিশ শতকের সূচনায় কবিরাজি ওষুধ তৈরির কাজ শুরু হয় আর অ্যালোপ্যাথিক তৈরির কাজ শুরু হয় চারের দশকে। পি. এম. বাগচির ওষুধের ক্ষেত্রে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও বেঙ্গল ইমিউনিটির কথা স্বভাবতই মনে আসে। পেটের অসুখ, জ্বর প্রভৃতি অসুখ-বিসুখের পেটেন্ট ওষুধ কোম্পানির এই বিভাগে তৈরি হত।

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) : জগদীশচন্দ্র বসু পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে বি.এ. পাস করার পরে বিলেতে যান ডাক্তারি পড়তে। ১৮৮৪ সালে বি.এসসি পাস করে দেশে ফিরে আসেন। জগদীশচন্দ্রের প্রথম দিকের গবেষণার বিষয় ছিল তারের সাহায্য ছাড়াই খবর বা সংকেত কীভাবে পাঠানো যায় তাই নিয়ে। দিনের পর দিন প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি এমন একটি যন্ত্র তৈরি করলেন যাতে তিনি এতদিন ধরে যা চাইছিলেন তা করা সম্ভব হল। ওই যন্ত্রের সাহায্যে কোনো তার ছাড়াই এক ঘর থেকে দূরের আর এক ঘরে সংকেত পাঠানো সম্ভব হল। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, তারই সাহায্যে জগদীশচন্দ্র এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি করেছিলেন। তাঁর এই গবেষণার জন্য তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি লাভ করেন।

জগদীশচন্দ্র এরপর উদ্ভিদের চেতনা অনুভূতি নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেন যে গাছেরও চেতনা আছে, কষ্ট আছে, যন্ত্রণা আছে। ব্রোমাইড নামে একরকম বিষ লাগিয়ে দিলে উদ্ভিদ কীভাবে প্রথমে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় আর তারপর ধীরে ধীরে মরে যায় তা তিনি সকলের নজরে আনেন। দেশবিদেশের নানা সম্মান লাভ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। ১৯১৭ সালে তিনি বিজ্ঞানের চর্চা আর গবেষণার জন্যে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নামে একটি সংস্থা তৈরি করেন কলকাতায়। আমাদের দেশের গৌরব যাঁরা বাড়িয়েছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁদেরই একজন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর বাংলা রচনা 'অব্যক্ত' য় তাঁর শিল্পী মনের যথাযথ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'Plant Responses as a means of Physiological Investigations', 'Physiology of Photosynthesis', 'Nervous mechanism of Plants' ইত্যাদি। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ক্রেসকোগ্রাফ, স্ফিগ্‌মোগ্রাফ, পোটোমিটার ও ফোটোসিন্থেটিক বাবলার নামক কয়েকটি স্বয়ংলেখ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) : প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাস করার আগেই গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮২ সালে বিলেতে যান। সেখানে বি এসসি পাস করেন এবং ১৮৮৭ সালে রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কার পান। ১৮৮৮ সালে দেশে ফেরেন। পরের বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। শুরু হয় তাঁর শিক্ষক ও গবেষকজীবন।

এরপর ১৯৩৭ সালে ৭৫ বছর বয়সে তিনি যখন পরিপূর্ণ অবসর নিতে চাইলেন, তখন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে এমিরিটাস অধ্যাপক হিসাবে রসায়নের গবেষণাকর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখেন।

বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিয়ে তিনি কলেজেরই দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে থাকতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই ঘরে কাটিয়েছেন। কলেজে সব সময় ৮-১০ জন ছাত্র গবেষণার কাজে তাঁর কাছে থাকতেন। তাঁর প্রথম মৌলিক গবেষণা খাবারে ভেজাল নির্ণয়ের রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন-সংক্রান্ত। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার মারকিউরাস নাইট্রাইট। এ ছাড়া পারদ-সংক্রান্ত ১১টি মিশ্র ধাতু আবিষ্কার করে তিনি রসায়ন জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। গবাদি পশুর হাড় পুড়িয়ে তাতে সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করে তিনি সুপার ফসফেট অব লাইম তৈরি করেন।

শুধু গবেষণা নয়, গবেষণার ফল কাজে লাগানোর জন্য তিনি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।

ভারতে বিধিবন্ধ সমবায় আইন চালু হয় ১৯০৪ সালে। ১৯০৬ সালে তিনি রাড়ুলি এবং এর আশপাশের গ্রামের মানুষকে জড়ো করে ৪১টি কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। ছাত্রদের সঙ্গে ছিল নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রেরণায় ও অর্থসাহায্যে ‘ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষা এবং শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে তিনি অকৃপণভাবে সাহায্য করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর আত্মচরিত ‘Life and Experiences of a Bengali Chemist’ ছাড়াও তিনি ‘বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার’, ‘অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার,’ ‘History of Hindu Chemistry’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করেন।

মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬) : ‘সারা বিশ্বের বিজ্ঞান মহলে মেঘনাদ সাহা নিঃসন্দেহে জয় করে নিয়েছেন একটা সম্মানজনক স্থান’ বলেছেন স্বয়ং আইনস্টাইন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা কলেজ থেকে আই এস সি-তে তৃতীয় এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে গণিতে অনার্সসহ বি এসসি-তে দ্বিতীয় এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এম এসসি পরীক্ষায় ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এখানে গবেষণা করে ডি এস সি ও পি আর এস হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল রিলেটিভিটি, প্রেশার অফ লাইট ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স।

১৯১৭ সালে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ‘অন ম্যাক্সওয়েল স্ট্রেসেস’ প্রকাশিত হয় ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে। এরপর ১৯২০ সালেই এই ম্যাগাজিনে ‘On Ionization in the Solar Chromosphere’ (সূর্যের বর্ণমণ্ডলে আয়নকরণ) শিরোনামে তাঁর তাপ আয়নকরণতত্ত্ব প্রকাশিত হয় যা জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত সূচনা করে। কারণ এই তত্ত্ব দ্বারাই প্রথম তাপবলবিদ্যা ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণির তারকার বর্ণালী ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল। এই তত্ত্বটিই পরে সাহার সমীকরণ নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই আবিষ্কারটি এমন এক সময়কার আবিষ্কার যখন কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোনো অগ্রগতি ছিল না জ্যোতির্বিজ্ঞানের। এটি এ বিষয়ে গবেষণার সকল পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তাই বলা চলে গ্যালিলিওর পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দশটি আবিষ্কারের মধ্যে মেঘনাদ সাহার এই আবিষ্কার অন্যতম। গবেষণার দ্বারা তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের বীক্ষণাগারে ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শনের জন্য তিনি লন্ডন ও বার্লিন থেকে আমন্ত্রণ লাভ করেন। দু’বছর পর ফিরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে প্রথম ‘খয়রা অধ্যাপক’ হিসেবে নিযুক্ত হন।

সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকা মারফত দামোদর উপত্যকা সংস্কার, বন্যা প্রতিরোধ ও নদী পরিকল্পনা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে গবেষণা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ভারতীয় নদীগুলোর প্রায় চিরস্থায়ী বন্যা সমস্যা নিয়ে সারা জীবনই তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন।

মেঘনাদ সাহার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথামতো ভারতীয় বর্ষপঞ্জির সংস্কার। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার এই বর্ষপঞ্জির সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই বর্ষপঞ্জি সংস্কার কমিটিতে মেঘনাদ সাহা ছিলেন সম্ভবত একমাত্র বৈজ্ঞানিক।

তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ লন্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলোশিপ প্রদান করেন।

ড. মেঘনাদ সাহা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে যেখানে ১৫ বছর কাজ করেন এবং ‘স্কুল অফ ফিজিক্স’ নাম দিয়ে পদার্থবিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার গড়ে তোলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে তিনি সর্বপ্রথম ভারতের সার্বিক উন্নতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের কথা বলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক হন। এরপরে গড়ে তোলেন ‘ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স’ (১৯৪৮)। ‘ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স’ এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই চেষ্টায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স ও গ্লাস সেরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে রয়েছে ‘The Principle of Relativity, Treatise on Heat, Treatise on Modern Physics, Junior Textbook of Heat with Meteorology’ প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) : ‘যারা বলেন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান জানেন না।’ আগামী প্রজন্মের উদ্দেশে এই চিরস্মরণীয় উক্তিটি যিনি করেছিলেন, তিনি হলেন আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাদের একজন।

১৯০৯ সালে তিনি হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান ও ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্সে শীর্ষস্থান এবং ১৯১৫ সালে মিশ্রগণিতে বিজ্ঞান স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ‘প্লাঙ্ক সূত্র ও আলোকতত্ত্বের কোয়ান্টাম প্রকল্প’ নামে চার পৃষ্ঠার এক মৌলিক প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন ইংল্যান্ডের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন নামক এক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকায়। কিন্তু সেখানে প্রকাশের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় বোস একটি চিঠিসহ তা পাঠালেন আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে। আইনস্টাইন এ প্রবন্ধের গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করেন এবং লেখাটি জার্মানে অনুবাদ করে পদার্থবিদ্যার অন্যতম একটি জার্মানি পত্রিকায় ১৯২৪ সালে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। মন্তব্যটি ছিল, ‘‘আমার মতে, প্লাঙ্কের সূত্রের ক্ষেত্রে বসু কর্তৃক নির্ধারণ পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এবং এই তত্ত্ব আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টামতত্ত্বে প্রয়োগ করা সম্ভব, যা আমি অন্যত্র দেখাব।’’ এর পরপরই এই প্রবন্ধ বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানতত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্বের জনক হিসেবে বোসের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়।

৮৮ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের তরুণ বাঙালি বিজ্ঞানী সতেন্দ্রনাথ বসু যে তত্ত্ব-কল্পনা আর গবেষণার বীজ বুনেছিলেন, সার্নে আবিষ্কৃত কণাটি সেই গণনার নীতিই মেনে চলে। এ কারণেই হিগস কণাটি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে ‘বসু’ অংশটি ধারণা করেই বসু কণা বা বোসন নামে পদার্থবিজ্ঞানে বিগত ৪৫ বছর ধরে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা একমাত্র বিজ্ঞান গ্রন্থ বিশ্বপরিচয় উৎসর্গ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে। বসু সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, ‘a man of genius with a taste for literature and who is a scientist as well.’

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পাট সংস্থার কৃষি গবেষণা উপসমিতিতে সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলায় বিজ্ঞান জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোর আহ্বানে প্যারিসে যান আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনার জন্য। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের আমন্ত্রণে তিনি বুদাপেস্ট গমন করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভাষাচর্চার অবদানস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করে।

দেবেন্দ্রমোহন বসু (১৮৮৫-১৯৭৫): দেবেন্দ্রমোহন বসু পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর জগদীশচন্দ্রের প্রেরণায় উচ্চশিক্ষার্থে ইয়োরোপ যান। কেমব্রিজের ক্রাইস্টচার্চ কলেজে গবেষণার পর রয়্যাল কলেজ অফ সায়েন্স থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এসসি ডিগ্রিতে সম্মানিত হন ১৯১২ সালে। ১৯১৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বোস-স্টেলার থিওরির অন্যতম আবিষ্কর্তা হিসেবে পি এইচ ডি। সি ভি রমনের মৃত্যুর পর পালিত অধ্যাপক পদে তিনি উন্নীত হন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সরকারি চাকরি ছেড়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির পদ ছাড়াও দেশবিদেশের বহু বিজ্ঞান সমাবেশে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ভারতবর্ষে উইলসন-সোলার ক্লাউড গবেষণার পথিকৃৎ। চৌম্বকক্ষেত্রের উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা এবং জগদীশচন্দ্রের কিছু অসমাপ্ত গবেষণায় পূর্ণতাদানের ব্রতে আমৃত্যু নিমগ্ন ছিলেন এই সারস্বত সাধক।

প্রিয়দারঞ্জন রায় (১৮৮৮-১৯৮২) : চট্টগ্রাম কলেজে উচ্চশিক্ষার প্রাথমিক পর্ব শেষ করার পর ১৯০৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ স্নাতক এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে ১৯১১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। প্রিয় বিষয় ছিল অজৈব রসায়ন। উচ্চতর গবেষণা শুরু করার কিছুদিন পরেই একটি দুর্ঘটনায় সালফিউরিক অ্যাসিড লেগে তাঁর বাঁ চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং ডান চোখটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে গবেষণার কাজ চালাতে চালাতেই সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৮ সালে স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত সায়েন্স কলেজে 'পালিত অধ্যাপক' প্রফুল্লচন্দ্রের সহকারী নিযুক্ত হন প্রিয়দারঞ্জন। ১৯২৯ সালে ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে ইয়োরোপের সুইজারল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার প্রথম শ্রেণির কয়েকটি রাসায়নিক গবেষণাগারে হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁকে আরো সমৃদ্ধ করে। এই পর্বে তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল 'যৌগিক পদার্থের আণবিক গঠন ও সংযোগ ক্ষমতা'। প্রিয়দারঞ্জনের গবেষণা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে সানন্দ স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৩৭ সালে দেশে ফিরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের খয়রা অধ্যাপক এবং ১৯৪৬ সালে পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতিত্বের সূত্রে প্রিয়দারঞ্জন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের *হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস* গ্রন্থটি নতুন করে সম্পাদনা করেন। তবে ছাত্র রসায়ন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞানের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভাবনা সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর। প্রিয়দারঞ্জন রচিত একটি গ্রন্থের নাম 'অতিকায় অণুর বিচিত্র কাহিনী'।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৮৩) : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্রগোষ্ঠীর এক জ্যোতিষ্ক জ্ঞানেন্দ্রনাথ শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচুর ব্যাঘাত ঘটলেও একরোখা জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিতে সম্মানিত হন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের রসায়নের মূল বিষয় ছিল কোলয়েডের মধ্যে তড়িৎ উদ্ভবের ক্রিয়া। এ বিষয়ে ১৯২০ সালের ২৯ অক্টোবর লন্ডনের ফ্যারাডে সোসাইটি ও ফিজিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে তিনি যে সন্দর্ভ পাঠ করেন বিখ্যাত নেচার পত্রিকা তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলে এ বিষয়ে অধ্যাপক মুখার্জির মত-ই বিজ্ঞানজগতে সর্বাগ্রগণ্য।

তেল নিষ্কাশন সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রায়োগিক পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞ বার্মা অয়েল কোম্পানি তাঁকে সম্মানদক্ষিণা হিসাবে যে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করে তিনি সেই অর্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোলয়েড গবেষণা বিষয়ক বিভাগ চালু করার জন্য দান করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের *ওরিজিন অ্যান্ড নিউট্রালাইজেশন অফ দি চার্জ অফ কোলয়েডস* উক্ত বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা পায়। রসায়ন বিদ্যার পাশাপাশি কৃষিবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাঁর গবেষণা ভারত সরকারকে সাহায্য করেছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক গণিতমহলে কেমব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথমেটিকস-এর মতো কুলীন পত্রিকায় প্রকাশিত এবং উচ্চপ্রশংসিত হয়। গণিতের পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা, সংস্কৃত ও পালি ভাষাসাহিত্য এবং আইনবিদ্যায় তাঁর অধিকার ছিল বিস্ময়কর। মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষাচর্চার

বাহন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃথিবীর অন্যতম সেরা জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র করে তোলার জন্য তাঁর নিরলস সংগ্রামের তুলনা পৃথিবীতে খুব কম। বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনের অধীনে নিয়ে আসার জন্যও তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, সি ভি রমনের মতো অন্য প্রদেশের সম্ভাবনাময় গুণীজনকে এবং রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট করে তিনি তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রায় সব জাতীয়তাবাদমূলক বিষয়কে কার্যকর করেছিলেন। তিনি কলেজ স্ট্রিট ও রাজাবাজার ক্যাম্পাসে কলা ও বিজ্ঞান শাখার জন্য নতুন বিভাগসমূহ স্থাপন করেন এবং দেশি ভাষা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিভাগ দুটি চালু করেন। তাঁর আমলে বিদেশি ও ভারতীয় বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ প্রফেসর হিসেবে বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত হন। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত বিভাগের সিলেবাস প্রণয়নে তত্ত্বাবধান করেন। তিনি ছাত্রদের কল্যাণের জন্য যেমন উদ্বিগ্ন থাকতেন, তেমনি শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা দিতেন।

ইন্দুমাধব মল্লিক (১৮৬৯-১৯১৭) : সমকালে মেধাবী ছাত্র হিসাবে প্রায় কিংবদন্তী, বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ইন্দুমাধব মল্লিক সম্পর্কে ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখা হয় : 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত উপাধি পরীক্ষা প্রদান করা যেন তাঁহার একটা খেয়াল ছিল। এম.এ. পরীক্ষাই তিনি তিনবার তিন বিষয়ে দিয়া উত্তীর্ণ হন, তাহার পর বি.এল. পরীক্ষা দেন। তাহার পর তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন; উকিল না হইয়া ডাক্তারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন।'

ইন্দুমাধব ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রথম বোটানির এম.এ (১৮৯৮), এ ছাড়া ১৮৯১ সালে দর্শনশাস্ত্রে ও ১৮৯২-তে পদার্থবিদ্যায়, ১৮৯৯ সালে জীববিদ্যা ও শারীরবিদ্যায় সসম্মানে এম. এ. পাশ করেন। আইনশাস্ত্রে স্নাতক হওয়ার পর কিছুদিন আদালতে যাতায়াত করে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনায় ফিরে যান। ১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এম.ডি. ডিগ্রি পাওয়ার পর শেষপর্যন্ত ডাক্তারি পেশায় স্থিতিশীল হলেও দেশভ্রমণের তীব্র আগ্রহ কখনোই তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। ১৯১০ সালে প্রবাদে পরিণত হওয়া যন্ত্র ইকমিক কুকার উদ্ভাবন করেন। এদেশে অটোভ্যাকসিন পদ্ধতি তিনিই চালু করেন। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, পৌরবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কেও তাঁর অত্যন্ত মৌলিক মতামত ছিল। ইন্দুমাধবের 'চীন ভ্রমণ' ও 'বিলাত ভ্রমণ' বই দুটি এখনও অতি উচ্চমানের ভ্রমণ সাহিত্যের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকে।

শিশিরকুমার মিত্র (১৮৯০-১৯৬৩) : শিশিরকুমার ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় স্বর্ণপদক এবং ১৯২০ সালে সি. ভি. রমনের অধীনে গবেষণা করে রেডিও ফিজিক্সে ডি. এস. সি পান। প্রাথমিক কর্মজীবন কাটে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনায়।

প্যারিসে সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর কিছুদিন মাদাম ক্যুরির গবেষণাগারে কাজ করার বিরল সুযোগের অধিকারী শিশিরকুমার ১৯২৩ সালে দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে বিলেতে রেডিও ফিজিক্সের উচ্চতর প্রয়োগিক শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে একটি রেডিও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন এবং বহু সংগ্রামের পর ১৯৪২ সালে ভারত সরকারের শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা কমিটির অনুমোদন লাভ করে তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে রেডিও ফিজিক্স অন্তর্ভুক্তির কৃতিত্ব শিশিরকুমারেরই প্রাপ্য। ১৯৫৮ সালে F.R.S.(Fellow of the Royal Society) সম্মানলাভ করেন। আয়নমণ্ডলে বেতারতরঙ্গীয় আবেশ সংক্রান্ত গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে অস্ট্রেলিয়ার এক সংস্থা তাঁকে অত্যাধুনিক একটি আয়োনোস্ফিয়ার মাপক যন্ত্র উপহার দেয় এবং স্বদেশব্রতী শিশিরকুমার সেটি কলকাতার উপকণ্ঠে হরিণঘাটায় স্থাপন করেন। ১৯৫১-৫৩ এশিয়াটিক সোসাইটির এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলে সমাদৃত তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ হল *The Upper Atmosphere*।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) : আধুনিক ভারতীয় রাশিবিজ্ঞানের জনক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এসসি এবং পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত পড়াশুনা বা গবেষণার সুযোগ ছিল না। বিশ্বের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা যে অগ্রগণ্য, তার মূলে রয়েছে প্রশান্তচন্দ্রের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা। ১৯৩২ সালে প্রশান্তচন্দ্রের রাশিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে দুটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ছাত্রদের রাশিবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধার জন্য প্রশান্তচন্দ্র ১৯৩১ সালে তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। নৃবিজ্ঞানে রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ করে তিনি 'মহলানবিশ ডিস্ট্যান্স' নামে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম রাশিবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। প্রশান্তচন্দ্র এই বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। ওই বছরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বাংলা সরকারের রাশিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালে বাংলায় প্রথম স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরো স্থাপিত হয়। এরপর ১২টি প্রদেশে এই ব্যুরো গড়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে রাশিবিজ্ঞানকে একক শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯৫৪ সালে প্রশান্তচন্দ্র লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির অবৈতনিক সদস্য পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি ইন্টারন্যাশন্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের অবৈতনিক সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ওই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি পদ্মবিভূষণ লাভ করেন ১৯৬৮ সালে।

নীলরতন ধর (১৮৯২-১৯৮৬) : শিক্ষাজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরেই প্রথম নীলরতন এম.এসসি-তে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে সর্বোচ্চ রেকর্ড নম্বর পেয়ে কুড়িটি স্বর্ণপদক, গ্রিফিথ পুরস্কার, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে এম.এসসি পড়ার সময়ে বিজ্ঞান জগতের দুইজন দিকপাল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণায় ১৯১৫ সালে স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেতযাত্রা, ১৯১৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ১৯১৯ সালে প্যারিসের সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে লন্ডনে ফিরে আই. ই. এস. মনোনীত হওয়ার পর এলাহাবাদ ম্যুর সেন্ট্রাল কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। তাঁর গবেষণা-জীবনের প্রথম কাজ 'ইনডিউসড অ্যান্ড ফটো-কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন'। শেষ জীবনেও তিনি নাইট্রোজেন ফিকশন নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। তাঁর মৌলিক গবেষণাপত্রের সংখ্যা ছয় শতাধিক। ভৌত রসায়ন ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৩৮, ১৯৪৭ ও ১৯৫২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার কমিটিতে বিচারক ছিলেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ টাকা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামে অধ্যাপক পদ ও ১ লক্ষ টাকা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামে লেকচারার পদ সৃষ্টির জন্য দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনকে ১ লক্ষ টাকা এবং ৭ বছরের সম্পূর্ণ বেতন তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে গুরু প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বদেশহিতব্রতের প্রেরণায় দেশীয় প্রথায় চাষ এবং সার হিসাবে গুড়ের ব্যবহারে বহু নতুন পথ আবিষ্কার করে ভারতের কৃষি গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মানে উত্তীর্ণ করেন এই দেশব্রতী বিজ্ঞানী।

ঠাকুর পরিবারের বিজ্ঞানচর্চা :

বাঙালির বিজ্ঞানভাবনা ও বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) বিষয় বিজ্ঞান না হলেও সমাজসংস্কারক হিসেবে অপর বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। রামমোহন রায়ের আধুনিক চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত দ্বারকানাথ ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন, সতীদাহ প্রথা নিবারণে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেন। হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। প্রমথনাথ মল্লিক রচিত 'কলিকাতার কথা'

গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে রয়েছে — 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতা - ইংলিশমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং আগামী তিন বৎসর পর্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে ওই বিদ্যালয়ের যে ছাত্রেরা উত্তমরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে ওই টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।'

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শব-ব্যবচ্ছেদ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন। কলকাতায় ফিবার হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হলে তিনি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'ফিবার হসপিটাল অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল এনকোয়ারি কমিটি'র অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রিয় বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর ভাইবোনেরাও দেবেন্দ্রনাথের কাছে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিতৃদেব সম্পর্কে আমার জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন 'তাঁহার তেতলার বসিবার ঘরে দিনকতক তিনি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে ধারাবাহিকভাবে মৌখিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।' (প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮ পৃঃ ৩৮৭)। অজিতকুমার চক্রবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সুগভীর চিন্তাকে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, 'জ্যোতির্বিদ্যাদি বিজ্ঞানে ভগবানের মহিমা ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত আছে বলিয়া তিনি একজন বিজ্ঞানপিপাসু ছিলেন।' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক এবং তা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতারই ফসল। স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ 'পৃথিবী'তেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভাব গভীরভাবে লক্ষ করা যায়। জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়া ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব বিষয়েও দেবেন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ ও অধিকার ছিল। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) গণিতশাস্ত্রে বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেন। তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতি নিয়ে আধুনিক চিন্তাভাবনা করেন। নিজে বিজ্ঞানচর্চা করার পাশাপাশি তিনি দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথের মতো বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহও দিয়েছেন। মহেন্দ্রলাল সরকার ইন্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলে তিনি অর্থসাহায্য করেন। রবীন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম' তাঁর লেখা একটি অনন্য গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফ্রেনোলজি বা শিরোমিতিবিদ্যার চর্চা করতেন। করোটির বহির্ভাগের গঠন দেখে মানুষ চেনা হলো এই বিদ্যার বিষয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) রচিত প্রবন্ধের বহুলাংশই বিজ্ঞানবিষয়ক, যার পরিচয় তাঁর ' পৃথিবী' শীর্ষক গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত বালক, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের লেখাগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে ঠাকুর পরিবারের মানুষজন বিজ্ঞানচর্চায় কতটা তৎপর ও উৎসাহী ছিলেন।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানপাঠ ও অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা চলেছিল সমানভাবে। পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল রচনা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তার মধ্যে রয়েছে বহুবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক রচনা, বিজ্ঞান-নিবন্ধের সমালোচনা এবং বিজ্ঞান গ্রন্থের ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে তাঁর অপার বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালির ক্রীড়াসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাঙালির নিজস্ব ক্রীড়াশৈলীর প্রকৃত রূপ আজ খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ পাল যুগের পরবর্তী মহামারি ও মন্বন্তর ছাড়াও হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষ, তুর্কি বিজয় এবং ইংরেজ উপনিবেশ সামগ্রিকভাবে বাঙালির ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় হাজার বছরের বিচ্ছেদ রচনা করেছে। ক্রীড়া বেঁচে থাকে প্রতিদিনের অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিতে। নৈমিত্তিক অভ্যাস ব্যাহত হলে ক্রীড়াসংস্কৃতিতে বিকার আসাটাই স্বাভাবিক। বাঙালির ইতিহাসের সূত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেই আজ তার নিজস্ব ক্রীড়া-সংস্কৃতির আদিপর্ব আর স্বাভাবিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ মাঠে ময়দানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাকে খুঁজতে হবে সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্বের সূত্র প্রয়োগ করে, খুঁজতে হবে বিলুপ্ত ঐতিহ্যের অবশেষের রেশ থেকে যাওয়া লোক উৎসবে, আচার অনুষ্ঠানের প্রতীকের অন্তর্গত অর্থ বিকলন করে।

বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) গ্রন্থে নীহার রঞ্জন রায় মূলত সাহিত্যের সূত্র ব্যবহার করে বাঙালির আদি ক্রীড়াসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন :

'রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা মৃগয়া। আর, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কৌমদের শিকারই ছিল প্রধান উপজীব্য ও বিহার। ইঁহাদের কিছু কিছু শিকার-চিত্র পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে দেখা যায়। এই ফলকগুলিতেই দেখিতেছি, কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকারের দুঃসাধ্য শারীর-ক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির লোকদের অন্যতম বিহার। *পবনদূতে* নারীদের জলক্রীড়া এবং উদ্যানরচনার উল্লেখ আছে; এই দুইটিই বোধ হয় ছিল তাঁহাদের প্রধান শারীর-ক্রিয়া। দ্যূত বা পাশাখেলা এবং দাবা খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি। পাশা খেলাটা তো বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। দাবা খেলার প্রচলন যে বাংলাদেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন; তবে চর্যাগীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ 'রাজা'), 'মন্ত্রী', 'গজবর' এবং 'বড়ে', এই চারিটি গুটি, খেলার 'দান' এবং ছকের চৌষট্টি কোঠার বা ঘরের উল্লেখ এমন সহজভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেলা বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল।'

লোকসাহিত্য লোকমানসের সৃষ্টি। তাই স্বাভাবিক কারণেই আবহমান পল্লিবাংলার প্রবহমান উৎসব-পার্বণাদির একটি স্পষ্ট চিত্র আমরা লোকসাহিত্যে পাই। এসব উৎসব-অনুষ্ঠান স্বাভাবিক কারণেই অঞ্চলবিশেষে আবার নতুন রূপ লাভ করে। আজ থেকে কয়েক যুগ পূর্বে আমোদ স্ফূর্তি ও মুক্ত জীবন মানুষকে যথেষ্ট আনন্দ দিত। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন এসব খেলা তখনও আসেনি। তখন ছিল হা-ডু-ডু, ডাংগুলি, কুস্তি, শরীরচর্চা প্রভৃতি দেশীয় খেলা। যে সমস্ত খেলা প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে গরু-মহিষ লড়াই, দড়িখেলা, জোড়-বিজোড় খেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সেকালের মহরম উৎসব এক বিরাট সমারোহ কাণ্ড এবং চিত্ত-উন্মাদক বিষয় ছিল। মহরমের সে অসাধারণ আড়ম্বর, জাঁকজমক, ক্রীড়াকৌশল, লাঠি ও তলোয়ার খেলা, বাদ্যোদ্যম এবং যাবতীয় নরনারীর মাতোয়ারা ভাবের উচ্ছ্বাস, বিরাট মিছিল, মর্সিয়া পাঠ, শোকপ্রকাশ, দানখয়রাৎ, মহরমের দশদিন ব্যাপী সাত্ত্বিক ভাব বর্তমানে কল্পনা ও অনুমানের বিষয়।

সেই প্রাচীনকাল থেকে বিনোদনের অংশ হিসেবে বাঙালি চর্চা করে আসছে লোকক্রীড়া। কত রকম ক্রীড়াচর্চা যে বাঙালি করেছে, তার কোনো হিসাব নেই। মাথা খাটিয়ে বের করেছে সহজ-সরল ও স্বল্প ব্যয়ের নানারকম খেলা। নৌকাবাইচ, বউছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, গোলাপ-টগর, চিক্কা, ডাংগুলি, যোলোঘুঁটি, এক্কাদোক্কা, বউরানি, কড়িখেলা, ঘুঁটিখেলা, কানামাছি, ঘুড়ি ওড়ানো, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, এলাটিং বেলাটিং, বাঘবন্দি, রুমাল চুরি, লাঠিখেলা, লুকোচুরি, সাতখোলা, হা-ডু-ডু ইত্যাদি বাঙালির আমোদ-প্রমোদ, অবসরযাপনের অংশ হয়ে আছে।

বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য দেশি খেলাগুলির মধ্যে রয়েছে কুমির-কুমির, হরি-হরি, ঝিঙ্গো ফুল কাঁকুড় কাঁকুড়, লোফালুফি ঝাল-ঝাপটা, ফুঁ-দেয়া-দেয়ি, হনু-হনু, ছাগল-পাগল, নুড়ো ছোঁড়াছুঁড়ি, সাঁকো ডিঙ্গাডিঙ্গি, খুদ মাগবি, গাদাগাদি, হাঁস হাঁস, ডাব ডুবা, পায়রা গুন গুন, ডাং, বাঁশি চোর, কুমুরিয়া, উঠা-বসা, চোর-ধরাধরি, গাছ বাঘ, লোন্তা, সূচ-চলা, নৌডুবি, লবণ মাপানি, হাইড্ল ডুল, বুদ্ধিমন্ত, আখ ভাঙ্গাভাঙ্গি, ঝাপ-ঝুল্‌টি, গিলা, ব্যাং ডিঙানি, পিপীলিকার সার, গঙ্গা পারাপারি, ঠ্যাং লাঠি, ছি পাত্বা, খেটে খেলা, ভেটা মারি, ডান্ডাগুলি, খো খো, ছি বুড়ি, হান্তাই, বট চিক প্রভৃতি। দৈহিক কসরতের বৈচিত্র্যপূর্ণ দিকগুলি এই খেলাগুলিতে ফুটে ওঠে। বহু খেলাতেই নাচ, গান, ছন্দ ও ছড়া ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সর্বোপরি এই খেলাগুলিতে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় সামাজিক সংহতিব্যঞ্জক আদর্শ ও মূল্যবোধ। আধুনিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার প্রতি অতিরিক্ত উৎসাহের কারণে মানুষ আর গ্রামীণ খেলাধুলোর সাংস্কৃতিক দিকগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে চায় না। তাই ক্রমশ অনেক গ্রামীণ পুরোনো খেলাই হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে। অথচ শারীরিক সক্ষমতা গড়ে তোলায়, মনে একতার ভাবসৃষ্টিতে, শিশুর সামাজিকীকরণে, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায়, সাহস ও সহিষ্ণুতা সঞ্চারে দেশীয় খেলাধুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া আঞ্চলিক বিভিন্ন খেলার মধ্যে রয়েছে আড়াদি-মোড়াদি খেলা, ইকির মিকির, ইচিং বিচিং, উদ মাছ, কাজলপাতি, কাছিটানা, কান-ফুসফুসানি, বেগুনচোর, কুকুর-শকুনি, খই-দই, খন্‌তা-খুন্‌তি দে-না, সীতারামের খেলা, গাদি খেলা, গরম মুড়ি, গামরা খেলা, গোলকধাম, চাঁই-কানা, চোর-চৌকিদার, ছাগল-চরানি, ড্যাং কলুই, জেলে মাছ, ডাং-গুলি প্রভৃতি। ঔপনিবেশিক বাংলায় মূলত ইংরেজদের হাত ধরেই নানান বিদেশি, অর্থকরী, উপাদানবহুল, ব্যয়সাপেক্ষ খেলাধুলোর আবির্ভাব ঘটে।

উনিশ শতকের বাংলা, জ্যোতিষ্কের শতক। রামমোহন রায়সহ বহু মনীষীর প্রেরণায় বাঙালি সংকীর্ণতা ছেড়ে সংস্কারমুক্ত হল। তারপর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মহামনীষীর প্রদর্শিত পথে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আবেগ বিকশিত হতে থাকল। চৈত্রমেলা, হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা সেই মহত্তর মুক্তিপথের এক মাইল ফলক।

১২৮০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে *মধ্যস্থ* পত্রিকার সম্পাদক মনোমোহন বসু তাঁর পত্রিকায় লেখেন : ‘যখন দেখিব, দুর্গোৎসবের ন্যায় সমস্ত বঙ্গদেশ (ছোট বড় সকলেই) এই আমোদে মাতিয়াছেন, যখন দেখিব, নানা দিগ্ হইতে কারুগণ, শিল্পীগণ, চিত্রকরগণ, উদ্যান ও ক্ষেত্রপালগণ, গুণীগণ, কবিগণ, বাগ্মীগণ, ভূস্বামীগণ, ছাত্রগণ, সকল শ্রেণির লোক আপনা হইতে আসিয়া মিলিত হইবে—যাহার যে বিদ্যা সাধ্যগুণ প্রদর্শন করিতেছে, যখন দেখিব, এই মেলার পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠাকে গ্রীক ওলিম্পিক গেমের প্রদত্ত লরেল মুকুট অপেক্ষাও লোকে আদর করিতেছে, তখনই আমাদের উচ্চ আশা সিদ্ধ হইল জানিব!’

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগী ও পরবর্তীকালে বাঘাযতীন ও অরবিন্দের গুরুস্থানীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ধর্মসম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে বৃহত্তর ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হিন্দু- মেলার নাম বদলে ভারতমেলা রাখার প্রস্তাব করেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে লাঠিখেলা ও ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন সম্পর্কে মেলার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : ‘মেলায় এদেশীয় মল্লদিগের কৌশল প্রদর্শিত হয়। এই মল্লেরা যে সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগেরই সৃষ্টি, এই নিমিত্ত আমরা অন্য কাহারও নিকট ঋণী নহি।’

এভাবেই জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে বাঙালি তার নিজস্ব ক্রীড়া ঐতিহ্যে ফিরে যাবার ব্রত গ্রহণ করে।

১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ঠাকুর পরিবারের সহযোগিতায় কলকাতায় প্রথম হিন্দুমেলা আয়োজিত হয়েছিল। এই মেলার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল দেশীয় শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ দান। হিন্দুমেলা কলকাতার বাঙালি সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনটি নির্দেশ করে। প্রথম দিকের হিন্দুমেলা উদ্‌বোধিত হতো চৈত্র সংক্রান্তির দিন। এই উপলক্ষ্যে দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান লেখা হত। বাঙালি ও পাঞ্জাবি ছাত্রদের মধ্যে কুস্তি প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হত।

কুস্তি : ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মেসোপটেমিয়ায় ৫০০০ বছর আগেকার এক পাথর খোদাই করা কুস্তির ছবি আবিষ্কার করেন। বাগদাদের কাছে কায়াকজি মন্দির থেকে এই পাথরটি পাওয়া যায়। মনে করা হয়, ভারত থেকে রোম এবং গ্রিসে কুস্তির প্রচার হয়েছিল। ক্রমশ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে কুস্তি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর জাপানে কুস্তির চর্চা শুরু হয় এবং কুস্তিকে জাপানের জাতীয় খেলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ভারতবর্ষে মহাভারতের যুগের পর শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেন সোরাব এবং রুস্তম। এই রুস্তমের নামানুসরণে পরবর্তীকালে 'রুস্তম-ই-হিন্দ' উপাধির প্রচলন ঘটে।

আধুনিককালে ভারতে কুস্তির চর্চা শুরু হয় বরোদায়। বরোদার খান্ডেরাম মহারাজ নিজে একজন বড়ো পালোয়ান হওয়ায় কুস্তির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। এছাড়াও আলোয়ার, মথুরা, যোধপুর, ইন্দোর, কোলাপুর প্রভৃতি স্থানে কুস্তিচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। পেশাদারি কুস্তি প্রতিযোগিতার স্থান ক্রমশ দখল করে নেয় শৌখিন কুস্তিগির ও শৌখিন কুস্তি প্রতিযোগিতা। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলায় ও ভারতে শৌখিন কুস্তি প্রতিযোগিতা প্রচলিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন বা রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া গড়ে ওঠে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বেসরকারি আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ভারত ও জাপানের মধ্যে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে বুখারেস্টে যে বিশ্ব যুবসম্মেলন হয়েছিল, সেখানে ভারতীয় কুস্তিগীরদের একটি দল পাঠানো হয়, যাতে ছিলেন কে ডি যাদব, সূর্যবংশী এবং শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়।

বাংলায় কুস্তির প্রচলন ও প্রসারে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং মুরশিদাবাদের নবাব প্রভূত সাহায্য করেন। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় ১৮৯২-৯৪ এর মধ্যে ভারতে প্রথম বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। করিম বক্স ও টম ক্যাননের মধ্যে এই লড়াইয়ে জিতে করিম বক্স বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। মুরশিদাবাদের নবাব আয়োজিত রহিম পালোয়ান ও বালিওয়ালা গামুর লড়াইতে গামু জয়লাভ করেন। বাংলায় কুস্তি প্রবর্তনের ইতিহাসে অম্বিকাচরণ গুহ, জানবাজারের রাজা, ঝামাপুকুরের মিত্রবাড়ী, পাইকপাড়ার জমিদার এবং ঝাড়গ্রামের রাজার চেষ্টা স্মরণীয় হয়ে আছে। গোবরবাবু বা যতীন্দ্রচরণ গুহ, তাঁর জ্যাঠামশাই ক্ষেত্রচরণ গুহ ও পিতা রামচরণ গুহের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে পরে রহমানি ও কাল্লু পালোয়ানের শিষ্যত্ব নেন এবং কালক্রমে আন্তর্জাতিক সম্মান ও পরিচিতি লাভ করেন।

রামায়ণ-মহাভারতে কুস্তির কাহিনি পরিকীর্ণ হয়ে আছে। ভীম, দুর্যোধন, কৃষ্ণ, বলরাম, সুগ্রীব, বালী, হনুমান, কংস, রাবণ, জরাসন্ধ সকলেই ছিলেন মল্লযুদ্ধে পারদর্শী। গোবর গুহ, গামা পালোয়ান, দারা সিং, কিক্কর সিং, টাইগার জিৎ সিং, রাজীব তমার, ইমাম বক্স পালোয়ান, দাদু চৌঘল, হামিদা পালোয়ান, শামসের সিং, বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়, মিস্টার ইউনিভার্স মনোহর আইচ, মানিক গুহ, ভীম সিং পালোয়ান, নাথমল পারেখ, সুশীলকুমার — দেহসৌষ্ঠব কিংবা মল্লক্রীড়া বা কুস্তিতে ভারতীয় তথা বাংলার অংশগ্রহণ ও অবদান কম নয়। একসময় সারা ভারতে তথা বাংলায় কুস্তি ছিল 'বাবু' সংস্কৃতির আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের অংশ। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নানা আখড়ায় গিয়ে শরীরচর্চা করতেন—এ তথ্য ইতিহাসসমর্থিত। পুরোনো কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটার দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাড়ির সামনের দালানেও চলত বালিকাদের মল্লযুদ্ধ। হেদুয়ার কাছে সিমলেপাড়ায় সিমলে ব্যায়াম সমিতিসহ বেশ কয়েকটি কুস্তির আখড়া গড়ে উঠেছিল সেই সময়ে। রাজা বৈদ্যনাথ রায় আর জমিদার শ্রীনাথবাবুর আখড়ায় চলত অবিরাম কুস্তির কসরত। দল বেঁধে সেই কসরত দেখতে মানুষের উৎসাহের অন্ত ছিল না। কলকাতা শহরের কুস্তির ইতিহাসে আলোকোজ্জ্বল নামগুলি হল শ্যামাকান্ত নন্দী, স্যান্ডো প্রমুখ। শ্যামাকান্ত ছিলেন প্রসিদ্ধ ভারোত্তোলক, আর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরি থেকে কলকাতায় পা রাখেন ইউজিন স্যান্ডো। শুধু কলকাতাতেই নয়, সুদূর বেনারসেও বসত কুস্তির আন্তর্জাতিক আসর। দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানেও মল্লযুদ্ধ অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলারূপে পরিগণিত। এখনও নিমতলা ঘাটের পর বাবুঘাট পর্যন্ত যে কটি ঘাট রয়েছে সেখানে ভোরের দিকে গেলে কুস্তির নিবিড় অনুশীলন চোখে পড়বে।

শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীব্যাপী কুস্তির প্রসারের ইতিহাস বিবৃত রয়েছে নানান সাহিত্যে, মহাকাব্যে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ বা এয়োদশ শতকে রচিত 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'তে হোমার গ্রিকদের মল্লযুদ্ধের প্রসঙ্গ এনেছেন। এমনকি শোনা যায়, গৌতম বুদ্ধও নাকি যৌবনে মল্লযুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মধ্যযুগে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপানে কুস্তিচর্চা হতো। চিনে সুয়াই জিয়াও নামে প্রচলিত মল্লযুদ্ধ ৪ হাজার বছরের পুরোনো বলে মনে করা হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি এথেন্সের অলিম্পিকে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।

ভারতীয় কুস্তিকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের সঙ্গো তুলে ধরা তথা বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যে এই খেলাকে জনপ্রিয় করার প্রধান দাবিদার **যতীন্দ্রচরণ গুহ** ওরফে **গোবর গুহ** ১৮৯২ সালের ১৩ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন এক কুস্তিগির বংশের সন্তান। কলকাতার এই গুহ পরিবার ছিল শরীরচর্চা ও শরীরচর্চার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত। তাঁর পিতামহ অম্বিকাচরণ গুহ বা অম্বুবাবু ছিলেন বঙ্গো আখড়া সংস্কৃতির প্রচলনের পথিকৃৎ। তিনি প্রাথমিকভাবে তাঁর পিতামহের কাছে অনুশীলন শুরু করলেও পরবর্তীকালে তাঁদেরই আখড়ায় কর্মরত নামকরা কুস্তিগির খোলসা চৌবে ও রহমানি পালোয়ানের নিকট কঠোর অনুশীলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই গোবর গুহই ১৯২১ সালে প্রথম এশীয় ব্যক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্ব লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। ১৯১০ সালের লন্ডনের জন বুল সোসাইটির আয়োজিত কুস্তির এক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ ভারতের হয়ে মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। তাঁর সঙ্গো অবশ্য গামা পালোয়ানও ছিলেন। সেইবারের ইয়োরোপ যাত্রাকালে তিনি ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও ইতালিতে বিভিন্ন কুস্তিগিরদের সঙ্গো লড়েন। ১৯১২ সালের দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ যাত্রাকালে তিনি প্যারিসে একটি কুস্তি প্রতিযোগিতায় বিশ্বের প্রথম কৃয়াঞ্জা হেভিওয়েট বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে লড়েন। প্রথম এশীয় হিসেবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের খেতাব পান। ১৯২৯ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে গোবর এবং ছোটো গামার মধ্যে এক স্মরণীয় লড়াই হয়। লড়াইয়ে দুই কুস্তিগিরই ভারতীয় কুস্তির সমস্ত কৌশল প্রদর্শন করেন। লড়াই অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও টেকনিক্যাল কারণে ছোটো গামাকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি পেশাদার কুস্তি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় কুস্তির রীতিতে বহু নতুন প্যাঁচের উদ্ভাবন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত ধোঁকা, টিব্বি, গাধানেট, ঢাক, টাং, পাট, ধোবা পাট, কুল্লা ইত্যাদি ভারতীয় কুস্তিরীতিতে সংযোজিত হয়। তাঁর সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি হলো রদ্দা।

১৮৮৩ সালে কলকাতা শহরে **ফণীন্দ্রকৃয় গুপ্তের** জন্ম হয়। পিতা গোঁসাইদাস গুপ্ত। বাংলার খ্যাতনামা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর মাতামহ ছিলেন। হুগলি জেলার বালিতে তাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল। ফণীন্দ্রকৃয় স্কুলের পড়া শেষ করে মেট্রোপলিটান কলেজে কিছুকাল পড়েন। তারপর সেখান থেকে সেন্ট্রাল কলেজে ভরতি হন। কলেজের সাধারণ শিক্ষা শেষ করে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯০৮ সালে ডাক্তারি পরীক্ষা পাশ করেন। শরীর ভালো রাখার জন্য তিনি অম্বুবাবুর আখড়ায় ভরতি হন। সাত বছর তিনি অম্বুবাবুর আখড়ায় কুস্তি লড়েন। প্রত্যেকদিন ভোরে কুস্তি লড়তেন এবং বিকেলবেলা ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করতেন। অম্বুবাবুর মৃত্যুর পর ফণীন্দ্রকৃয় নিজের বাড়ির কাছে একটা আখড়া খোলেন। এখানে তিনি বাঙালি ও পশ্চিমদেশীয় যুবকদের কুস্তি শেখাতেন। প্রায় ৯ বছর তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে কাজ করে অবসর নেন। তিনি ব্যায়াম শিক্ষার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসা করে অনেক কঠিন রোগীরও আরোগ্য করেছেন। ১৯২৩-২৪ সালে কলকাতার এক প্রদর্শনীতে যে নিখিল ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতা (All India Championship of Wrestling Tournament) হয়, তাতে ফণীন্দ্রকৃয় ও মুরশিদাবাদের নবাবসাহেব মধ্যস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শরীরচর্চার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। লৌহমানব নীলমণি দাশ তাঁর ছাত্র। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সহোদর জিতেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর অন্যতম সহযোগী রাখালচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও অন্যান্য নব্য বাঙালি যুবকদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে কুস্তি বাঙালির নবলব্ধ জাতীয় ভাবের অন্যতম অঙ্গা হয়ে ওঠে।

ফুটবল : উনিশ শতক থেকে বাংলার নবজাগরণের যে রূপ তার সমাজ, সাহিত্য, চিত্রকলার মতো বিবিধ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল, ক্রমশ তা বাংলার খেলার মাঠগুলিকেও স্পর্শ করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় ফুটবল ও ক্রিকেটের মতো আধুনিক খেলার প্রবর্তন ও প্রসারের মাধ্যমে বাংলায় আধুনিক ক্রীড়াসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সূত্রপাত ঘটে।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে ফুটবল খেলার প্রবর্তন হয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী দ্বারা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে গঙ্গার ঘাটে নোঙর করা দুটো বিলেতি জাহাজে করেই এসেছিল 'ফুটবল' নামের এই আজব খেলা। একদিন সকালবেলার সোনারোদে ছড়িয়ে পড়া এক পুরোনো কেল্লার মাঠে জাহাজ থেকে ফুটবল নিয়ে নামল বিলেতি নাবিকরা। তারা যখন ফুটবল খেলছিল তখন কেল্লার সৈনিকদের চোখ তো ছানাবড়া। এ আবার কি খেলা রে বাবা! তারা নাবিকদের খেলা দেখতে লাগল অবাক চোখে এবং একসময় নিজেরাও যোগ দিল নাবিকদের সঙ্গে। লাথি মারল ফুটবলের গায়ে। উপমহাদেশে এই হল কালজয়ী ফুটবলের গোড়াপত্তন। এটা হল লোকমুখে চলে আসা একটা অলিখিত ইতিহাস। কাগজেকলমে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে নথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, এসপ্লানেড ময়দানে ১৮৫৪ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটিতে কলকাতার শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন ব্যারাকপুরের ইংরেজ সাহেবরা। এ খেলায় অংশ নেওয়া দল দুটির একটির নাম ছিল 'সিভিলিয়ানস অফ ক্যালকাটা' আর অপরটি 'জেন্টলমেন অফ ব্যারাকপুর'। এরপর আবার ফুটবলের সাক্ষাৎ মেলে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর। বলা যায়, এখান থেকেই উপমহাদেশে ফুটবলের জয়যাত্রা শুরু হয়।

১৮৬৮ সালে এসপ্লানেড ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রীতিম্যাচ। এতে 'আই সি এস'-দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিদ্যালয় ইটনের সাবেক ছাত্রদের নিয়ে গঠিত 'ইটোনিয়ান ক্লাব'। এ খেলায় ইটোনিয়ান ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। দুবছর বন্ধ থাকার পর ১৮৭০ সালে আবার ফুটবল খেলা শুরু হল এসপ্লানেড মাঠে।

১৮৭২ সালে বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল ক্লাব স্থাপিত হয়। এই ক্লাবটি হল 'ক্যালকাটা এফ্ সি'। এরপর ধীরে ধীরে ট্রেডস ক্লাব, ডালহৌসি ক্লাব, ন্যাভাল ভল্যানটিয়ার্স ক্লাব প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ক্লাবগুলি স্থাপিত হয়।

ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে **নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী** এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৭ সালে কোনো এক শীতের ভোরে বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর মায়ের সঙ্গে গড়ের মাঠ দিয়ে গঙ্গা পাড়ে গিয়েছিলেন। দৈবাৎ তাঁদের ঘোড়ার গাড়ির সামনে একটি চামড়ার গোলাকার বস্তু আসে। নগেন্দ্রপ্রসাদ সেই গোলাকার বস্তুটিকে সজোরে লাথি মেরে ইংরেজ খেলোয়াড়দের কাছে ফেরত পাঠান। তাঁর সেই শট মারাকে ভারতীয় ফুটবলের সূচনা বলে মনে করা হয়।

হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় থেকে নগেন্দ্রপ্রসাদ ফুটবল খেলা শুরু করেন। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজেও একটি ফুটবল দল গড়ে তোলেন। নগেন্দ্রপ্রসাদ নিজে খেলতেন সেন্টার ফরোয়ার্ডে। এর কিছুদিন পরে নগেন্দ্রপ্রসাদের অনলস প্রচেষ্টায় ফ্রেন্ডস ক্লাব, ওয়েলিংটন ক্লাব, বয়েজ ক্লাব ও প্রেসিডেন্সি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে শোভাবাজার ক্লাব। নগেন্দ্রপ্রসাদের উদ্যোগে জেলায় জেলায় ফুটবল খেলার প্রসার হয়। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়েছিলেন। শোভাবাজার ক্লাব নগেন্দ্রপ্রসাদের প্রচেষ্টায় ট্রেডস কাপে অংশ নেয় এবং ইস্টশায়ারের মতো সামরিক দলকে পরাজিত করে। ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শিল্ড প্রতিযোগিতা শুরু হলে প্রথম যে ক্লাবটি অংশগ্রহণ করার অধিকার পায়, সেটি নগেন্দ্রপ্রসাদের শোভাবাজার ক্লাব। নির্লোভ এই মানুষটি কোনোদিন ক্ষমতা চাননি, খ্যাতি চাননি। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি শুধু দেশের ফুটবলের সেবা করে গেছেন। আজ ফুটবল বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। কিন্তু ফুটবলের প্রসারে ও উন্নয়নে নগেন্দ্রপ্রসাদের অবদানের কথা ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঙালিদের মধ্যে ফুটবলে প্রথম পা ছোঁয়ানোর কৃতিত্ব নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর। ফুটবল বাঙালির খেলা, বাঙালিদের হাত ধরেই এশিয়ায় ফুটবলের প্রচলন হয়েছে। পৃথিবীতে ফুটবল যেমন ব্রাজিলের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তেমনি প্রথম বাঙালি হিসাবে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ব্রিটিশদের কাছ থেকে নিয়ে এশিয়ায় ফুটবলের প্রচলন করেন। তাঁর বলে পা ছোঁয়ানোয় যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগল পরাধীন জাতির ক্রীড়াজীবনে। কলকাতার মাঠে বাঙালির ফুটবল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাথমিক

কাজটা হয়ে গেল। পরবর্তীকালে বাঙালিদের ফুটবলে দীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা আছে। তাঁর চেষ্টায় বিভিন্ন শ্রমজীবী শ্রেণির যুবকেরা অভিজাত ঘরের ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে শরীরচর্চা করার সুযোগ পান। এই নিয়ে ওয়েলিংটন ক্লাবে আপত্তি ওঠায় তিনি ক্লাব ভেঙে দেন। তাঁর প্রচেষ্টাতে ক্রিকেটে হ্যারিসন শিল্ড প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল এবং সাহেবদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ক্লাবে দেশীয়দের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার রাস্তা খুলে গিয়েছিল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয়দের নিয়ে কলকাতায় বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আইএফএ শিল্ড গঠনে উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র ভারতীয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে শোভাবাজার ক্লাব সমস্ত ইউরোপীয় ক্লাবকে পরাজিত করে ট্রেডস কাপ জয় করে। ১৮৭৭ থেকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ অবধি তিনি ৭০০-র বেশি ম্যাচ খেলেছিলেন।

ক্রিকেটে তিনি প্রথম ভারতীয় বোলার যিনি ইংরেজদের সঙ্গে খেলায় ওভারহেড বোলিং করতে পারতেন। বাঙালি যুবকদের নিয়ে রাগবি দল তিনিই প্রথম তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এক দুর্ঘটনার কারণে তিনি ক্লাব থেকে রাগবি খেলা উঠিয়ে দেন।

নগেন্দ্রপ্রসাদ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবে হকি এবং টেনিস খেলার সূচনা করেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তৎকালীন বাঙালি ফুটবলাররা খালি পায়ে খেললেও তিনি বুট পরে খেলতেন। তিনি বিদেশি খেলার প্রবর্তক হলেও বিভিন্ন দেশীয় খেলাতেও উৎসাহী ছিলেন। দর্শক ও খেলোয়াড়দের কাছে তিনি হুজুর বলে পরিচিত ছিলেন।

ফুটবলে বাংলার বিভিন্ন ক্লাব : ১৮৮৫-৮৬ সালে গড়ে উঠতে থাকে বাঙালিদের ফুটবল ক্লাব। ১৮৮৬ সালে শোভাবাজার রাজপরিবারের উদ্যোগে গঠিত হয় 'শোভাবাজার ক্লাব' যা প্রথম বাঙালি ক্লাব হিসেবে স্বীকৃত। এরপর জন্ম নেয় 'কুমারটুলি ক্লাব'। কলেজ ছাত্রদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'ওয়েলিংটন ক্লাব'। পরে এই ক্লাবের সদস্যদের একটা অংশ অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে বিভক্ত হয়ে গড়ে তোলে 'টাউন ক্লাব'। এ সময় দক্ষিণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল ক্লাব'।

দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলের রং ছড়িয়ে পড়তে লাগল উপমহাদেশের মানুষের অন্তরে। ফুটবল খেলতে নেমে অন্যরকম একটা আনন্দ আর মজা পাওয়ার কারণে খেলাটির জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। ঘটতে থাকে এর প্রসার। আর কলকাতায় ফুটবলের প্রসারে আরও বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠে ইংরেজ বণিকরা।

১৮৮৯-এ গঠিত হয় মোহনবাগান ক্লাব এবং ১৮৯২-এ জন্ম নেয় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ১৮৯৩ সালে গঠন করা হয় ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ)। এই সংস্থা গঠনের জন্য যে বৈঠক হয়, তাতে বাঙালিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শোভাবাজার ক্লাবের নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। সে বছরই শোভাবাজার ক্লাবের উদ্যোগে প্রবর্তন করা হয় আইএফএ শিল্ড ফুটবল। আইএফএ শিল্ডের সাফল্যে, ১৮৯৮ সালে শুরু হয় কলকাতা ফুটবল লিগ। আধুনিক ফুটবলের সূতিকাগার ইংল্যান্ড। ফুটবলে তাদের চেয়ে বাঙালিরা মোটেও পিছিয়ে ছিল না। ১৮৭১ সালে ইংল্যান্ডের প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা এফএ কাপ এবং ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ডে ফুটবল লিগ শুরু হয়। তার সঙ্গে আইএফএ শিল্ড এবং কলকাতা ফুটবল লিগের ব্যবধান খুব বেশি নয়। মোহনবাগান ক্লাব ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জয় করে। এটা ছিল বাঙালির ফুটবল ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিজয় নিছক ফুটবল মাঠের একটি সাফল্য ছিল না। মোহনবাগান ক্লাবের ওই জয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বাঙালির নৈতিক জয়। এই জয় ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। মোহনবাগানের অসাধারণ এই কৃতিত্ব ফুটবল জগৎকে উজ্জীবিত করে তোলে।

১৯১১ সাল থেকে পূর্ববাংলার ফুটবল খেলোয়াড়দের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯২০ সালে কলকাতায় জন্ম নেয় 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব'। সে সময় এই ক্লাবের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই আসতেন পূর্ববাংলা থেকে।

বাংলার হয়ে খেলেছেন এমন কয়েকজন স্বনামধন্য ফুটবলার : গোলরক্ষক — পিটার থঙ্গরাজ, প্রদ্যোৎ বর্মণ, তরুণ বোস, ভাস্কর গাঙ্গুলি, শিবাজী ব্যানার্জি, অতনু ভট্টাচার্য, দেবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

রক্ষণ — গোষ্ঠ পাল, শৈলেন মান্না, চন্দ্রশেখর, জার্নেল সিং, ত্রিলোক সিং, অরুণ ঘোষ, আফজল, সুব্রত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অলোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

মাঝমাঠ — রাম বাহাদুর, প্রশান্ত সিংহ, বাঘা সোম, অসীম সোম, তাপস সোম, দুখীরাম মজুমদার, মুরারী শূর, অচ্যুৎ ব্যানার্জি, সুকুমার সমাজপতি, সুদীপ চ্যাটার্জি, প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সরকার, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সুধীর কর্মকার, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, কৃশানু দে, বিকাশ পাঁজি, প্রশান্ত ব্যানার্জি, সুভাষ ভৌমিক প্রমুখ।

আক্রমণ —চুনী গোস্বামী, পিকে ব্যানার্জি, তুলসীদাস বলরাম, এথিরাজ, ইউসুফ খান, অরুমাই, শ্যাম থাপা, শিশির ঘোষ, আকবর, হাবিব, সাবির আলি, ভাইচুং ভুটিয়া প্রমুখ।

প্রশিক্ষক : প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দত্ত, সৈয়দ নইমুদ্দিন, সুভাষ ভৌমিক, সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ক্রিকেট : যতদূর জানা যায় ইংল্যান্ডেই প্রথম ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছিল। মতান্তরে ফ্রান্সের 'কর্কেট' খেলা অথবা ইংল্যান্ডেরই প্রাচীন 'ক্লাববল' খেলা থেকে ক্রিকেট খেলার জন্ম হয়েছে। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংল্যান্ডে এই খেলা প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আধুনিক রূপে যেভাবে ক্রিকেট খেলতে দেখি সেই পদ্ধতির প্রচলন হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫-১৭ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাটিকে বিশ্বের প্রথম টেস্টম্যাচের মর্যাদা দেওয়া হয়। ভারতে ক্রিকেট খেলার শুরু ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সৈনিক বনাম ভারতে নিযুক্ত অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের খেলা দিয়ে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব, পরের বছর ক্যালকাটা টিমের সঙ্গে জেন্টলম্যান অফ ব্যারাকপুর অ্যান্ড দমদম টিমের খেলার মধ্য দিয়ে বাঙালিরাও ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবই ছিল একটা সময় বাংলা ক্রিকেটের ধাত্রীগৃহ, যেখানে খেলেছেন পঙ্কজ রায়, অম্বর রায় থেকে শুরু করে দিলীপ দোশি, সুব্রত গুহ প্রমুখ। খেলে গিয়েছেন প্রণব রায়, রাজা ভেঙ্কট, রণদেব বসুরা।

কোচবিহার রাজবংশ বহুমুখী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। শিকার, খেলাধুলো, ভাষাসাহিত্য চর্চা, ধর্মসংস্কার, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ছিল এই রাজবংশ। রাজকুমার হিতেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন প্রথম বাঙালি ক্রিকেটার যিনি ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে ১৯১১ ও ১৯১২-তে অংশ নিয়েছিলেন।

সারদারঞ্জন রায়চৌধুরী (১৮৫৯-১৯২৬) চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ। জন্ম তাঁর কিশোরগঞ্জের মশুয়া গ্রামে, বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারে। তিনি বাংলার ক্রিকেটের জনকরূপে পরিচিত। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের কারণে তাঁকে বলা হত বাঙালি ডব্লিউ জি গ্রেস (কিংবদন্তী ব্রিটিশ ক্রিকেটার)। সেসময় ক্রিকেট খেলত ইংরেজরাই। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী দল। রায়চৌধুরীরা পাঁচ ভাই মিলে গড়ে তুলেছিলেন ঢাকা কলেজ ক্রিকেট ক্লাব। পরে টাউন ক্লাবও গড়ে তোলেন কলকাতায় (১৮৮৪)। দুই দলেরই ক্যাপ্টেন সারদারঞ্জন। দুটি দলই নিয়মিত সাহেবদের দলের বিরুদ্ধে খেলত। বাংলায় জেলাভিত্তিক ক্রিকেট দল গড়ে তুলে তাঁরা আন্তঃজেলা টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে থাকেন। ক্রিকেটের নিয়মকানুন নিয়ে প্রথম বাংলা বই 'ক্রিকেট খেলা' লিখেছিলেন সারদারঞ্জনই।

ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের মতে, ঢাকায় ক্রিকেট জোরদার হয় 'ঢাকা কলেজ ক্লাব' গড়ে ওঠার পর। ছাত্র-শিক্ষকেরা মিলে এটা গঠন করেন আনুমানিক ১৮৮০-র দশকে । অখণ্ড বঙ্গের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব হিসেবে সেটা খ্যাতি অর্জন করে। ১৮৮৪ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সি ক্লাবের সঙ্গে এক খেলায় ঢাকা কলেজ জয়লাভ করে। নেতৃত্বে ছিলেন সারদারঞ্জন রায়চৌধুরী। 'যখন ছোট ছিলাম' বইয়ে সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন, 'ঠাকুরদার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাই ছাড়া সবাই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। সারদা ও মুক্তিদা হিন্দুধর্মে থেকে গেলেন। এই দুই ভাই খেলাধুলা করতেন। ক্রিকেট শুরু করেন সারদা, তারপর সেটা রায় পরিবারে হিন্দু-ব্রাহ্ম সব দিক ছড়িয়ে পড়ে।' তাঁর কথাটি যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নিজেদের নেশা পরিবারে আটকে না থেকে ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। সত্যজিৎ রায় বাংলা চলচ্চিত্রকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বস্তরে। আর সাহেবদের হাত থেকে বাংলায় ক্রিকেটযাত্রা শুরু করেন গণিতের অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়।

কয়েকজন সেরা বাঙালি ক্রিকেটার: এস এন ব্যানার্জি (শুঁটে) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন ডানহাতি ফাস্ট বোলার এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। অসাধারণ বোলিং প্রতিভার অধিকারী হয়েও ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে ভারতীয় দলের পক্ষে ইংল্যান্ড সফর করে একটি টেস্টও খেলার সুযোগ পাননি। ১৯৪৮-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে

শেষ টেস্ট খেলার সুযোগ পান এবং দুই ইনিংসে ১২৭ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট লাভ করেন। রনজি ট্রফিতে প্রথম খেলেন ১৯৩৫-৩৬ সালে বাংলার হয়ে মধ্যভারতের বিরুদ্ধে। ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৪১-৪২ সালে নবনগরের খেলোয়াড় ছিলেন।

রনজিতে তাঁর সেরা বোলিং মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৫ রানে ৮ উইকেট (১৯৪১ সালে, নবনগরের পক্ষে)। জীবনের সেরা ব্যাটিং ইংল্যান্ডে ১৯৪৬ সালে সারে দলের বিরুদ্ধে ১২১ রান। এ খেলার দশম উইকেটে সারভাতে ও শুঁটে ব্যানার্জি ২৪৯ রান করেছিলেন।

সি এস নাইডু ছিলেন ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মধ্যভারত তথা হোলকার, বরোদা, বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের হয়ে বিভিন্ন সময়ে রনজি ট্রফিতে খেলেন। **মন্টু ব্যানার্জি** ছিলেন ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রনজি ট্রফিতে প্রথম খেলেন। প্রথম জীবনে বিহারের পক্ষে খেললেও খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম পর্বে বাংলা দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় ছিলেন। জীবনে একটি মাত্র টেস্ট খেলেন ১৯৪৮ সালে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে, কলকাতায়। **নীরদচন্দ্র চৌধুরী** বাংলা দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রথম শ্রেণির খেলায় আসেন ১৯৪১-৪২ সালে। এই মিডিয়াম পেসার কিছুদিন বিহার দলেও খেলেন। একবার তিনি মার্চেন্ট, মুস্তাক ও অমরনাথকে পরপর তিন বলে আউট করে হ্যাটট্রিক করেন। ২টি টেস্ট ম্যাচে অংশ নেন। ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এবং ১৯৫১-য় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

পঙ্কজ রায় ছিলেন প্রখ্যাত বাঙালি ডানহাতি ব্যাটসম্যান। তিনি দীর্ঘদিন টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গো যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আসেন। সে খেলায় উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে অপরাজিত শতরান করে ক্রিকেটে তাঁর স্থায়ী আসন করে নেন। রনজি ট্রফির ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে শতরান করার গৌরব তাঁর প্রাপ্য। তিনি ২১টি শতরান করেন। দু-বার একই খেলার দু-ইনিংসে শতরান করেন। রনজিতে দুবার এক মরশুমে ছশোর বেশি রান করেন। ১৯৬২-৬৩ সালে গিলক্রিস্টের ভয়াবহ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে দুটি-শতরান তাঁর খেলোয়াড় জীবনের অন্যতম সেরা কৃতিত্ব।

১৯৫১-৫২ সালে তিনি প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ লাভ করেন। জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে তিনি শতরান করেন। পঞ্চম টেস্টে তাঁর শতরানের সুবাদে ভারত প্রথম ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেন। ১৯৫৫ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মানকড়-রায়ের প্রথম উইকেট জুটির ৪১৩ রান স্মরণীয় হয়ে আছে। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অবদান ১৭৩ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া অন্য সব দেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম জয়ের কৃতিত্বে তাঁর অংশ ছিল। ১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে জয়ী ভারতীয় দলেরও তিনি সদস্য ছিলেন। মোট ৪৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ১৯৫৯ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন পঙ্কজ রায়।

প্রবীর সেন পঙ্কজ রায়ের পর টেস্ট খেলার আসরে কিছুদিনের জন্য স্থান করে নিয়েছিলেন। বাংলা দলের হয়ে প্রবীর সেন ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রথম শ্রেণির খেলা শুরু করেন। ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক প্রবীর সেন বিহার দলের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বোচ্চ রান করেন। ১৯৫২-৫৩ সালে বাংলা দলের অধিনায়ক হিসেবে রনজির ফাইনালে হোলকার দলের বিরুদ্ধে অসাধারণভাবে খেলা পরিচালনা করেন। মোট ১৪টি টেস্ট খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচটি, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চারটি এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি। এছাড়া তিনি ১১ জনকে স্টাম্প আউট করেন। ডন ব্র্যাডমানের মতো কালজয়ী ক্রিকেটারও উইকেটরক্ষক প্রবীর সেনের প্রশংসা করেন।

শ্যামসুন্দর মিত্র ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও মিডিয়াম পেসার হিসেবে বাংলার ক্রিকেটে আবির্ভূত হন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বাংলার প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটে মোট ৫৯ ম্যাচে ৩০৫৮ রান করার পাশাপাশি মোট ১৫টি উইকেট নেন। ১৫৫ তাঁর সর্বোচ্চ রান। অলরাউন্ডার হিসেবে শ্যামসুন্দর মিত্র বাংলার ক্রিকেটে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অম্বর রায় ছিলেন বাংলা দলের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। পঙ্কজ রায়ের ভাইপো অম্বর রায় ৪টি টেস্ট ম্যাচে অংশ নেন। দুটি নিউজিল্যান্ড ও দুটি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। **সুব্রত গুপ্ত** বহুবার বাংলা দলের হয়ে রনজিতে খেলেছেন। ডানহাতি এই মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ৪টি টেস্ট ম্যাচে অংশ নেন। বাংলার আরেক দিকপাল ক্রিকেটার **কার্তিক বসু**। বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে ডানহাতি ব্যাটসম্যান হিসেবে ৪৪টি ম্যাচে ১৬৫৯ রান করেন।

১০৭ রান তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ রান। পরবর্তীকালে ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার হিসেবে বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ডানহাতি ব্যাটসম্যান **গোপাল বসু** ছিলেন লম্বা ইনিংস খেলার এক অসাধারণ ক্রিকেটার। বাংলার এই দিকপাল ক্রিকেটার ভারতের হয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে জুটি বেঁধে ১৯৪ রানের পার্টনারশিপ করেন। তাঁর ক্রিকেটীয় বুদ্ধি ও বাগ্মিতা পরবর্তী প্রজন্মকে ক্রিকেট খেলার প্রতি আগ্রহী ও পারদর্শী করে তুলেছে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। বাঁহাতি ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অদ্যাবধি ভারতের সফলতম টেস্ট অধিনায়ক বলে বিবেচিত হন; তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ৪৯টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ২১টি ম্যাচে জয়লাভ করে। ২০০৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারত ফাইনালে পৌঁছে যায়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র একজন আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন অধিনায়কই ছিলেন না, তাঁর অধীনে যে সকল তরুণ ক্রিকেটারেরা খেলতেন, তাঁদের কেরিয়ারের উন্নতিকল্পেও তিনি প্রভূত সহায়তা করতেন।

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেটার। একদিনের ক্রিকেটে তাঁর মোট রানসংখ্যা এগারো হাজারেরও বেশি। ফুটবল খেলা দিয়ে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে ক্রিকেটার হিসেবে জনপ্রিয়তার শিখরে অবতীর্ণ হন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৮৯ সালে বাংলার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে হাতেখড়ি। তারপর নানান উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে অদম্য লড়াকু মানসিকতায় সৌরভ ১১৩টি টেস্ট ম্যাচ, ৩১১টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং ২৫৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের দুঃসময়ে সৌরভ ভারতীয় দলের হাল ধরে ভারতবর্ষকে বিশ্বের ক্রিকেট মানচিত্রে অন্যতম সেরা আসনে বসান। টেস্টে মোট ৭২১২ রান, একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১১৩৬৩ রান এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৫৬৮৭ রান তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাংলার ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রোল মডেল হয়ে উঠেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বোলার হিসেবে তিনি ৩২টি টেস্ট উইকেট ও একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১০০টি উইকেট দখল করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ তিনি ভারত সরকার প্রদত্ত অর্জুন পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও বাংলা ক্রিকেটের স্বনামধন্য খেলোয়াড়রা হলেন, পুঁটু চৌধুরী, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, কমল ভট্টাচার্য, চুনী গোস্বামী, দিলীপ দোশি, প্রণব রায়, অরুণলাল, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবা করিম, দেবাং গান্ধি, দীপ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

বাংলার মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, ঝুলন গোস্বামী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ঝুলন গোস্বামী ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে আই সি সি-র সেরা মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে 'অর্জুন' পুরস্কার লাভ করেন এবং ২০১২-য় 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন।

সাঁতার : প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগে ভারতবর্ষে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সাঁতারের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ওয়াই এম সি এ-র একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বনভোজন করে ফেরার পথে নৌকাডুবির কবলে পড়েন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই রায়বাহাদুর হরিধন দত্ত, তুলসীচরণ রায় এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এস এল ম্যাডক-এর উদ্যোগে উক্ত বছরেই কলেজ স্কোয়ারে প্রথম সুইমিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ওয়েলেসলি স্কোয়ারে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আন্তঃপ্রাদেশিক সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়।১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় 'সুইমিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'। এর প্রায় কুড়ি বছর আগেই অবশ্য প্রথম ভারতীয় সাঁতারু হিসেবে কলকাতার ডি ডি মুলজি আমস্টারডাম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের সূত্রপাত হয় লন্ডনে, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ও ২৫ আগস্ট ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব বুক সাঁতার দিয়ে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হন। ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে সাঁতার শুরু করে ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ বেজ পর্যন্ত ১৯ মাইল দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশন গঠিত হয়। অবশ্য অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এর আগে থেকেই (১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ) পুরুষদের অংশগ্রহণ শুরু হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে অলিম্পিকে মহিলাদের জন্যও সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে থাকে। প্রখ্যাত বাঙালি মহিলা সাঁতারুদের মধ্যে রয়েছেন আরতি সাহা, বুলা চৌধুরী প্রমুখ।

প্রথম বাঙালি সাঁতারু **মিহির সেন** ১৯৩০ সালে পুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। । অল্প বয়সে মিহির সেনের পরিবার উড়িষ্যার কটকে চলে যান। আইন পাশ করে ১৯৫০ সালে তিনি ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। একটি দৈনিকে এক মার্কিন মহিলার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার খবর পড়ে তাঁর নিজের দেশের জন্য ওই সম্মানের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। ওয়াই এম সি এ-তে সাঁতার শিখে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে অতিক্রম করার পরিকল্পনা করেন। বেশ কয়েকটি প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম ভারতীয় হিসেবে সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল পার করেন। দেশে ফিরলে ১৯৫৯ সালে তাকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়। একই বছরে পাঁচটি মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত মহাসাগরে সাঁতার কাটার বিরল খ্যাতি অর্জন করেন মিহির সেন।

বাংলার মহিলারাও ক্রীড়াজগতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী **আরতি সাহা** তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। শৈশবেই কাকা বিশ্বনাথ সাহার কাছে সাঁতার শেখেন । আরতির স্বাভাবিক দক্ষতা দেখে তিনি তাঁকে নিয়ে যান হাটখোলা ক্লাবে। সেখানে শচীন নাগ এবং বিজিতেন্দ্র নাথ বসুর প্রশিক্ষণে তাঁর দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। ১৯৪৫ সাল থেকে আরতি প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে সফল হতে শুরু করেন। ওই সময় থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি মোট ২২বার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তাঁর প্রধান ইভেন্ট ছিল ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ১০০ এবং ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক। রাজ্য তো বটেই সারা দেশেও শুধু তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের ডলি নাজির ছাড়া আর সবাই তার পিছনে ছিলেন।

১৯৫১ সালে রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ১ মিনিট ৩৭.৬ সেকেন্ড সময়ে করে তিনি ডলি নাজিরের গড়া সর্বভারতীয় রেকর্ডও ভেঙে দেন। ওই প্রতিযোগিতাতেই তিনি রাজ্যে রেকর্ড করেন ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (১মিনিট ২৯.৬), ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (৩ মিনিট ২০.৪ সেকেন্ড) এবং ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক (১মিনিট ৫৪ সেকেন্ড) ইভেন্টে। স্বল্পপাল্লার সাঁতারের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত গঙ্গার বুকে দূরপাল্লার সাঁতারেও আরতি নিয়মিত অংশ নিয়েছেন। এই সাঁতার প্রতিযোগিতাগুলি তাঁকে পরবর্তী সময়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার দুঃসাহসী ইচ্ছা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। এশিয়ার প্রথম মেয়ে হিসেবে ১৯৫৯ সালে ইংলিশ চ্যানেল জয় করলেন আরতি সাহা। আর এই অনন্য সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে ১৯৬০ সালে পদ্মশ্রী উপাধি দেওয়া হয়। সফল চ্যানেল সাঁতারুদের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে আরতি সাহার আগে ২৪ জন মহিলা সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন। কিন্তু মাত্র ৯টি দেশ থেকে তাঁরা এসেছিলেন। গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, ডেনমার্ক, আর্জেন্টিনা, ইজিপ্ট, সুইডেন। অর্থাৎ শুধু এশিয়া মহাদেশ না, বেশির ভাগ উন্নত দেশের মেয়েরাও আরতি সাহার থেকে এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন। সদ্য স্বাধীন, পিছিয়ে-পড়া ভারত এবং সামগ্রিকভাবে এশীয় মহাদেশের মেয়েদের সম্পর্কে উন্নত বিশ্বের নেতিবাচক ধারণা পালটে দিতে আরতি সাহার এই সাফল্য বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আরতি সাহার পরে অনিতা সুদ, বুলা চৌধুরী এবং অতি সম্প্রতি রেশমি শর্মা, রিচা শর্মাসহ খুব অল্প কয়েকজন ভারতীয় মেয়েই ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন।

হকি : ১৯২৪ সালের ৭ নভেম্বর গোয়ালিয়রে কর্নেল সি ই লুয়ার্ডকে সভাপতি এবং এইচ এন আনসারিকে সম্পাদক করে ভারতীয় হকি ফেডারেশন গঠিত হয়। সরকারিভাবে ভারত প্রথম অলিম্পিকে যোগ দেয় ১৯২৮ সালে। হল্যান্ডের আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত সেই অলিম্পিকে হকিতে স্বর্ণপদক লাভ করে ভারত। পরপর ছটি অলিম্পিকে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে ভারতীয় হকি দল (১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৬)।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন, গাছের ডাল দিয়ে পাথরের নুড়িকে এদিক-ওদিক সরিয়ে দেওয়ার মধ্যেই হকি খেলার আদি বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্য দেশে হকির মতোই কোনো কোনো খেলা প্রচলিত ছিল বলেই অনুমিত হয়। পরে সেই খেলা গ্রিসে এবং রোমে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ফ্রান্সে 'হকেট' নামে খেলাটি প্রচলিত হয়। ফ্রান্স থেকেই 'হকে' নামে ইংল্যান্ডে খেলাটির আগমন ঘটে, যা বর্তমানে 'হকি' নামে সারা বিশ্বে প্রচলিত।

১৮৭৫-এর এপ্রিলে হকি খেলার সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম তৈরি হয়। ১৮৮৩-তে উইম্বলডন ক্লাব অনেক নিয়মের সংস্কার ঘটায়। ১৮৮৭ থেকে হকিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ শুরু হয়। ১৯০০ সালে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক হকি বোর্ড। ১৯০৭-এ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের খেলা দিয়ে শুরু হয় আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা। ১৯২৪-এ গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিক থেকে মহিলাদের জন্য হকি প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ১৯৭৫-এ তৃতীয় হকি বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

১৯৩১ সালে বাংলা হকি সংস্থা গঠিত হয়। বাংলা সরকারের আইন উপদেষ্টা টিভি বেটন-এর কাপ দিয়ে ১৮৯৫ সাল থেকে কলকাতায় 'বেটন কাপ' প্রতিযোগিতা শুরু হয়, যার প্রথম প্রাপক ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স দল (বর্তমান রেঞ্জার্স ক্লাব)। পশ্চিমবঙ্গে হকির প্রচার ও প্রসারে কুমারেশ সেনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

রেঞ্জার্স ক্লাবই কলকাতায় ব্রিটিশ আমলের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা হকি চালু করে। প্রধানত ভারতীয় সেনাদলের মধ্যে এই খেলার প্রচলন করে ব্রিটিশ অফিসারেরা। ১৮৯৫ সালে রেঞ্জার্স ক্লাব বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে এবং টানা নয় বছর এই সম্মান বজায় রাখে।

ভারতের অন্যতম বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ কলকাতার ময়দানে হকি খেলার কথা বারবার স্মরণ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *গোল*-এ। বাংলার হকি খেলোয়াড়দের মধ্যে কেশব দত্ত, লেসলি ক্লডিয়াস, ভেস পেজ অন্যতম। অলিম্পিক সোনাজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন লেসলি ক্লডিয়াস। ১৯৪৮-এ লন্ডন, ১৯৫২ হেলসিঙ্কি, ১৯৫৬-র মেলবোর্ন, এই তিন বারই অলিম্পিকে সোনা জেতে ভারত। তিন বারই ভারতীয় দলে খেলেছেন তিনি। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে ১৯৭১ সালে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করে।

টেবিল টেনিস : টেবিল টেনিস বা পিং পং খেলার সূত্রপাতের ইতিহাস আজও আবিষ্কারের অপেক্ষায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যান্ডের জনৈক ভদ্রলোক জেমস গির মার্কিন মুলুকে কর্ক বা রবারের বল দিয়ে এই খেলাটি খেলতে দেখেন। ইংল্যান্ডে ফিরে তাঁর খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রেতা বন্ধুকে সেই খেলার কথা জানালে হ্যামলি ব্রাদার্সের মালিক সেই ভদ্রলোক খেলাটিকে 'পিং পং' নামে অভিহিত করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে থেকে এই খেলা ইংল্যান্ডে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। লন্ডনের গুড নামক এক ভদ্রলোক ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ টেবিল টেনিস ব্যাটের দুধারে কাঠের, পরে রবার, বালির কাগজ এবং ভেলাম নামে একরকম পাতলা চামড়া-জাতীয় জিনিস লাগিয়ে খেলার প্রথা আবিষ্কার করায় খেলাটি আরও সুবিধাজনক ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন পিং পং নাম বদলে খেলাটির নামকরণ করেন 'টেবিল টেনিস'। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনের ডা. লিম্যানের আমন্ত্রণে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সভায় আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন গঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনই বর্তমান পৃথিবীর টেবিল টেনিস খেলার পরিচালক বা সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। বার্লিনের সেই সভাতেই টেবিল টেনিস খেলা এবং খেলার বিভিন্ন সরঞ্জাম সম্পর্কিত আইন প্রণীত হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দেই আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিং পং অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে।

কলকাতায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে টেবিল টেনিস খেলা শুরু হয় ওয়াই এম সি এ-তে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক খেলার সৃষ্টি হয় আন্তঃক্লাব খেলার মধ্যে দিয়ে। এই খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম ইন্সটিটিউট আর কলেজ স্ট্রিট ওয়াই এম সি এ-র মধ্যে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়াই এম সি কলেজ শাখা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট এবং মুসলিম ইন্সটিটিউটের প্রতিনিধিরা মিলে প্রথম একটি বেসরকারি অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। সেই অ্যাসোসিয়েশন সে বছরই জুন মাসে 'অল বেঙ্গল পিং পং টুর্নামেন্ট' নাম দিয়ে প্রথম প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সরকারিভাবে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন 'বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে।

সি এস প্যাটারসন তার প্রথম সভাপতি এবং অমর মুখার্জি এবং ডা. এ এন সিংহ যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবে 'অল ইন্ডিয়া টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি হয়। সে বছরই জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহিলাদের সিঙ্গালস প্রতিযোগিতা এবং ১৯৪৬ থেকে মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতা এই জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়।

উত্তরবঙ্গো টেবিল টেনিস শহর বলে পরিচিত শিলিগুড়ি থেকে উঠে এসেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের একাধিক তারকা। ভারতী ঘোষকে শিলিগুড়ির টেবিল টেনিসের দ্রোণাচার্য বলা হয়। শিলিগুড়ি থেকে মান্তু ঘোষের পর কস্তুরী চক্রবর্তী, শুভজিৎ সাহা, সৌম্যজিৎ ঘোষ এবং অঙ্কিতা দাস জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ১৯৯৬, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতে নিজেকে চেনান পশ্চিমবঙ্গোর পৌলমী ঘটক। ভারতের একমাত্র মহিলা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে অঙ্কিতা দাস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। আরও কয়েকজন বাঙালি টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন অনির্বাণ নন্দী, অনিন্দিতা চক্রবর্তী, মৌমা দাস, সৌম্যদীপ রায় প্রমুখ।

লন টেনিস : ক্রীড়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন ফ্রান্সে টেনিস খেলার সৃষ্টি হয়েছিল। বহু শত বছর আগে ইংল্যান্ডের কয়েকজন লোক ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে খেলাটি দেখতে পান। ফ্রান্সে 'লা পাম' নামক সেই খেলায় তাঁরা দর্শক ও সমর্থকদের 'টিন-ইজ' বলে চীৎকার করতে দেখেন, বাংলায় যার অর্থ 'ভালো করে খেলো' বা 'খেলা চালিয়ে যাও'। ইংল্যান্ডে ফিরে সেই 'টিন ইজ' নামেই তাঁরা খেলাটি শুরু করেন। বর্তমান 'টেনিস' শব্দটি 'টিন-ইজ' শব্দ থেকেই এসেছে। ফ্রান্সের লা পাম খেলা বাইরের খোলা মাঠে এবং ঘরের ভিতরেও খেলা হতো। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে ঘরের ভিতরে 'লা পাম' খেলা ফ্রান্সের ধর্মযাজক বা পাদরিরা শুরু করেন। ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে নবম লুইস ধর্মযাজক বা পাদরিদের খেলাধুলায় উৎসাহ দমন করার উদ্দেশ্যে এই খেলা বন্ধ করে দেন। ১৩৫৮ থেকে ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই খেলা ইংল্যান্ডে প্রথম প্রচলিত হয়। প্রথম দিকে মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হলেও তৃতীয় এডওয়ার্ডের আমলে তাঁরই উৎসাহে রাজপ্রাসাদে খেলার কোর্ট তৈরি হয়। এভাবেই ক্রমশ ইংল্যান্ডের জনসাধারণের মধ্যে 'টেনিস' ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান টেনিস খেলার আবিষ্কর্তা উইংফিল্ড নামক এক ইংরেজ। তিনি যখন খেলাটি আবিষ্কার করেন তখন খেলাটির নাম লন টেনিস ছিল না। অল ইংল্যান্ড ক্রিকেট ক্লাব খেলাটির নাম 'লন টেনিস' দিয়ে উইম্বলডনে খেলাটির প্রচলন করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই খেলা প্রচলিত হওয়ার কথা জানা যায়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশন গড়ে ওঠে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা ডেভিস কাপ-এর খেলা শুরু হয় বোস্টনের নিকটবর্তী লং উডে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহিলাদের টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান শুরু হয়।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ লাহোরের একটি সভায় 'ভারতীয় লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। এই অ্যাসোসিয়েশন সৃষ্টির উদ্দেশ্যগুলি ছিল ভারতীয় টেনিস খেলার মান উন্নয়ন ও ভারতে টেনিস খেলার প্রচার করা, জাতীয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, ভারতবর্ষে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হলে বা কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত যোগদান করলে তার ব্যবস্থা করা, প্রতি বছর ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় ঠিক করা, ভারতীয় লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন-এর অর্থ সংগ্রহ করা, পেশাদারি খেলোয়াড়দের আলাদা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, টেনিস খেলার আইন, প্রয়োজন হলে সংশোধন করা, আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশন-এর নিয়মাবলি মাঝে মাঝে প্রকাশ করে প্রচার করা। এই সভায় কর্নেল বি ও রো, এফ আর এল ক্রাফোর্ড, জেকব, মিঙ্ক, স্লিম, জগৎমোহনলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের প্রাথমিক জটিলতা কাটিয়ে কানওয়াল দিলীপ সিংহ, ডি এন ভাল্লা এবং ব্রুক এডওয়ার্ডস একে ভারতের টেনিস খেলার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গাল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। অল্পসময়ের মধ্যে ১৯টি ক্লাব এই অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৬১টি ক্লাব এই রাজ্য টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়নশিপ নামে প্রথম প্রতিযোগিতা এখানে শুরু হয়। টেনিস খেলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে 'অল ইন্ডিয়া লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ', 'ডেভিস কাপ', 'হুইটম্যান কাপ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় ডেভিস কাপের খেলা, আর হুইটম্যান কাপ প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

মহেশ ভূপতি, লিয়েন্ডার পেজ, বিষ্ণু বর্ধন, রোহন বোপান্না প্রমুখ ভারতীয় ভারতে টেনিস খেলাকে জনপ্রিয় করেন। বাংলার বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ প্রমুখ। লিয়েন্ডার ১৪টি গ্র্যান্ডস্লাম দখল করেন। এছাড়াও পেয়েছেন অলিম্পিক পদক, সঙ্গে ৫৩টি এটিপি খেতাব।

দাবা : সুপ্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণে বর্ণিত কাহিনি অনুসরণে বলা যায়, রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীই দাবা খেলার স্রষ্টা। নৃতাত্ত্বিক গবেষকেরা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় দাবা খেলা যে প্রচলিত ছিল, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। বাংলায় দাবা খেলার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে John Cochrane-এর উদ্যোগে, যখন Calcutta Chess Club গড়ে উঠেছিল। এটি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দাবা খেলার ক্লাব। Cochrane ছিলেন সেই সময়ে বিশ্বজুড়ে পরিচিত একজন দাবা খেলোয়াড়, যিনি Howard Staunton-কে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'ক্যালকাটা চেস ক্লাব' প্রখ্যাত দাবাড়ু মহেশ চন্দ্র ব্যানার্জিকে আমন্ত্রণ জানান। সেকালের দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রুশ দাবাড়ু Dr. Alexander Alekhine ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন এবং স্থানীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলায় অংশ নেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়েস্ট বেঙ্গাল চেস অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। রাজ্যে দাবার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোই এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য। এই অ্যাসোসিয়েশন 'অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন' স্বীকৃত। ক্রমে অ্যাসোসিয়েশন দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন শুরু করে, জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ এঁদেরই উদ্যোগে শুরু হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রাজ্য দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে বিজয়ী হন প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু। দাবায় রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছয়জন গ্র্যান্ডমাস্টার, নজন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার, দুজন মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার এবং এক জন মহিলা ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার রয়েছেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে দিব্যেন্দু বড়ুয়া আমাদের রাজ্য থেকে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হন। দিব্যেন্দু বড়ুয়া তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তিনি অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত। মাত্র উনিশ বছর বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত টানা ছবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। ২০০৯ সালে তিনি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী হন। ২০০৫ সালে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হন। বিশ্বনাথন আনন্দের সহযোগী হিসেবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সূর্যশেখর কাজ করেছেন। ২০০২ সালের গ্র্যান্ডমাস্টার সন্দীপন চন্দ অত্যন্ত প্রতিভাবান দাবাড়ু। বহু দাবা অলিম্পিয়াডে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন।

রাজ্যের অন্যান্য দাবা খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন নীলোৎপল দাস (গ্র্যান্ডমাস্টার, ২০০৫), দীপ সেনগুপ্ত (গ্র্যান্ডমাস্টার, ২০১০), সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী (সাম্প্রতিকতম গ্র্যান্ডমাস্টার), অতনু লাহিড়ী, শুভ্রজিৎ সাহা, রক্তিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি রায়, অর্ঘ্যদীপ দাস, সোমক পালিত, দীপ্তায়ন ঘোষ, সায়ন্তন দাস, মেরী অ্যান গোমস, নিশা মোহতা, সহেলি ধর বড়ুয়া প্রমুখ।

খো খো : সম্ভবত পশ্চিম ভারতে খো খো খেলার সূত্রপাত হয়। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বিচিত্র নামে এই জনপ্রিয় খেলাটির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ১৯১৪ সালে পুনার মারাঠা ডেকান জিমখানা ক্লাবে সরকারি উদ্যোগে প্রথম খো খো খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তখন এই খেলাটি শোলপুরী খো খো নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে খেলাটির মধ্যে বহু নিয়মেরই পরিবর্তন এসেছে। ১৯৩৩-এ মহারাষ্ট্রের নাসিকে খো খোর নিয়মকানুন নির্দিষ্ট হয় এবং সেই অনুসারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে খেলাটির প্রচলন ঘটে। ১৯৫৬ সালে মহারাষ্ট্রের শ্রীভাই নুরুলকারের নেতৃত্বে ভারতীয় খো খো সংস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৬১ সালে মহিলাদের প্রথম জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে ভারতীয় খো খো ফেডারেশন

শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে পুরুষদের একলব্য এবং মহিলাদের রানি লক্ষ্মীবাই পুরস্কার দেওয়া শুরু করেন। খো খো খেলার প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে পাতিয়ালার এন এস এন আই এস কেন্দ্রে প্রথম ওরিয়েন্টেশন কোর্স শুরু হলে প্রথম কোর্সেই বাংলার প্রণব রায় কৃতিত্বের সঙ্গো উত্তীর্ণ হন। ১৯৮২ সালের দিল্লির নবম এশিয়ান গেমসে খো খো খেলাকে প্রদর্শনীমূলক খেলা হিসাবে স্থান দেওয়া হয়। খো খো খেলাটি ১৯৮৫ সালে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতিলাভ করে। ১৯৮৭ সালে রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় খো খো দলকে প্রেরণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে ভূপতি মজুমদারের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গো নতুন উদ্যোগে খো খো খেলা শুরু হয়। ফণী ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, প্রণব রায় খেলাটির জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ভলিবল : ভলিবল খেলার উদ্ভব ম্যাসাচুস্টেসের হলিহকে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে হলিহকের ওয়াই এম সি এ-র শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম জি. মর্গান খেলাটি আবিষ্কার করেন। 'মিশোটোনেট' নামক খেলাটির নাম ভলিবল রাখেন স্প্রিংফিল্ডের ডা. এ টি হলস্টেড। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আমেরিকার ওয়াই এম সি এ প্রথম ভলিবল খেলার নিয়মাবলি প্রকাশ করে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে এই খেলার নতুন আইন তৈরি হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে ভলিবলের আন্তর্জাতিক সংস্থা ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ভলিবল গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে মস্কোয় প্রথম মহিলাদের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরেই মস্কোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ভারত পুরুষদের দল পাঠায় এবং ভারত সপ্তম স্থান অধিকার করে। বাংলার সুনীল চ্যাটার্জি ছিলেন এই দলের সদস্য। ওয়াই এম সি এ-এর উদ্যোগে ১৯২৭ সালে পশ্চিমবঙ্গো প্রথম ভলিবল খেলা শুরু হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়াই এম সি এ-র চৌরঙ্গি শাখায় শ্রী বি এইচ পিক এবং শ্রী এ কে ব্যানার্জিকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে বেঙ্গাল ভলিবল ফেডারেশন গড়ে ওঠে এবং সেই বছর থেকেই ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একবছর অন্তর জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়। ১৯৩৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত পুরুষদের প্রতিযোগিতায় বাংলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৫১ সালে লুধিয়ানার অধ্যক্ষ শ্রী এফ সি আরোরা এবং শ্রী এস কে বসুকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে প্রথম ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৩৩ সালে পশ্চিমবঙ্গো প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ভলিবল খেলার প্রচলন করে বাগবাজার জিমনাসিয়াম ক্লাব। তখনই এই খেলা 'ক্যালকাটা ভলিবল লিগ' নামে পরিচিত ছিল। মূলত তাঁদেরই উদ্যোগে ১৯৩৫-এ বেঙ্গাল ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গো ভলিবল প্রসারে শিবপ্রসাদ ঘোষাল ও ফণী ভট্টাচার্য, দিলীপ ভট্টাচার্য, হরিপদ ঘোষ, প্রভাত মৌলিকের নাম সর্বজনবিদিত।

ব্যাডমিন্টন : ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি শরৎকুমার মিত্র কলকাতায় তাঁর ৮৬ নং গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে ইংল্যান্ড থেকে ব্যাট ও কর্ক আনিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তার বাড়িতেই ক্যালকাটা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এটিই ভারতের সবচেয়ে পুরানো এবং প্রথম ব্যাডমিন্টন ক্লাব। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা ব্যাডমিন্টন ক্লাবই ক্যালকাটা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট নাম দিয়ে প্রথম প্রতিযোগিতা শুরু করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ছোটোদের সিঙ্গালস এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ছোটোদের ডাবলস প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র ক্লাবের সভ্যদের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই প্রতিযোগিতায় সাধারণ মানুষ যোগ দেওয়ার অধিকার লাভ করেন। ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা এবং তার আশপাশে প্রায় ১০০ ব্যাডমিন্টন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে নিয়ে অল ইন্ডিয়া ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়। ১৯৩৫-এ অল ইন্ডিয়া ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাডমিন্টন আসোসিয়েশন গঠনের ক্ষেত্রে সুকুমার মিত্র, এ এন দে, বি সি মল্লিক, এফ সেন এবং এন সি তালুকদারের সক্রিয় উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। পুরোনো কলকাতার ব্যাডমিন্টন ক্লাবগুলির মধ্যে

আহিরিটোলা স্পোর্টিং ক্লাব, ক্যালকাটা নর্থ ক্লাব, এন্টালি ইউনাইটেড ক্লাব এবং অলিম্পিক ব্যাডমিন্টন ক্লাব অন্যতম। ১৯৪৮-৪৯ সালে ব্যাডমিন্টনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টমাস কাপ প্রতিযোগিতা শুরু হলে প্রথম বছরেই ভারতীয় দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। মনোজ গুহসহ গজানন হেমাডী ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত টমাস কাপে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। দীপু ঘোষ ও মধুমিতা গোস্বামী পশ্চিমবঙ্গের ব্যাডমিন্টনের দুনিয়ায় সাড়াজাগানো নাম। এছাড়াও বহু প্রতিভাধর খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে ব্যাডমিন্টন তার ঐতিহ্যের গৌরবকে আজও অমলিন করে রেখেছে।

কবাডি : পুরাণে কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে হা-ডু-ডু খেলতেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কবাডি নানান নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে চি-ডু-গু-ডু, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে হু-টু-টু, কেরলে ওয়াণ্ডিকালি, উত্তর ভারতে কবাডি এবং পশ্চিমবঙ্গে হা-ডু-ডু। এছাড়াও শ্রীলঙ্কায় খেলাটি গু-ডু, থাইল্যান্ডে থিকাব, বাংলাদেশে চু-কিত-কিত নামে প্রচলিত। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অষ্টম সর্বভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথম কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ইডেন উদ্যানে মেয়েদের কবাডি প্রতিযোগিতা প্রথম আয়োজিত হয়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে School games Federation of India তাঁদের ক্রীড়াসূচিতে কবাডিকে একটি নির্ধারিত ক্রীড়া হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত All India Kabaddi Federation ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে Amateur Kabaddi Federation of India (AKFI) নামে পরিচিত হয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠে Asian Amateur Kabaddi Federation। এরপর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম এশিয়ান কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে কবাডি মূল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয় হিসেবে স্থান পায় এবং তাতে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়। বাংলাদেশ রানার্স হয়। ১৯৯০ সালের বেজিং এশিয়ান গেমসে কবাডি মূল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে। নারায়ণচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গে কবাডির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেন। ভূপতি মজুমদারের সভাপতিত্বে ও সরোজমোহন রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে কবাডি অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। বাংলার কবাডিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম ফণী ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য সাহা, রণজিৎ ধর।

তিরন্দাজি : ভারতবর্ষে তিরন্দাজির ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। রামায়ণ-মহাভারতে যুদ্ধ কিংবা প্রতিযোগিতার নানান ক্ষেত্রে তিরন্দাজির উল্লেখ লক্ষ করা যায়। তিরন্দাজির ক্ষেত্রে বাংলায় সাই কমপ্লেক্সের অবদান অবিস্মরণীয়। দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফলভাবে অংশগ্রহণ করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এঁরা দুজনেই 'অর্জুন' পুরস্কারে সম্মানিত।

অ্যাথলিটিক্স : অ্যাথলিটিক্সে যোগ না দিলে কোনো দেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ভারতের মধ্যে অ্যাথলিটিক্সের সূচনা কলকাতাতেই। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্পোর্টস-এ যোগ দিতে সারা ভারত এবং ভারতের বার্মা মুলুক থেকে শ্বেতাঙ্গ এবং সামরিক ও অসামরিক প্রতিযোগীরা কলকাতায় আসতেন। গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে দীর্ঘদিন অনুশীলনের পর ইডেন উদ্যানে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তাঁরা অংশ নিতেন। সেই সময়ের সেরা বাঙালি অ্যাথলিটদের মধ্যে ছিলেন বিজয়দাস ভাদুড়ি, শিবদাস ভাদুড়ি, পি কে বিশ্বাস, জিতেন দাশগুপ্ত, এ এ আপকর প্রমুখ। পরবর্তীকালে জ্যোতির্ময়ী শিকদার (এশিয়াডে প্রথম স্বর্ণজয়ী), নীলিমা ঘোষ, সোমা দত্ত প্রমুখ বাংলার সেরা অ্যাথলিটদের অন্যতম। ভারত সরকার জ্যোতির্ময়ীকে 'রাজীব গান্ধি খেলরত্ন' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত হন।

শ্যুটিং : সাধারণত বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ শ্যুটিং খেলাটি সর্বস্তরের ক্রীড়ামোদী ও দর্শকদের মধ্যে সেভাবে ছড়িয়ে না পড়লেও বিনোদন সৃষ্টিতেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভারতীয় শ্যুটার যশপাল রানা ১৯৯৭ এর জাতীয় গেমস-এ ৫৯৫ পয়েন্টে বিশ্ব রেকর্ড করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। শ্যুটিং ক্লাবের প্রসারই একমাত্র খেলাটি সম্পর্কে জনসাধারণকে ক্রমশ উৎসাহী করে তুলতে পারে। শ্যুটিং-এর ক্ষেত্রে বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম— সোমা দত্ত, জয়দীপ কর্মকার, কুহেলি গঙ্গোপাধ্যায়।

পর্বতারোহণ : ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট আরোহণ করেন। তাঁদের সাফল্যের সূত্রে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে দার্জিলিং-এ 'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট' স্থাপিত হয়। এখানে পর্বতারোহীদের প্রশিক্ষণ দেবার বহুরকম সুযোগসুবিধা আছে এবং একটি মিউজিয়ামও গড়ে তোলা হয়েছে। পর্বতারোহণপ্রিয় বাঙালির মনে বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন বিশ্বদেব বিশ্বাস, অমূল্য সেন, সত্যব্রত দাম, প্রাণেশ চক্রবর্তী, বসন্ত সিংহ রায়, দেবাশিস বিশ্বাস, দেবরাজ দত্ত, কুঞ্জা ভুটিয়া, মেজর শিপ্রা মজুমদার, ছন্দা গায়েন, দীপঙ্কর ঘোষ প্রমুখ শৃঙ্গজয়ী। সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে পর্বতারোহণকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন গৌরকিশোর ঘোষ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ প্রমুখ।

ব্রতচারী : ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে শরীরচর্চা ও স্বাদেশিকতার জাগরণে ব্রতচারীর উদ্ভাবক **গুরুসদয় দত্ত** (১৮৮২-১৯৪১) একটি স্মরণীয় নাম। শরীরচর্চা কেবল দেহগঠনের উপায় নয়, মানুষের একাধিক মানসিক বৃত্তির উন্নতিসাধনও শরীরচর্চার ফলে হয়ে থাকে। ব্রতচারী এমনই একটি শিক্ষা যা নৃত্যগীত সহযোগে, মানবিকতার মহৎ আদর্শে প্রাণিত হয়ে শরীর ও মনকে উন্নত করতে নিবিড়ভাবে সহায়তা করে। গুরুসদয় দত্তের চিন্তার ফসল ব্রতচারীর গানগুলি মূলত বাংলায় লেখা হলেও পরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ভারতব্যাপী ব্রতচারী শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রতচারী লোকনৃত্য সমিতি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এই আদর্শের জয়যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪১-এ ২৪ পরগনার জোকা অঞ্চলে তৈরি হয় ব্রতচারী গ্রাম এবং ব্রতচারী জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জ্ঞান, শ্রম, সত্য, একতা এবং আনন্দ এই পাঁচটি ব্রত নিয়ে দেশাত্মবোধ ও সমাজসেবার আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে ব্রতচারীরা শ্রম ও খেলাকে সমার্থক করে নিয়েছিলেন। ব্রতচারী নৃত্যের মধ্যে পল্লিগ্রামের নৌকা বাওয়ার ভঙ্গি, কোদাল চালানোর ভঙ্গি প্রভৃতি অনুকরণাত্মক মুদ্রা যেমন রয়েছে, তেমনই মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের যুদ্ধের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বীররস ও স্বাদেশিকতা উদ্‌বোধনের অবকাশও রয়েছে প্রচুর।

বাঙালির সার্কাস : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 'হিন্দুমেলা' নামক এক বিরাট জাতীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন ও ঐক্য বন্ধনের উদ্দেশে 'হিন্দুমেলা' উদ্‌যাপিত হয়। এই মেলার প্রধান কর্ণধার ছিলেন নবগোপাল মিত্র। তাঁর এই উদ্যোগে শামিল হয়েছিলেন মনোমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন। হিন্দুমেলার নানা ধরনের কার্যকলাপের মধ্যে অন্যতম ছিল শরীরচর্চা। এর ফলে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যায়ামশালা গড়ে উঠেছিল। এই শরীরচর্চার বিকাশের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালি সার্কাসের স্বপ্ন। হিন্দুমেলা যখন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তখন কলকাতায় ইউরোপীয় সার্কাসের আবির্ভাব হয়। সেই সময়কার বিখ্যাত 'উইলসন গ্রেট ওয়ার্ল্ড সার্কাস'-এর জনপ্রিয়তা ও সাফল্য দেখে নবগোপাল মিত্র নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন 'ন্যাশনাল সার্কাস' (১৮৮৩), এটিই কলকাতা শহরে বাঙালির প্রচেষ্টায় প্রথম স্বদেশীয় সার্কাস। কিন্তু তাঁর এই উদ্যোগ বেশিদিন চলেনি। এর পরই গঠিত 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'। খুব অল্পদিনে এই সার্কাসটি খুব নাম করলেও, এটিও খুব বেশিদিন চলেনি।

নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল সার্কাসের জন্তুজানোয়ার ও সাজসরঞ্জাম কিনে নিয়ে সার্কাসের আয়োজন করেন সেকালের খ্যাতনামা নাট্যকার মনোমোহন বসুর ছেলে প্রিয়নাথ বসু। বন্ধ হয়ে যাওয়া গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাসের জিনিসপত্রও তিনি কিনে নেন এবং গড়ে তোলেন 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'। তিনি প্রথমে বাংলার বাইরে এবং বহু পরে কলকাতায় সার্কাসের খেলা দেখাতে শুরু করেন। ততদিনে তাঁর সার্কাসের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেকালের সার্কাস বা শরীরচর্চার কোচ বা প্রধানদের 'প্রফেসর' নামে ডাকা হতো। প্রিয়নাথ 'প্রফেসর বোস' নামে পরিচিতি লাভ করেন। কথিত আছে রেওয়ার মহারাজা 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে দুটি বাঘ উপহার দেন। সেই বাঘ দুটির নাম 'লক্ষ্মী' ও 'নারায়ণ'। সার্কাসের দলে বাঘ আসতেই সারা ভারতবর্ষ থেকে ডাক আসতে লাগল। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসের দলের নামডাক এত হল যে সেযুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণও সার্কাস দেখতে আসতেন। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসে বাঘের খেলা দেখাতেন বাদল চাঁদ। বাঘের খেলা দেখিয়ে তিনি প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সুশীলাসুন্দরীর বাঘের খেলা দেখে দর্শক হতবাক হয়ে যান। তিনিই হলেন বাংলার প্রথম নারী যিনি বাঘের খাঁচায় ঢুকে নির্ভয়ে বাঘের খেলা দেখিয়েছেন। সুশীলাসুন্দরী ছাড়াও মৃন্ময়ী নামে অপর একজন বাঘের খেলা দেখাতেন। তিনি হাতির পিঠে চেপেও

নানারকমের খেলা দেখাতেন। জিমনাস্টিকসের খেলা দেখাতেন সুশীলাসুন্দরীর বোন কুমুদিনী। সুশীলাসুন্দরী 'ফরচুন' নামের একটি বাঘের খেলা দেখাতে গিয়ে বাঘের থাবার আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম হন। প্রিয়নাথ তাঁর বিচিত্র ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও সার্কাসের কাহিনি নিয়ে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে একটি বই লেখেন, নাম দেন 'প্রোফেসর বোসের অপূর্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত'। সেই বইতে ছিল বার্মা থেকে জাভা, সুমাত্রা পর্যন্ত, ভারতীয় উপমহাদেশ-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চলের ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতার কাহিনি। বইটির প্রচ্ছদ বা নামপত্রে কোথাও লেখকের নামোল্লেখ ছিল না। শুধু ছিল প্রিয়নাথ বসুর আলোকচিত্র। আসলে তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, ছবিটুকুই যথেষ্ট। তাঁর সার্কাসের নানান ক্রীড়াকুশলী, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও বৃত্তান্ত নিয়েই এই বই। ভিন রাজ্যে খেলা দেখাবার সময় সেখানকার রাজারাজড়া, জমিদার বা স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন, রয়েছে তাঁদের কথাও। সার্কাস দলের বিবরণ হলেও বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রিয়নাথের মেজছেলে অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর আগ্রহ ছিল শিল্পে। আর্ট কলেজ থেকে পাস করে পেশাদার শিল্পী হয়েছিলেন। বাবাকে নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। বাবা সার্কাসের দল নিয়ে বিদেশে থাকলে তিনি কলকাতায় থেকে পরিবার ও কলকাতার যাবতীয় খুঁটিনাটি বাবাকে পত্র মারফত জানাতেন। তিনিই ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বাবার কীর্তি নিয়ে লেখেন 'বাঙালির সার্কাস'। শুধু লেখা নয়, মতামতের জন্যে সে সময়ের মনীষীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন বইটি। সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রথম সংস্করণের পর মান্যজনদের মতামত নিয়ে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণে ১৭টি আলোকচিত্র-সহ ১০টি অধ্যায়ে প্রিয়নাথের সার্কাসের বিবরণ ছিল। পরবর্তী সংস্করণে বাড়তি পাঁচটি অধ্যায় ছাড়াও ছিল মোট ৩১টি ছবি।

বাঙালির ম্যাজিক : বাংলার লোক-ঐতিহ্যের আরেকটি দিক মন্ত্র, ম্যাজিক, যাদু, ভেলকি প্রভৃতির সহাবস্থান। বাংলা লোকসাহিত্যে মন্ত্র, যাদু, ভেলকি প্রভৃতির উপরে আদিম সমাজের সর্বাত্মবাদ (animism) ছাড়াও তন্ত্রশাস্ত্রও সম্ভবত প্রভাববিস্তার করে থাকবে। হিন্দুতন্ত্র পূর্বে কি বৌদ্ধতন্ত্র পূর্বে, এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ সত্ত্বেও তন্ত্রের ব্যবহার বাংলার মাটিতে সুপরিচিত ছিল।

গণপতি চক্রবর্তী (১৮৫৮—১৯৩৯) ছিলেন প্রোফেসর বোসের সার্কাস দলের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। শৈশব থেকে গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, নানা রোগের অলৌকিক চিকিৎসার ব্যাপারে আগ্রহী গণপতি বাড়ি ছেড়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হন। 'ইলিউশন বক্স', 'ইলিউশন ট্রি' এবং 'কংস-কারাগার' ছিল তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত ও চমকপ্রদ খেলাগুলির অন্যতম। তাঁর সহধর্মিণী হিঙ্গলবালা ছিলেন তাঁর জাদু প্রদর্শনের সঙ্গিনী। পরবর্তী সময়ে তিনি পৃথক দল গড়ে সারা ভারত জুড়ে খেলা দেখিয়ে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। বাংলাদেশে আধুনিক ম্যাজিকের জনক গণপতি 'যাদুবিদ্যা' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থও রচনা করেন।

প্রতুলচন্দ্র সরকারের (পি সি সরকার) পিতা ভগবানচন্দ্র এবং ঠাকুরদা দ্বারকানাথদেব ম্যাজিক জানতেন। তিনি খ্যাতিসম্পন্ন জাদুকর গুরু গণপতি চক্রবর্তীর কাছে শিক্ষালাভ করে তীব্র অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেকে অসামান্য করে তুলেছিলেন। ১৯১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার অশোকপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং পরে টাঙ্গাইলের সা'দত কলেজ থেকে গণিতে অনার্স-সহ বিএ পাস করেন। ১৯৩৩ সালে জাদু প্রদর্শনকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা, জাপান-সহ প্রায় ৭০টি দেশে জাদু প্রদর্শন করে প্রভূত সুনাম অর্জন, বহু পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ জাদুকরের স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে লন্ডন বিবিসি টিভিতে জাদু প্রদর্শন করেন। ১৯৬২ সালে মস্কো ভ্রমণ করেন এবং লেনিনগ্রাদে জাদু দেখান। ১৯৭১ সালের ৬ জানুয়ারি জাপানের আশাইকাওয়ায় তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ১৬টি। তিনি ১৯৪৬ ও ১৯৫৪ সালে জাদুর অস্কার নামে পরিচিত 'দ্য ফিনিক্স' (আমেরিকা) পুরস্কার লাভ করেন, জার্মান ম্যাজিক সার্কেল থেকে 'দ্য রয়াল মেডিলিয়ন' পুরস্কার পান এবং ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে। এছাড়াও ভারত সরকার 'জাদুসম্রাট পি সি সরকার' নামে কলকাতাতে একটি সড়কের নামকরণ করেছেন। গত ২০১০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে একটি ৫ টাকার ডাকটিকিট চালু করে। তাঁর পুত্র পি সি সরকার জুনিয়র এখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুশিল্পী।

ভাষা

ভাষাবিজ্ঞান ও তার শাখা-প্রশাখা

'ভাষাবিজ্ঞান' কথাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই বিষয়টির নির্যাস, ভাষার বিজ্ঞানই হল ভাষাবিজ্ঞান। অন্যভাবে বললে, ভাষা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চর্চাই হল ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ভাষাবিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই নিত্য প্রগতিশীল এবং নিত্য সক্রিয় একটি বিদ্যা (Discipline)। বিজ্ঞান যেমন প্রতিদিন নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে এবং সেই নতুন তথ্যের আলোকে সংশোধন ও পরিমার্জন করছে, ভাষাবিজ্ঞান একইভাবে এগিয়ে চলেছে চরম সত্য আবিষ্কারের দিকে। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই ভাষাবিজ্ঞানের গতি হল বিশেষ (Particular) থেকে সাধারণের (General)-এর দিকে; এ পদ্ধতি হল আরোহমূলক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনার প্রথম ধাপ হচ্ছে তথ্যসংগ্রহ (Data Collection) ও নথিভুক্তকরণ (Recording)। তারপর সেই প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ (Analysis) করে তার যথাযথ বর্ণনা (Objective Description)। ভাষার উপাদানগুলির এইভাবে বারংবার বিশ্লেষণ থেকে যখন দেখা যায় একই রকম কারণের পরিপ্রেক্ষিতে একইরকমের ফল বা প্রতিক্রিয়া আসছে তখন পরবর্তী ধাপে সে ব্যাপারটিকে সাধারণীকৃত করা হয়। এরপরেই অনুমান বা Hypothesis খাড়া করার পালা। এই অনুমান তারপর যাচাইয়ের (Verify) মাধ্যমে পরিণত হয় সূত্রে (Linguistic Law)। এভাবেই ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে ভাষার বিজ্ঞানসম্মত চর্চা।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাষাবিজ্ঞান মানুষের মুখের ভাষার চর্চা করে। লিখিত ভাষা ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় আসে না। অনেকে মনে করেন, লিখিত ভাষা ও মুখের ভাষা একই এমনকি অনেকে লিখিত ভাষাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। আসলে ব্যাপারটি তার বিপরীত। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ কথা বলছে। মানুষের ভাষার উদ্ভব কীভাবে হয়েছে তা নিয়ে সকলে একমত হতে না পারলেও কয়েক লক্ষ বছর আগে মৌখিক ভাষার কাছে লিখিত ভাষা অনেকটাই নবীন। লেখা শুরু হয়েছে পাঁচ ছয় কি সাত হাজার বছর আগে। মুখের ভাষাকে লিখন পদ্ধতি কখনো সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। লিখিত ভাষার বহু সীমাবদ্ধতা আছে। দ্বিতীয় যে কারণে ভাষাবিজ্ঞান কেবল মৌখিক ভাষাকে গুরুত্ব দেয় তা এই যে, যেখানে বহু সহস্র কোটি মানুষ কথা বলে বা মৌখিকভাবে ভাষা ব্যবহার করে, সেখানে তার মাত্র কয়েক শতাংশ মানুষ লিখতে জানে। তাই মুখের ভাষাকেই ভাষাবিজ্ঞানীরা আসল ভাষা বলে মানেন। সুতরাং; ভাষাবিজ্ঞান হল সামগ্রিকভাবে ভাষার (অর্থাৎ মানুষের মুখের ভাষার) গঠন, প্রকৃতি, পদ্ধতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত চর্চার নাম। লক্ষণীয় যে, ভাষাবিজ্ঞান কোনো বিশেষ একটা দুটো ভাষার কথা বলে না, ভাষাবিজ্ঞান সাধারণভাবে ভাষার কথা বলে।

আবার এর পাশাপাশি ভাষার সঙ্গে সমাজ, ভাষার সঙ্গে মানবমন, ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ভাষা শিক্ষার প্রণালী, ভাষার সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক, এমনকী মানব ভাষার সঙ্গে Computer-এর ভাষার সম্পর্ক এগুলিও ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবেশ করেছে। সুতরাং, শুধু ভাষার ভিতরের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই নয়, ভাষা মানবসভ্যতায় কীভাবে কাজ করে তাও সামগ্রিকভাবে ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়।

তুলনামূলক, ঐতিহাসিক এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা নানারকম হতে পারে। তার মধ্যে তিনটি বহুল প্রচলিত শাখা হলো— তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান।

তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান : তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্‌স (১৭৮৬)। জোন্‌স সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, ফারসি ভাষার মধ্যে প্রচুর মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এই ভাষাগুলির মধ্যে একটি

ঐক্যসূত্র আছে কারণ এই ভাষাগুলি একটি মূলভাষা থেকে উৎপন্ন। জোন্‌সের পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইয়োরোপের গবেষকরা প্রমাণ করলেন যে জোন্‌সের ধারণা অভ্রান্ত। সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন এই ভাষাগুলির উৎপত্তির মূলে আছে একটি প্রধান ভাষা। এই প্রধান বা মূল ভাষার কোনো নমুনা বা পাথুরে প্রমাণ নেই। তবে সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন প্রভৃতি ভাষাগুলি তুলনা করে এই মূলভাষার একটি কাঠামো কল্পনা করা যেতে পারে। এই ভাষার নামকরণ হয় ইন্দো- ইয়োরোপীয়। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইয়োরোপ এবং পরবর্তীকালে আমেরিকায় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রচুর চর্চা হয়। একথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার হতে। তুলনামূক ভাষাবিজ্ঞান সমগোত্রজ ভাষাগুলির মধ্যে তুলনা করে এবং তাদের উৎস ভাষাকে বা মূলভাষাকে পুনর্নির্মাণ করে।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান : তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে এই শাখার পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান যেখানে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনা করে, বিভিন্ন ধরনের মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে যা ভাষাগুলির মধ্যে ধারাবাহিক রূপান্তর আলোচনা করে। শুধু তাই নয়, কী কী কালগত রূপান্তর ভাষার মধ্যে লক্ষ করা যায় এবং কী কী কারণে এই কালগত রূপান্তর হয় তারও বিধিবন্ধ আলোচনা করে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কীভাবে বিভিন্ন স্তর যেমন পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্টর মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম দিয়েছে তা মূলত ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার যে বিবর্তন হয় এবং সেই বিবর্তনের ফলে যে যে পরিবর্তন ভাষার সংগঠনে দেখা যায় তা নির্দেশ করা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। বিশেষ করে শব্দ ও পদমধ্যস্থ ধ্বনি পরিবর্তন ভাষার কালগত রূপান্তরের অন্যতম কারণ। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান এই ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন যা ভাষার মধ্যে ক্রিয়া করে তা অনুসন্ধান করে।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার ইতিহাস বা অতীত নিয়ে কোনোভাবে আলোচনা করে না। বরং সমকালীন প্রচলিত ভাষার গঠনরীতির বিচার বিশ্লেষণ করে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রধানত ইয়োরোপ এবং পরবর্তীকালে মার্কিন দেশে। যে ভাষার কোনো অতীত নিদর্শন নেই অথবা যে ভাষা এখনও পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি সেই ভাষার আলোচনার জন্য বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই শাখার মতে কোনো ভাষার আলোচনার প্রধান বিষয় চারটি—ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং শব্দার্থতত্ত্ব। ধ্বনিবিজ্ঞান আলোচনা করে কীভাবে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারিত হয়।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা পাই কোনো একটি বিশেষ ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির বিচার বিশ্লেষণ। রূপতত্ত্বের বিষয় পদের গঠন, পদের চেয়ে ছোটো ভাষার একক রূপের নানান প্রযুক্তি। বাক্যতত্ত্বের বিষয় হল বাক্যের সার্বিক আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ। শব্দার্থতত্ত্বের বিষয় শব্দের অর্থ পর্যালোচনা। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার সংগঠনে আলোচনার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। ভাষাকে যদি মানবদেহের সঙ্গে কল্পনা করি তাহলে ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হল ধ্বনি, ধ্বনিগুচ্ছ, রূপ, পদ, বাক্য ইত্যাদি।

ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক : ভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হল মানুষের ভাষা এবং ভাষার সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন সংলগ্ন দিকগুলি। ভাষা বাস্তবে একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে ভাষার জটিল রহস্যকে উন্মোচন করা ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য। একদিকে ভাষা এবং অন্যদিকে ভাষার সঙ্গে অন্যান্য সংলগ্ন মানবজীবনের নানা দিক— এই দুই দিক সমান তালে আলোচনা করতে ভাষাবিজ্ঞানের গবেষকদের প্রধানত দু-দলে ভাগ হয়ে যেতে হয়। আমরা একটি ছকের সাহায্যে আলোচনাটি করতে পারি।

প্রথম ক্ষেত্রে ভাষার কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিন্যাস এবং তার গঠন প্রণালী আলোচিত হয়। একে বলে প্রধান ভাষাবিজ্ঞান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এবং ভাষার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষার অবদান বা প্রয়োগ (application) ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। প্রধান ভাষাবিজ্ঞান ভাষার যে গঠনপ্রণালী বা ভাষার যে কেন্দ্রীয় বিন্যাস আলোচনা করে তা প্রধানত পাঁচটি শাখায় হয়। এই পাঁচটি শাখা হল ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)। ফলিত ভাষাবিজ্ঞানে আমরা আলোচনা করি বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে মানবভাষার কী সম্পর্ক। যেমন সমাজ বা সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক যার নাম সমাজভাষাবিজ্ঞান, মানবমনের প্রকৃতি ও গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মানব ভাষার সম্পর্ক যার নাম মনোভাষাবিজ্ঞান, মানব মস্তিষ্কের অত্যন্ত জটিল গঠনের ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মানবভাষার সম্পর্ক যার নাম স্নায়ুবিজ্ঞান, নৃতত্ত্বের সঙ্গে মানবভাষার সম্পর্ক যার নাম নৃভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি। অপরপক্ষে বিদ্যাচর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের সফল প্রয়োগও ফলিত ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় আলোচিত হয়। যেমন সাহিত্য বিশ্লেষণে অথবা সাহিত্যের নান্দনিক দিকটি ঠিকভাবে তুলে ধরতে ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্য বিশেষ জরুরি। শৈলীবিজ্ঞানে ভাষা ও সাহিত্যের এই দিকটি আলোচিত হয়। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভিধান নির্মাণে ভাষাবিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। যে শাখায় অভিধান তৈরিতে ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ আলোচনা করা হয় তার নাম অভিধানবিজ্ঞান। আমাদের আগের ছকটি এবার একটু বিস্তারিত করা যাক।

ভাষাবিজ্ঞান

প্রধান ভাষাবিজ্ঞান	**ফলিত ভাষাবিজ্ঞান**
ধ্বনিবিজ্ঞান	সমাজভাষাবিজ্ঞান
ধ্বনিতত্ত্ব	মনোভাষাবিজ্ঞান
রূপতত্ত্ব	স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান
বাক্যতত্ত্ব	নৃভাষাবিজ্ঞান
শব্দার্থতত্ত্ব	শৈলীবিজ্ঞান প্রভৃতি

প্রধান ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলির আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হয়েছে। তাই এখানে শুধু ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

ফলিত ভাষাবিজ্ঞান :

সমাজভাষাবিজ্ঞান : ভাষা কীভাবে সমাজে কাজ করে এবং সমাজ কীভাবে ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখাটি এই নিয়ে চর্চা করে তাকেই আমরা সমাজভাষাবিজ্ঞান বলি। এককথায় বলা যায় সমাজভাষাবিজ্ঞান হল ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়। মানবসমাজের বাইরে ভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই। সমাজে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতা, নারী-পুরুষের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতা অঞ্চলভেদে ও পেশাভেদে ভাষার ভিন্নতা এসবই সমাজভাষাবিজ্ঞানের আওতায় আসে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল ভাগ তিনটি —

(১) বর্ণনাত্মক সমাজভাষাবিজ্ঞান। (Descriptive Socio linguistics)

(২) পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান। (Dyanamic Socio linguistics)

(৩) প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান। (Applied Socio linguistics)

বর্ণনাত্মক সমাজভাষাবিজ্ঞান প্রধানত ভাষা বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ভাষার বক্তা, ভাষার বিশেষ রূপ, শ্রোতা, ভাষা ব্যবহারের বিশেষ কারণ—এসব প্রশ্নই বর্ণনাত্মক সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বিবেচ্য। কোনো ভাষার চরিত্র নির্ভর করে বক্তা, (Sender) শ্রোতা (Receiver), এবং উপলক্ষ্য (Setting)- এর ওপর। সুতরাং প্রথমেই প্রয়োজন বক্তার সামাজিক পরিচয়। অর্থাৎ তিনি পুরুষ না নারী , বয়স কত, সমাজের কোন স্তরের মানুষ, তার পেশা কী, এমনকী সে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ এসবই তাঁর ভাষার রূপটির নির্ণায়ক। এরপরে আসে শ্রোতার বা Receiver-এর সামাজিক পরিচয়। আমরা সহজেই দেখতে পাই যে আমরা গুরুজনদের সাথে যেভাবে কথা বলি, সমবয়সি বা বয়ঃকনিষ্ঠের সাথে সেভাবে কথা বলি না। একারণেই আমাদের ভাষায় আপনি, তুমি, তুই ভেদ আছে। আবার পরিবারের গুরুজনদের সঙ্গে আমরা যেভাবে কথা বলি স্কুল বা কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভাষা প্রয়োগের ধরন পালটে যায়। এখানেই ভাষার ওপরে শ্রোতার সামাজিক ভূমিকার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বর্ণনামূলক সমাজবিজ্ঞানের তৃতীয় মাত্রা হল উপলক্ষ্য বা Setting। অর্থাৎ পরিস্থিতি বা পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী ভাষা যে পালটে যায়, তা ধরা পড়ে এই অংশের আলোচনায়। সভা সমিতির ভাষা, শ্রেণিকক্ষের ভাষা, ঝগড়ার ভাষা, আইনের ভাষা, খবরের কাগজের ভাষা প্রত্যেকটি ভাষার ধরন আলাদা। উপভাষা অঞ্চলে বাঙালি ছাত্ররা স্কুলে মান্য বাংলা বললেও, বাড়িতে তারা বাংলার কোনো একটি উপভাষাতেই কথা বলেন। সুতরাং, কোথায় কথা বলা হচ্ছে, এটি ভাষার ক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে। এই যে উপলক্ষ্য অনুযায়ী ভাষার বা উপভাষার বদল হয় তাকে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা রেজিস্টার (Register) বলেন। কোনো ব্যক্তির বিশেষ উপভাষার যে বিশেষ রীতি ব্যবহার করে তাকে বলে কোড (code)। সেই ব্যক্তির ভাষা যদি পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলে নেয় তবে এই প্রক্রিয়াটিকে বলে কোড-বদল (code-switching)।

সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান সমাজভাষাকে মূলত ইতিহাসের দিক থেকে দেখে। কোনো বিশেষ সমাজ ভাষার উদ্ভব বিবর্তন বিস্তার ও সংকোচনের ধারা নিয়ে ভাষা-বিজ্ঞানের এই শাখাটি কাজ করে। যেমন ধরা যাক, কোনো একটি বিশেষ ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষ যখন আর একটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তখন দেখা যায় নিজেদের ও নতুন সমাজের এই দুই ভাষাই তার ভাষা ব্যবহারের মধ্যে চলে আসে। এরকম ক্ষেত্রে অনেকসময়ই দেখা যায়, যে হয় দুটি ভাষাই সমান্তরালভাবে থেকে যায়, অথবা কোনো একটি ভাষা অন্য ভাষার প্রভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায়। প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি দ্বিভাষিকতা বা Bilingualism দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এসে যায় ভাষার সংরক্ষণ বা (Maintenance) -এর প্রশ্ন। পাশাপাশি ওঠে ক্রেওল এবং পিজিনের কথাও।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের শেষ বিভাগ হল প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান বা (Applied Sociolinguistics)। মাতৃভাষা শেখানোর পদ্ধতি, অন্য ভাষা শেখার পদ্ধতির উদ্ভাবন, অনুবাদনীতি, লিপি প্রণালীর উদ্ভাবন, পরিমার্জনা ও সংশোধন, বানান সংস্কার, ভাষা পরিকল্পনার দিক থেকে রাষ্ট্রভাষা ও সংযোগের ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ — এসবই প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

মনোভাষাবিজ্ঞান : ভাষা যেহেতু মনের ভাব প্রকাশ করে, সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে ভাষার সঙ্গে মনের যোগ নিবিড়। মনস্তত্ত্ব মানুষের মনের গঠন ও মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে, আবার অন্যদিকে ভাষা সেই মানসিক প্রক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। মনোভাষাবিজ্ঞানীরা এই ভাষা ও মনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন। মনোভাষাবিজ্ঞান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে শিশুর ভাষার ক্ষেত্রে; কীভাবে তারা কথা বলে, কীভাবে বাক্য তৈরি করে তার ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করে মনোভাষাবিজ্ঞান।

মানুষ কীভাবে ভাষা শেখে এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। প্রাথমিক অনুমান ছিল যে মানুষ ভাষিক পরিবেশে থেকে অনুকরণের মাধ্যমে ভাষা আয়ত্ত করে। নোয়াম চমস্কি এই তত্ত্বের থেকে সরে এসে বললেন যে মানুষের মধ্যেই থাকে ভাষা শেখার সামর্থ্য। মানব মস্তিষ্কেই রয়েছে সেই সামর্থ্যের কেন্দ্র। সে-কারণে চমস্কি প্রথমে মস্তিষ্ককে বললেন ভাষা শেখার যন্ত্র বা (Language Acquisition Device (LAD)। পরে তিনি 'যন্ত্র' কথাটির পরিবর্তে 'ব্যবস্থা' বা (System) কথাটি ব্যবহার করলেন। তাঁর মতে মানব মস্তিষ্কে প্রি-প্রোগ্রামড অবস্থায় আছে এমন এক

ব্যাকরণ যাকে সর্বজনীন ব্যাকরণ বা (Universal Grammar) বলে চিহ্নিত করেন। এই (LAD-LAS)-এর মাধ্যমেই শিশুরা ভাষাশিক্ষায় অনুকরণধর্মিতা থেকে সৃষ্টিশীলতার এক বিশাল ভাণ্ডারে পৌঁছেছে।

মনোভাষাবিজ্ঞান শুধু ভাষাশিক্ষার নানা দিকেই আলো ফেলে না, পাশাপাশি মানসিক পাশ্চাদপরতাও যে ভাষার উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে সে কথাও আলোচনা করে। ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে স্মৃতি, বুদ্ধি, উদ্বিগ্নতা ও প্রণোদনা। কোনো মানুষের ভাষাগত ভ্রান্তি আসলে এ ধরনের মানসিক কোনো সমস্যার প্রতিফলন হিসেবেই প্রকাশিত হয়। মনোভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান, কারণ মনোভাষাবিজ্ঞান ও স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান উভয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে মানব মস্তিষ্ক। বিভিন্ন প্রকার ভাষাগত পশ্চাদপরতা (Language disorder), স্মৃতির অবনতি সেগুলি মনোভাষাবিজ্ঞানের পাশাপাশি স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানেরও বিষয়।

স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান : ভাষার সঙ্গে মানবমস্তিষ্কের সম্পর্ক এবং ভাষাব্যবহারগত সমস্যা—এই দুই-ই স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত অসুস্থ মানুষের ভাষা ব্যবহারের সমস্যা এবং স্নায়ুবিক বিক্ষোভের চর্চায় ভাষাব্যবস্থায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের পৃথক দায়িত্ব এবং মস্তিষ্ক বিকাশের সঙ্গে ভাষাগত দক্ষতার সম্পর্ক নিয়ে বহু অজানা বিষয় নিত্যনতুন গবেষণায় জানা যাচ্ছে। পরোক্ষভাবে মস্তিষ্ক কীভাবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ভাষার প্রয়োগ করে তাও বুঝতে পারা যায় স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের দৌলতে। প্রযুক্তিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফাংশনাল নিউরো-ইমেজিং বা ব্যবহারিক স্নায়ুচিত্রণে আজকাল Positron Emission Tomography (PET) বা Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) জাতীয় তন্ত্রের ব্যবহার হয়। এই সমস্ত আধুনিক যন্ত্রের কল্যাণে ভাষাবিজ্ঞানের এই শাখাটি প্রতিদিনই বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে পল ব্রোকা অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি অফ পারি-তে এক রোগীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন যিনি একুশ বছর ‘তাল’ ধ্বনি ছাড়া কিছুই উচ্চারণ করতে পারতেন না। এই মানুষটির চিকিৎসা প্রসঙ্গেই ক্রমে জানা গেল ভাষাসিদ্ধ যুক্তিক্রম, পরিকল্পনা, আত্মপ্রকাশ, বাচিক সৃজন ক্ষমতা তথা ভাষার মৌলিক বিষয়গুলি, অর্থাৎ অনুভব ও জ্ঞান আহরণ, বলা, পড়া, লেখা— সবই মস্তিষ্কেরই বিভিন্ন অংশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।

এই চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভাষা ও সংযোগস্থাপনে মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে ভাষায় কথা বলি তার সঙ্গে কি মস্তিষ্কের কোনো সম্পর্ক আছে? মানুষের ভাষার প্রকৃতি এবং গঠনগত বৈশিষ্ট্যই বা কী? কীভাবেই বা ভাষা আমাদের মস্তিষ্কে অনুভূত হয়? ভাষার সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ আজকাল গবেষণার বিশেষ বিষয় হয়ে উঠেছে। ভাষার সৃষ্টিতে, প্রয়োগে এবং সংযোগ স্থাপনে মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে নানা ধারাবাহিক গবেষণায় মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে শাখায় মানবশরীরে ভাষার প্রকৃতি ও গঠনগত অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান (Neuro linguistics) বলে। স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান আসলে বৌদ্ধিক স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানেরই একটি শাখাবিশেষ। আজকের বিজ্ঞানীরা একমত যে মানুষের মস্তিষ্কের বামগোলার্ধের সুনির্দিষ্ট স্নায়ুর গঠন ভাষা এবং কথার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান শুধুমাত্র ভাষা নিয়েই চর্চা বা গবেষণা করে না তার সঙ্গে ভাষার ব্যবস্থাগত (Systemic), চলন (movement), ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (Sensory) এবং কোশীয় (Cellular) এবং অন্যান্য নানা বৃহত্তর শাখার সাথে সম্পৃক্ত। স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। ভাষা শেখা (Language acquisition) এবং প্রক্রিয়াকরণ (Processing)

২। ভাষাগত সমস্যার সংস্কার (Language inpairment)

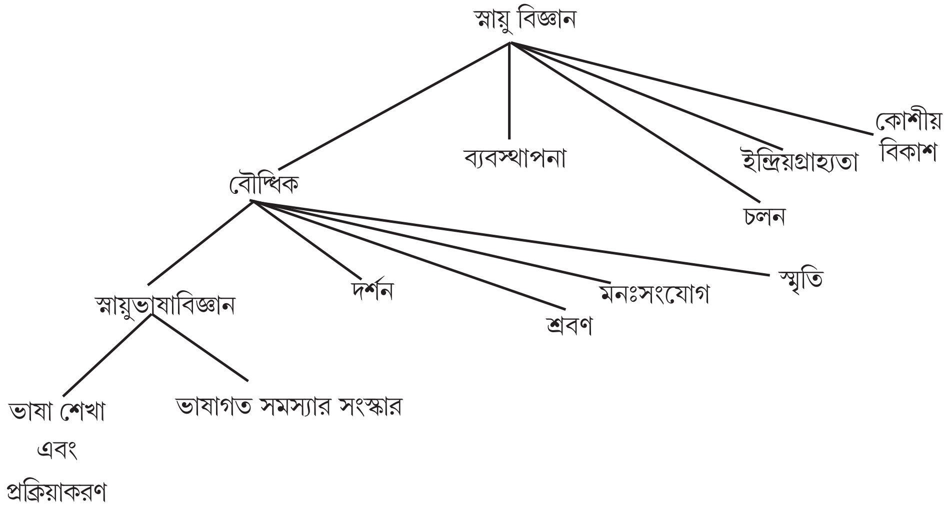

মস্তিষ্ক কীভাবে আমাদের ভাষা এবং কথার বিকাশে সাহায্য করে তা নিয়ে নানা গবেষণা আছে। মস্তিষ্ক ভাষায় এন-কোডিং এবং ডি-কোডিং নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনেই হয়। এ ব্যাপারে মস্তিষ্কের থ্যালামাস বেসাল গ্যাংলিয়া ও ধূসর বস্তু Grey Matter অঞ্চল বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

স্নায়ুবিজ্ঞানের ধারাবাহিক চর্চার মধ্যে দিয়ে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। ভাষার সৃষ্টি, প্রয়োগ এবং তার সংস্কারের নানাদিক নিয়ে ধারাবাহিক চর্চার অবকাশ রয়েছে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানে।

নৃভাষাবিজ্ঞান : ভাষার উৎপত্তি ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে আজও রহস্যে ঢাকা। মানুষের বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার উৎপত্তি ও তার বিবর্তন ঘটেছে। ভাষার গঠনের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির যোগ আছে, যোগ আছে সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গেও। প্রতিটি সভ্যতা তাদের নিজের মতো করে ব্যবহার্য জিনিসকে চিহ্নিত করে। এর ফলে ভাষার মধ্যে সৃষ্টি হয় নানা বৈচিত্র্য। উদাহরণ হিসবে দেখানো যায় যে পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকে ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার শব্দসংখ্যা বেশি। এর থেকে বোঝা যায় যে অন্যান্য সংস্কৃতির চেয়ে বাঙালি সংস্কৃতিতে পারিবারিক সম্পর্ক মূল অনেক বেশি গভীর।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আদিবাসী মানুষগুলির ভাষা এখন প্রায় মৃত্যুর পথে। ভাষার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে যাবে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীর বিভিন্ন লোককথা-ছড়া-ধাঁধা, বিভিন্ন সংস্কার তার সভ্যতার বিশাল জগৎটি। এইসব আদিবাসী ভাষাকে সংরক্ষণ করে রাখা আসলে ভাষার মাধ্যমে তাঁদের সভ্যতাকেই সংরক্ষণ করে রাখা।

পৃথিবীতে এমন অনেক ভাষা আছে যাদের কোনো লিপি নেই। সেইসব ভাষাও যে আলোচনা ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে তা ভাষাবিজ্ঞান বুঝতে পেরেছে নৃতত্ত্বের সংস্পর্শে এসে। পৃথিবীর এই আদিম জনজাতির ভাষার বিশ্লেষণে ভাষাবিজ্ঞান মনোযোগ দিয়েছে বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে। মুখের ভাষায় তথ্য সংগ্রহ ও বিচারবিশ্লেষণ তখন থেকে গুরুত্ব পেতে

থাকে। এর ফলে ভাষাবিজ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে এবং ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। নৃতত্ত্বের সঙ্গে মেলবন্ধনের ফলেই ভাষাবিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে কোনো ভাষা উন্নত বা অনুন্নত বা মিষ্টি বা কর্কশ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, সব ভাষাই সমান ও গুরুত্বপূর্ণ।

শৈলী বিজ্ঞান : মানুষের মনের ভাব প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু এই 'ভাষার মাধ্যমে' বলতে বোঝায় ভাষার বিশিষ্টতা। ভাষার এই বিশিষ্টতার আলোচনায় ভাষার রূপ বা form অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই form বা রূপ আসলে লেখকের লেখার শৈলীর ওপর নির্ভর করে। কোনো লেখকের লেখার এই শৈলী বিশ্লেষণকেই আসলে Stylistics বা শৈলী বিজ্ঞান বলা হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে শৈলী বিজ্ঞানের নিরিখ হল প্রয়োগ নির্ভর। অর্থাৎ কোনো লেখক বা সাহিত্যিকের পাঠবস্তু বা Text এবং সেই Text-এর প্রয়োগ রীতি এবং কৌশলই একমাত্র বিবেচ্য। শৈলীবিজ্ঞানের দিক থেকে লিখন শৈলীর বিচার হলো Objective বা নৈর্ব্যক্তিক বিচার। কোনো Text বা পাঠবস্তুর গোড়ার কথা হলো ভাষারীতি। স্যামুয়েল ওয়েসলি (Samuel Wesley) একেই বলেছেন 'চিন্তার পোশাক' বা 'the dress of thought'। এর মানে কোনো একজন লেখক তার চিন্তাভাবনাকে যে ভাবে সাজিয়ে ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

Style বা শৈলী বিভিন্ন রকমের হলেও, প্রথাগত ভাবে একে দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমটি Evaluative বা মূল্যায়নভিত্তিক, আর দ্বিতীয়টি Descriptive বা বর্ণনামূলক। মূল্যায়নভিত্তিক শৈলী আসলে কোনো লেখার শৈলীর বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রকাশ। অন্যদিকে বর্ণনামূলক শৈলী হল কোনো লেখকের লেখার শৈলীর বিবরণ বা বর্ণনা। প্রথমটি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লিখন শৈলীর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। দ্বিতীয়টির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের সঙ্গে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের শৈলীর তফাত সূচিত করা যেতে পারে।

ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর ভাষার নানা উপাদান (ধ্বনি, রূপ বা শব্দাংশ, বাক্য ইত্যাদি) এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের মূল সংবিধি, ভাষার বিভিন্ন উপাদান ও উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের জালবিন্যাসকে নাম দিয়েছিলেন লাঙ্ (Langue) পারোল (Parole) হল সেই সংবিধিকে মান্য করেও ভাষা ব্যবহারের উপাদান নির্বাচন ও প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব একটি বিন্যাসে স্পষ্ট ও প্রকট বাচনক্রিয়া। এই যে বহুবিন্যাসের সম্ভাবনার মধ্যে একটি সম্ভাবনাকে বেছে নেওয়া—এইটিই শৈলীর গোড়ার কথা। সেই অর্থে শৈলীর বিষয়টি পারোলের এক্তিয়ারেই চলে আসবে।

আগের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় শৈলীর মূলে রয়েছে রচনাকারের নির্বাচন। শৈলীকে সচরাচর যে মতাদর্শগুলির আলোয় দেখা হয় সেগুলিকে পর্যালোচনা করলে এই কথাটিই প্রমাণ হয়। 'স্টাইল হল প্রচলিত আদর্শ থেকে বিচ্যুতি' কিংবা 'স্টাইল হল এক ধরনের বিন্যাসের পুনরাবৃত্তি বা সমাহার, কিংবা স্টাইল হল ব্যাকরণের সম্ভাবনার বিশেষ নিষ্কাশন'—উক্তিগুলির মধ্যে সর্বত্রই রচয়িতার নির্বাচনের প্রক্রিয়াটির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে মুহূর্তে রচনার পরিণামী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি হয়, তখনই এসে পড়ে নির্বাচনের প্রসঙ্গ। ভাষাবিজ্ঞানী মিলিচ একে বলেছেন 'rhetorical choice' বা আলংকারিক নির্বাচন। যেমন 'চোখের ডাক্তার' আর 'অক্ষিচিকিৎসক' শব্দ দুটি হুবহু সমার্থক নয়। দুটি শব্দের ব্যবহারে আমাদের দু-রকম প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে মাত্রাভেদ থাকে। নির্বাচন এই কারণেই এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই নির্বাচনেরও নিজস্ব কিছু থাকে। ভাষিক উপাদান ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা এবং প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য ও ক্ষেত্রের পার্থক্যই লেখকভেদে অথবা ভিন্ন সময়ে একই লেখকের লেখায় স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। এই স্বাতন্ত্র্য তথা শৈলীবিচারে সংখ্যাতত্ত্ব একটি বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। কোনো পাঠবস্তুতে বিভিন্ন নামপদের সংখ্যাগত প্রাধান্য, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশেষণের অনুপাত, দীর্ঘ ও হ্রস্ব বাক্যের অনুপাত, পুনরুক্তির ব্যবহার, আতিশয্যমূলক শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এক একজন লেখকের বিশিষ্ট শৈলী তথা সেই রচয়িতার মনের গহীন সৃজনশীল প্রদেশটি সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ অনুসন্ধান করা সম্ভব।

তাই শৈলী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো লেখকের লেখার বাক্যগঠন ও শব্দ প্রয়োগের ভিন্নতা যেমন আলোচ্য ঠিক তেমনি লেখক ভেদে বাক্যবিন্যাস বাক্যগঠন এবং শব্দ প্রয়োগের বিভিন্নতা বিচার্য। শৈলী বিচার করার ক্ষেত্রে যে প্রকরণ বা toolগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল ১. foregrounding বা প্রমুখন, ২. deviation বা বিচ্যুতি, ৩. Parallelism বা সমান্তরালতা, ৪. Code Switching বা কোডবদল বা সংকেতবদল এবং ৫. Polyphony বা বহুস্বরতা বা বহুধ্বনিময়তা।

প্রমুখন ও বিসারণের প্রযুক্তিদুটি পরস্পরের সম্পূরক। রচয়িতা ভাষা আদর্শের হেরফের ঘটিয়ে বিচ্যুতির মাধ্যমেই নিজের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলেন। বিচ্যুতি বা বিসারণ হতে পারে বাক্যের অধিগঠন এবং আধোগঠন—দুই স্তরেই। শব্দগত (lexical), অন্বয়গত (syntactical), শব্দার্থগত (semamtic) এবং ব্যাকরণগত (grammatical) বিচ্যুতির সফল প্রয়োগই শৈলীর স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে। সমান্তরালতা শৈলীর একটি বিশিষ্ট দিক। একটি ভাষারীতির মধ্যে অন্যরীতির শব্দ বা বাক্যখণ্ড ব্যবহারকে কোড বদল বা সংকেত বদল বলে। বাংলা বলতে বলতে ইংরেজি শব্দ বা বাক্যখণ্ড ব্যবহার, এক উপভাষায় কথন বা উক্তির মধ্যে অন্য উপভাষার প্রয়োগ— প্রভৃতিকে কোডবদলের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। উপন্যাস বা মহাকাব্য ও অন্যান্য আখ্যানে বহু শ্রেণির বহুবিচিত্র স্বভাবের, অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ থেকে আগত বহু চরিত্রের সমাগম ঘটে। এই ভাবেই চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বরকে প্রতিষ্ঠা করে এবং এই স্বরগুলির জটিল বিন্যাসে গ্রথিত হয় উপন্যাস বা মহাকাব্যের কথাবিশ্ব। মিখাইল বাখতিন এই বিষয়টিকেই 'বহুস্বরিতা' আখ্যা দিয়েছেন। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে তাঁর এই তত্ত্বটিকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়।

অভিধান বিজ্ঞান : ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল অভিধান বিজ্ঞান (Lexicography)। অভিধান রচনার ধারায় যথেষ্টই প্রাচীন। যাস্কের 'নিরুক্ত' থেকেই ভারতে অভিধান রচনার সূত্রপাত। অভিধান রচনার ধারায় পৃথিবীর সব দেশেই বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'অভিধান' বোঝাতে জন গারল্যান্ড প্রথম 'Dictionarius' শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৫৩৮ সালে ইংরেজি 'Dictionary' শব্দটি পাওয়া যায় স্যর থমাস এলিয়েটের ল্যাটিন-ইংরেজি অভিধানে।

আধুনিককালে ভাষাবিজ্ঞানীরা শুধু প্রাচীন ধারায় অভিধান রচনা উত্তরাধিকারকে অনুসরণ না করে অভিধান রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকেন। অভিধানকে আমরা ভাষাবিজ্ঞানের একটি সংযোগমূলক বিভাগ (Liaison Divison) বলতে পারি। কারণ অভিধানে ভাষার প্রকাশগত দিক এবং বিষয়গত দিকের মধ্যে অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সংযোগ ব্যাখ্যা করে। এছাড়াও, শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ ও ব্যুৎপত্তির উল্লেখ বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আধুনিককালে যুক্ত হয়েছে শব্দের মান্য উচ্চারণ, শব্দের আঞ্চলিক ও উপভাষাগত পার্থক্য, প্রসঙ্গ অনুসারে অর্থ পার্থক্য, সময়ের সঙ্গে শব্দের অর্থ পরিবর্তন ইত্যাদি। অভিধান ক্রমশ নিজের মধ্যে প্রসারিত করে চলেছে।

ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে আদর্শ অভিধানে প্রতিটি entry বা শব্দের তিন স্তর থাকবে — ১. শব্দের গঠনগত স্তর, ২. অন্বয়গত স্তর এবং ৩. বাগার্থগত স্তর। তৃতীয় স্তরটি অভিধানের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অভিধান অনেকরকম হয়। তার মধ্যে অতি পরিচিত হল একভাষিক ও দ্বিভাষিক অভিধান। যেখানে এক ভাষার শব্দকে সেই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করা হয়, তা হল একভাষিক অভিধান। যেমন, বাংলা থেকে বাংলা, ইংরেজি থেকে ইংরেজি। যখন এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা দ্বিভাষিক অভিধান। যখন কোনো অভিধানে একটি শব্দের প্রথম প্রচলনের সময়, প্রথম প্রচলনের সময়ে তার কী অর্থ ছিল, কীভাবে অর্থ বদল গঠন, সাম্প্রতিকতম রূপ বা অর্থ কী—এই সব থাকে, তখন তাকে ইতিহাসভিত্তিক অভিধান বলা হয়। যেমন— The Shorter Oxford English Dictionary। এছাড়াও আরেক রকমের অভিধান হল বিষয়-অভিধান যেখানে কোনো বিষয়ের নানা কিছু অভিধানের মতো করে সাজানো ও ব্যাখ্যা করা থাকে। যেমন ইতিহাস অভিধান, অর্থনীতির অভিধান, উদ্ভিদবিদ্যার অভিধান ইত্যাদি।

ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই শাখাগুলি বিচ্ছিন্ন তো নয়ই, বরং একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কিত। মনোভাষাবিজ্ঞান ও স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান যেমন ব্যক্তিমানুষের ভাষাপ্রকাশের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি সমাজভাষাবিজ্ঞান এবং নৃভাষাবিজ্ঞান সমাজ ও গোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভাষার সঙ্গে শব্দ ও স্টাইলের সম্পর্ক থেকেই অভিধানবিজ্ঞান ও শৈলীর সঙ্গে সামগ্রিক ভাষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক। নীচে একটি ছকের মাধ্যমে এই সম্পর্কটি দেখানো যায় :

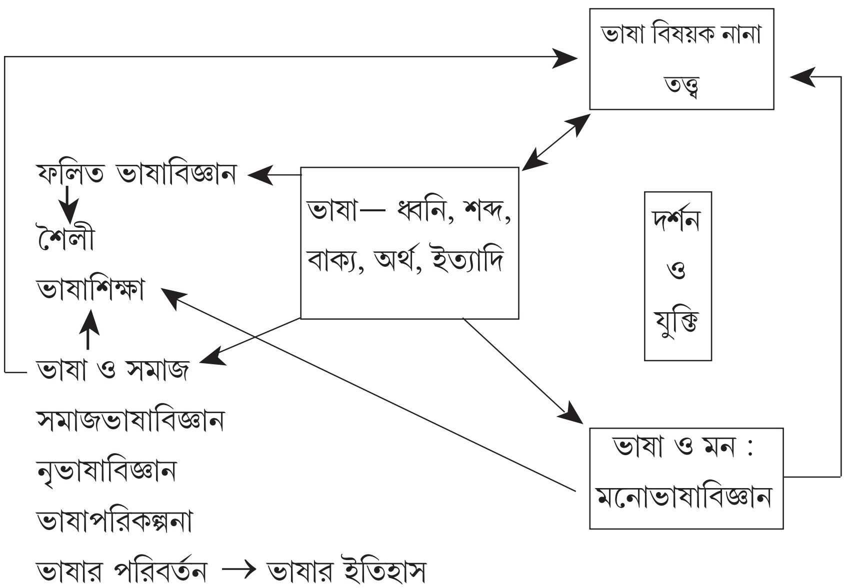

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব

ভূমিকা

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা হয়, তাকেই ধ্বনিতত্ত্ব বলে। তাহলে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় যে 'ধ্বনি' সেই ধ্বনি বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আগে সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমরা ইংরেজিতে Sound বলতে যা বুঝি বাংলায় ধ্বনি বলতে তাই বোঝায়। পাখির কলতান, হাততালির শব্দ, বংশীধ্বনি থেকে শুরু করে মানুষের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি—সবই Sound বা ধ্বনি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে এই সব-রকমের ধ্বনি বা Sound আলোচ্য নয়, মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিই শুধু আলোচ্য। হাসি, কান্না, হাঁচি, নাকডাকা, ভয়ের চিৎকার অথবা বৃষ্টির শব্দ, ঝড়ের আওয়াজ, গাড়ির হর্ণ, কুকুরের ডাক ইত্যাদি কিন্তু ধ্বনি বলে গণ্য নয়। সমস্ত আওয়াজ যে বাগধ্বনি নয় এবং কোন ধ্বনিগুলি ভাষার ঠিক কোন্‌খানটায় বাগধ্বনি হয়ে ওঠে সেগুলো নিয়েই এখনকার আলোচনা।

আমরা যখন লিখি তখন বর্ণ ব্যবহার করি। বর্ণ জুড়ে জুড়ে শব্দ তৈরি করে, শব্দ জুড়ে জুড়ে বাক্য তৈরি করে, বাক্য জুড়ে জুড়ে অনুচ্ছেদ তৈরি করে যতটা প্রয়োজন ততটা লিখি। ধ্বনিতত্ত্ব কিন্তু বর্ণ বা লেখার ব্যাপার নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বাগ্‌ধ্বনি, অর্থাৎ মুখের ভাষা বা মুখের কথা। কথা বলার সময়ে আমরা ধ্বনি জুড়ে জুড়ে শব্দ উচ্চারণ করি, শব্দ জুড়ে জুড়ে বাক্য উচ্চারণ করি। বাক্য জুড়ে জুড়ে যতটা দরকার ততটা কথা বলি। অন্যের কথায় কোথায় শব্দের শেষ আর কোথায়ই বা বাক্য শেষ তা কিন্তু কানে শুনেই বুঝি। ধ্বনি, শব্দ বা পদ ইত্যাদি হল ভাষা শরীরের এক-একটি স্তর। সবচেয়ে নীচে ধ্বনিস্তর, তার ওপরে রূপস্তর, তার ওপরে পদ, তার ওপরে বাক্যস্তর, আরও আছে অর্থের স্তর। ভাষার ধ্বনিস্তর নিয়ে আলোচনার নাম ধ্বনিতত্ত্ব। এখানে বাগ্‌ধ্বনি সম্বন্ধে তিনটে জরুরি কথা মনে রাখা দরকার।

(১) কথা বলার সময়ে আমরা অবিচ্ছিন্নভাবে পর পর ধ্বনি উচ্চারণ করে কথা বলি। একটি ধ্বনির শেষ ও পরের ধ্বনিটির শুরুর সীমায় কোনো ছেদ থাকে না। ফলে পাশাপাশি ধ্বনির উচ্চারণ সদাসর্বদাই পরস্পরকে প্রভাবিত করে। যেমন 'পাঁচ শো টাকা' কথাটা মুখের উচ্চারণে হয়ে যায় 'পাঁশ্‌শো টাকা'। কিন্তু ব্যাকরণে ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণের সময়ে, বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যে, প্রতিটি ধ্বনিকে আলাদা আলাদা খণ্ড একক হিসেব ধরে নেওয়া হয়। অতএব আমরা মনে রাখব যে যদিও ধ্বনিখণ্ডের চেয়ে ধ্বনিপ্রবাহের বাস্তবতা অনেক বেশি তবুও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণের গণ্ডিতে আমরা খণ্ডধ্বনিকেই গুরুত্ব দেবো। খণ্ডধ্বনির নাম **বিভাজ্যধ্বনি**।

(২) বাগ্‌ধ্বনি জুড়ে জুড়ে রূপ-শব্দ-বাক্যের মতো অর্থপূর্ণ বড়ো বড়ো একক তৈরি হলেও বাগ্‌ধ্বনির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। 'চোখের জল' কথাটা শুনলে পুরো কথাটির মানে বুঝি, 'চোখের' ও 'জল'—এই দুটো কথার মানেও বুঝি, আবার 'চোখের' কথাটির মানে যে 'চোখ' কথাটার চেয়ে বেশি কিছু, অর্থাৎ ওই শেষে যোগ হওয়া 'এর' অংশটিরও যে একটা নিজস্ব মানে আছে তাও বুঝি। কিন্তু চ্‌ ও খ্‌ এ র্‌ জ্‌ অ ল্‌—এই আটটি ধ্বনির কোনোটিরই নিজস্ব কোনো মানে নেই। অতএব মনে রাখতে হবে যে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য একক বাগ্‌ধ্বনি হল ভাষার অর্থহীন এবং ক্ষুদ্রতম একক। আবার এও মনে রাখতে হবে অর্থহীন হলেও ভাষার মানে তৈরির এলাকায় এর ভূমিকা অপরিসীম।

(৩) আমরা ধ্বনি উচ্চারণ করে মুখে যা বলি তা বাংলা লিপির বর্ণ ব্যবহার করে লিখেও ফেলি। কিন্তু এই ধ্বনি ও বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্কটা খুব সরল নয়। একটি ধ্বনির জন্যে লেখায় অনেক সময়তেই একাধিক বর্ণ ব্যবহার করি। যেমন—মুখে উচ্চারণ করি একটি 'শ', কিন্তু লেখায় ব্যবহার করি তিনটি আলাদা আলাদা বর্ণ— স্‌, শ্‌, ষ্‌। 'শেষ' বা 'সরষে'-র উচ্চারণে সব কটিই 'শ', অর্থাৎ শ, ষ, শ উচ্চারণে এক। আবার একটি বর্ণের জন্যে উচ্চারণে একাধিক ধ্বনি ব্যবহার করি। যেমন— 'অতি' কথাটার উচ্চারণ 'ওতি', 'অপু' হলো 'ওপু'। পরি, নতুন, তরু যথাক্রমে পোরি, নোতুন,

তোরু। তুলনায় 'অনেক', অত, 'কত', 'বড়ো' ইত্যাদি শব্দ কিন্তু 'অ' দিয়েই উচ্চারণ হয়, 'ও' দিয়ে নয়। এরকম আরোও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাংলায় বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে সম্পর্ক সহজ নয়।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় :

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল একটি নির্দিষ্ট ভাষার বাগ্‌ধ্বনির ব্যবহারিক চরিত্র। এখানে 'ব্যবহারিক' কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাবিজ্ঞানের দুটি শাখায় বাগ্‌ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হয়— ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনিবিজ্ঞান বাগ্‌ধ্বনির উচ্চারণগত, শ্রুতিগত ও ধ্বনিতরঙ্গগত বিশ্লেষণ করে। আর ধ্বনিতত্ত্ব একটি ভাষার বাগ্‌ধ্বনিগুলি সেই ভাষায় কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা বিশ্লেষণ করে। যেমন 'প্' ধ্বনিটি ধ্বনিবিজ্ঞানের হিসেবে উচ্চারণগতভাবে স্পৃষ্ট, সঘোষ, অল্পপ্রাণ, ওষ্ঠ্য ধ্বনি। আর ধ্বনিতত্ত্বের হিসেবে 'প্' ধ্বনিটিকে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে জানতে হবে কোন্ ভাষার 'প' ধ্বনি সেটি। ভাষাটি জানা জরুরি কারণ ধ্বনিতত্ত্বে সেই নির্দিষ্ট ভাষায় 'প' ধ্বনির ব্যবহারিক চরিত্র বিশ্লেষণ করা হবে। যেমন বাংলা 'প' ধ্বনির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে খবরগুলি দিতে হবে তা হলো 'প্' বাংলার একটি ধ্বনিমূল, এটি শব্দের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য তিনটি অবস্থানেই উচ্চারিত হয় ও 'স্', 'র্', 'ল্'-এর সঙ্গে 'প্' যুক্তধ্বনি তৈরি করতে পারে। এ ছাড়াও ধ্বনিপ্রবাহে 'প্'-এর কী কী পরিবর্তন হয় তারও উল্লেখ থাকবে। ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনার ধরনের তফাতটা নীচের চিত্রে দেখানো হল।

বাগ্‌ধ্বনি প্রধানত দু-ধরনের— **বিভাজ্যধ্বনি** ও **অবিভাজ্যধ্বনি**। বিভাজ্যধ্বনির দুটি মূল ভাগ— স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। অবিভাজ্যধ্বনির মধ্যে পড়ে দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত, যতি ও সুরতরঙ্গ।

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

আন্তর্জাতিকভাবে ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক স্বরধ্বনি বা Cardinal vowels হল বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আকৃতি বুঝিয়ে দেবার মানদণ্ড। অধ্যাপক জোন্‌স্ মৌলিক স্বরধনিকে 'Scales of Cardinal Vowels' বলেছেন। ধ্বনিবিজ্ঞানী অ্যাবারক্রম্বে কে অনুসরণে বলা যায়—বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য মুখের ভিতরের শূন্যস্থানে ভাষাবিজ্ঞানীরা যে-সব কাল্পনিক মাপকাঠি করেছেন তাদের বিভিন্ন পরিমাপ-নির্দেশক বিন্দু থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলিকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে।

মৌলিক স্বরধ্বনির মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আকৃতি যেমন নির্দেশ করা যায় তেমনি মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনায় বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ ও বর্গীকরণও করা যায়। এবং এইভাবেই আমরা বাংলা স্বরধ্বনিগুলির মধ্য থেকে 7 টি স্বরধ্বনি পেলাম যা মান্য বাংলা স্ববধ্বনি হিসাবে চিহ্নিত। পরের পৃষ্ঠায় মৌলিক স্বরধ্বনির চিত্রে বাংলা স্বরধ্বনিগুলিকে বসিয়ে বাংলা স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান ও শ্রেণিবিভাগগুলি করলাম—

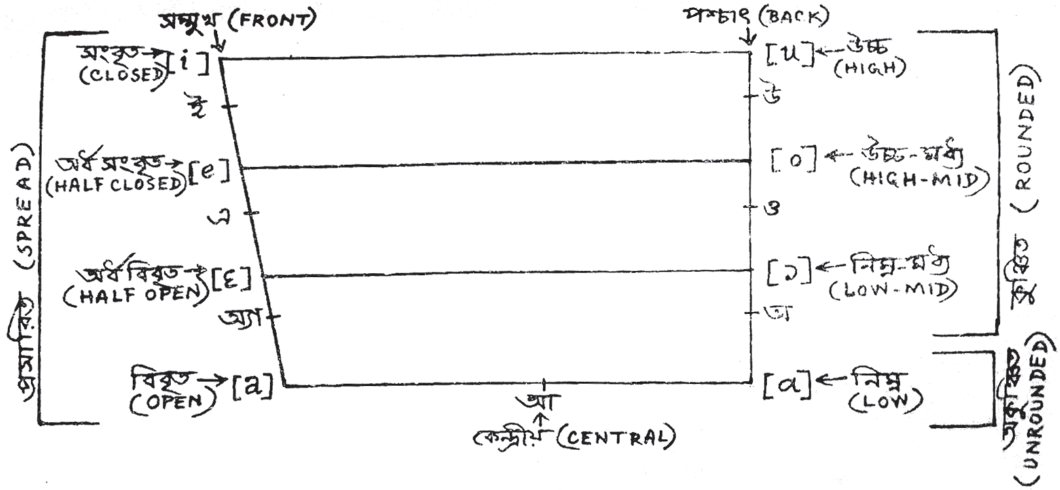

মান্য বাংলার স্বরধ্বনি ৭টির বিবরণ ও ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় এমন কয়েকটি করে শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল।

ই — উচ্চ, সম্মুখ, প্রসৃত, সংবৃত, তালব্য : ইলিশ, রীতিনীতি, ইত্যাদি।

উ — উচ্চ, পশ্চাৎ, বর্তুল, সংবৃত, কণ্ঠ : বুদ্ধ, আলু, ভীমরুল।

এ — উচ্চমধ্য, সম্মুখ, প্রসৃত, অর্ধ সংবৃত, তালব্য : এদিকে, কে, ধনে।

ও — উচ্চমধ্য, পশ্চাৎ, বর্তুল, অর্ধ সংবৃত, কণ্ঠ : অতি, তরু, চোখ, মন।

অ্যা — নিম্নমধ্য, সম্মুখ, প্রসৃত, অর্ধ বিবৃত, তালব্য : এক, এখন, কেন।

অ — নিম্নমধ্য, পশ্চাৎ, বর্তুল, অর্ধ বিবৃত, তালব্য : অনেক, অল্প, কমল।

আ — নিম্ন, কেন্দ্রীয়, বিবৃত : আম, নাম, কেনা।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি : ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। ৪টি অর্ধস্বরধ্বনি ও আছে বাংলা ভাষায়।

উচ্চারণ স্থান→ উচ্চারণ প্রকার↓	ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	মূর্ধণ্য	তালব্য	কণ্ঠ্য	কণ্ঠনালীয়
অঘোষ অল্পপ্রাণ	প্	ত্		ট্	চ্	ক্	
অঘোষ মহাপ্রাণ	ফ্	থ্		ঠ্	ছ্	খ্	
ঘোষ অল্পপ্রাণ	ব্	দ্		ড্	জ্	গ্	
ঘোষ মহাপ্রাণ	ভ্	ধ্		ঢ্	ঝ্	ঘ্	
উষ্মধ্বনি			স্	ষ্	শ্		হ্
নাসিক্যধ্বনি	ম্		ন্	ণ্	ঞ	ঙ্	
কম্পিতধ্বনি			র্				
তাড়িত অল্পপ্রাণ				ড়্			
তাড়িত মহাপ্রাণ				ঢ়্			
পার্শ্বিক ধ্বনি			ল্				

সংক্ষেপে আমরা কতকগুলি বিষয় জেনে নিই —

স্পর্শ ধ্বনি — ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনি।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি — বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিগুলি। যথা — ক্‌গ্, চ্‌জ্, ট্‌ড্, ত্‌দ্, প্‌ব্।

মহাপ্রাণ ধ্বনি — বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিগুলি। যথা — খ্‌ঘ্, ছ্‌ঝ্, ঠ্‌ঢ্, থ্‌ধ্, ফ্‌ভ্।

অঘোষ ধ্বনি — বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিগুলি। যথা — ক্‌খ্, চ্‌ছ্, ট্‌ঠ্, ত্‌থ্, প্‌ফ্।

ঘোষ ধ্বনি — বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিগুলি। যথা — গ্‌ঘ্, জ্‌ঝ্, ড্‌ঢ্, দ্‌ধ্, ব্‌ভ্।

নাসিক্য ধ্বনি — প্রত্যেক বর্গের পঞ্চম ধ্বনিগুলি। যথা — ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

উষ্মধ্বনি — শ্, ষ্, স্, হ্।

কম্পিত ধ্বনি — র্।

তাড়িত ধ্বনি — ড়্, ঢ়্।

পার্শ্বিক ধ্বনি — ল্।

৩০টি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্ ও ঢ়্-এর অস্তিত্ব নিয়ে বির্তক আছে। বাংলা শব্দে স্ শুধুমাত্র যুক্তধ্বনিতে উচ্চারিত হয়, একক ব্যঞ্জন হিসেবে বিদেশি শব্দে এর উচ্চারণ থাকলেও (যেমন সিনেমা) বাংলা শব্দে নেই। খুব পরিশীলিত উচ্চারণ ছাড়া ঢ়্ ও ড়্ -এর উচ্চারণে তফাত হয় না, দুটোই ড়্ হয়ে যায়। আবার অনেকের উচ্চারণেই র্, ড়্ ও ঢ়্ তিনটি ধ্বনির উচ্চারণই র্ হয়ে যায়। বাংলা উচ্চারণে চারটি অর্ধস্বরধ্বনি আছে। এগুলির জন্য বাংলার কোনো বর্ণ নির্দিষ্ট নেই। খই, বউ, আয়, যাও— এই চারটি শব্দ যে যে অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনির উচ্চারণে শেষ হয় সেই চারটি অর্ধস্বর, যদিও বাংলা অর্ধস্বর নিয়েও বিতর্ক আছে।

ধ্বনিমূল ও সহধ্বনি

ধ্বনিতত্ত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল ধ্বনিমূল ও সহধ্বনি। বাংলা বলার সময়ে আমরা যতগুলি ধ্বনি উচ্চারণ করি সবকটিকেই সাধারণভাবে ধ্বনি বলা হলেও ভাষায় আসলে এগুলি দু-ধরনের ভূমিকা পালন করে— ধ্বনিমূলের বা সহধ্বনির। ধ্বনিতত্ত্বের রীতি মান্য করে আমরা ধ্বনিমূলকে দুটি বাঁকা দাগের মধ্যে, যেমন—/ক/ এবং সহধ্বনি ও ধ্বনিকে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে, যেমন— [স] লিখব। দুটো শব্দ দিয়ে বোঝানো যাক—'লংকা' ও 'উলটো'। শব্দ দুটি কানে শুনে মুখে উচ্চারণ করো। এবার মন দিয়ে দ্যাখো দুটো শব্দের 'ল্' উচ্চারণ করার সময়ে জিভের আগাটা ওপরে তালুতে ঠিক কোনখানে ঠেকছে। এক জায়গায় নয়, তাই তো? লংকা-র ল-এ জিভ ওপরের পাটির সামনের দাঁতের পিছনের মাড়ির পিছনে বা দন্তমূলে ঠেকছে; আর উলটো-র ল আরো একটু পিছনে, যেখানে ট্ উচ্চারণ হচ্ছে সেখানেই ল্-ও উচ্চারণ হচ্ছে। (নিজে উচ্চারণ করে না দেখলে কিন্তু এই তফাত বোঝা যাবে না।) অতএব বাংলায় ল্-এর দু-রকম উচ্চারণ ভেদ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা বর্ণে লিখে এই তফাত দেখানো যাবে না। তাই কিছু কাজ-চালানো চিহ্ন জুড়ে বোঝানো যাক। লংকা-র ল্ হলো দন্তমূলীয় [ল্]। উলটো-র ল্ যেহেতু মূর্ধন্যধ্বনি ট্-এর উচ্চারণস্থানে উচ্চারিত তাই একে বলা যাক মূর্ধণ্য ল্। যেহেতু মূর্ধণ্য ল্-এর উচ্চারণে জিভ পিছিয়ে যায় তাই ল্-এর বাঁদিকে একটা তিরচিহ্ন দিয়ে একে লেখা যাক [←ল্]। এবার উচ্চারণ করো 'আলতা'। এই ল্-তে জিভ কোথায় ঠেকছে? সামনের পাটির দাঁতের পিছনে, যেখানে ত্ উচ্চারণ হচ্ছে ঠিক সেখানে। অর্থাৎ ল্-এর উচ্চারণের তৃতীয় বৈচিত্র্য পাওয়া যাচ্ছে। এটিকে বলা যাক দন্ত্য ল্ এবং এটির উচ্চারণে জিভ এগিয়ে যাচ্ছে তাই ল্-এর ডান পাশে তিরচিহ্ন জুড়ে একটি চিহ্ন তৈরি করা যাক— [ল্→]। বাংলা ল্-এর এই তিন রকম উচ্চারণভেদকে ধ্বনিতত্ত্বের ভাষায়

নীচের মতো করে প্রকাশ করা হয়।

বাংলা /ল্/ — [←ল্]
— [ল্→]
— [ল্]

অর্থাৎ প্রতিবেশ বিশেষে বাংলা / ল্ /-এর তিন রকম উচ্চারণ হয়। /ল্/-কে বলে ধ্বনিমূল এবং এর তিন রকম উচ্চারণভেদকে বলে সহধ্বনি। /ল্/ বলার সময়ে বাস্তবে আমরা উচ্চারণ করি /ল্/-এর তিনটি সহধ্বনির যে-কোনো একটি। তবে যেটিই উচ্চারণ করি না কেন আমরা জানি যে আমাদের টার্গেট বা লক্ষ্য হল মূলধ্বনি/ল্/। সহধ্বনির উচ্চারণ প্রতিবেশ নির্ভর। প্রতিবেশ-নির্ভর বলতে বোঝায় উচ্চারণ প্রবাহে আগের বা পরের কোনো ধ্বনির প্রভাবে কোনো ধ্বনিমূলের একটি নির্দিষ্ট সহধ্বনির উচ্চারিত হওয়া। যেমন— ঠিক পরেই মূর্ধণ্যধ্বনি থাকায় তার প্রভাবে মূর্ধণ্য [←ল্] সহধ্বনিটি উচ্চারণ হয় বা ঠিক পরেই দন্ত্যধ্বনি থাকলে দন্ত্য [ল্→] উচ্চারণ হয়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশে দন্তমূলীয় [ল্] উচ্চারণ হয়। নির্দিষ্ট প্রতিবেশে নির্দিষ্ট সহধ্বনিটিই উচ্চারিত হয়, অন্য কোনোটি নয়। অর্থাৎ মূর্ধণ্য [←ল্] দিয়ে আলতা, বা দন্ত্য দিয়ে উলটো, বা এ দুটির কোনো একটি দিয়ে লংকা উচ্চারণ করা যাবেই না। সহধ্বনির এই অপরিবর্তনীয় প্রতিবেশে অবস্থানকে বলা হয় পরিপূরক অবস্থান।

ধ্বনিমূল না সহধ্বনি ঃ ধ্বনিতত্ত্বের অন্যতম দায়িত্ব হল ভাষায় উচ্চারিত বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিমূল ও সহধ্বনি শনাক্ত করা। সূক্ষ্মভাবে বলতে হয় কোন্ ধ্বনিটি কোন্ ধ্বনিমূল পরিবারের সহধ্বনি তা শনাক্ত করা। এই কাজের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। এখানে খুব সংক্ষেপে তিনটি উল্লেখ করা হল।

(ক) ন্যূনতম শব্দজোড়— ওপরে উল্লেখ করা ‘জাল’ ও ‘জাম’-এর মতো শব্দজোড়কে, যেখানে দুটি ভিন্ন শব্দের মধ্যে উচ্চারণের ন্যূনতম পার্থক্য বর্তমান, ন্যূনতম শব্দজোড় বলা হয়। ন্যূনতম শব্দজোড়ের পৃথক ধ্বনি দুটিকে ভাষায় দুটি পৃথক ধ্বনিমূল বলে শনাক্ত করা হয়। অর্থাৎ ন্যূনতম শব্দজোড়ে উচ্চারিত দুটি ধ্বনি ভাষার দুটি পৃথক ধ্বনিমূল। যেমন— তালা-থালা, নরম-গরম, দশক-দমক, দরগা-দরজা, ঝুল-ঝোল, তিল-তেল, ভালো-কালো, দাম-দান —এই আটটি ন্যূনতম শব্দজোড়ের ভিত্তিতে যথাক্রমে / ত্ /-/ থ্ /,/ ন্ / -গ্, / শ্ / - / ম্ /,/ গ্ / - / জ্ /, / উ / - / ও /, / ই / - / এ , / ভ্ /- / ক্ /, / ম্ / - / ন্ / —এই ধ্বনিগুলিকে বাংলার ধ্বনিমূল বলে শনাক্ত করা যায়। ন্যূনতম শব্দজোড়ে পৃথক ধ্বনিগুলির অবস্থানকে, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হয়ে মানে বদলে দিচ্ছে, এই রকম অবস্থানকে বলা হয় পার্থক্যমূলক অবস্থান।

(খ) পরিপূরক অবস্থান— উচ্চারণগতভাবে মিল আছে এমন যে ধ্বনিগুলি নিজেদের নির্দিষ্ট প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হয় না, অর্থাৎ পরিপূরক অবস্থানে থাকে, সেই ধ্বনিগুলি কোনো একটি ধ্বনিমূলের সহধ্বনি হিসেবে শনাক্ত হয়। যেমন ওপরে উল্লিখিত তিন ধরনের / ল্ /।

বাংলায় / স্ / ও / শ্ / এর অবস্থান লক্ষ করলে দেখা যাবে বাংলা শব্দে [স্] সদা-সর্বদাই যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম সদস্য হিসেবে / প্ /, / ফ্ /, / ত্ /, / থ্ /, / ক্ /, / খ্ /, / ম্ /, /ন্ /, / র্ /, / ল্ / —এর সঙ্গে উচ্চারিত হয়। যেমন— স্পর্শ, স্ফটিক, স্তব, স্থান, স্কন্ধ, স্খলিত, স্মিত, স্নাত, শ্রী, শ্লীল ইত্যাদি। এই প্রতিবেশগুলিতে [শ্] কখনো উচ্চারিত হয় না। আর এই প্রতিবেশগুলি ছাড়া সর্বত্রই [শ্] উচ্চারিত হয়, [স্] নয়। অর্থাৎ বাংলা শব্দের নিরিখে [স্] ও [শ্] ধ্বনি দুটি পরিপূরক অবস্থানে উচ্চারিত হয়। অতএব এই দুটি ধ্বনি একই ধ্বনিমূলের সহধ্বনি হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু যদি বাংলায় মিশে যাওয়া

অসংখ্য ইংরেজি ঋণশব্দের দিকে তাকাই তখন দেখা যাবে যে যুক্তব্যঞ্জন ছাড়াও অন্যান্য প্রতিবেশেও [স্] উচ্চারিত হচ্ছে। সিনেমা, সী-ফিশ, সেকেন্ড, সান-সেট, প্লাস, মাইনাস ইত্যাদি। এই রকম আরও অনেক শব্দই তো বাংলাভাষারই অঙ্গ হয়ে গেছে। এগুলিকে ধরে বিচার করলে ধ্বনিমূল শনাক্তকরণের পদ্ধতি অনুসারে (এই পদ্ধতি পাঠক্রমের অংশ নয় বলে এখানে উল্লেখ করা হয়নি) / স্ / ও / শ্ / দুটি পৃথক ধ্বনিমূল বলেই গণ্য হবে। এই কারণেই বাংলায় / স্ / ধ্বনিমূলের অস্তিত্ব ঘিরে বির্তক রয়েছে।

(গ) কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি ধ্বনি পার্থক্যমূলক অবস্থানে রয়েছে, আপাতবিচারে ন্যূনতম শব্দজোড়ের মতো, কিন্তু জোড়ের শব্দ দুটির মধ্যে অর্থের কোনো পার্থক্য নেই। যেমন, 'গাঢ়' শব্দটা কারো উচ্চারণে গাঢ়, আবার কারো উচ্চারণে গাড়। এই তফাতের ওপর প্রতিবেশের কোনো প্রভাব নেই। বরং এটি অভ্যাস বা সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন খুশি উচ্চারণ। এই রকম উচ্চারণভেদকে বলে ধ্বনির **মুক্ত বৈচিত্র্য**। এই মুক্ত বৈচিত্র্যের ধ্বনিগুলিও ভাষায় সহধ্বনি বলে গণ্য। বাংলায় [ঢ়] -কে ঘিরে বিতর্কটা হল এটি কারো উচ্চারণে ধ্বনিমূল, আবার কারো উচ্চারণে [ড়] -এর সহধ্বনি।

ধ্বনিমূলের অবস্থান ও সমাবেশ

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে ধ্বনিমূলের অবস্থান ও সমাবেশ। অবস্থান বলতে বোঝায় একটি ধ্বনিমূল শব্দে কোন্ কোন্ অংশে ও কোন্ কোন্ ধ্বনি প্রতিবেশে উচ্চারিত হতে পারে তার খবর। আর সমাবেশ বলতে বোঝায় একটি ধ্বনিমূল আর কোনো কোনো ধ্বনিমূলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যুক্তধ্বনি তৈরি করতে পারে তার খবর।

ধ্বনিমূলের অবস্থান ঃ শব্দের নানা অংশ। শব্দ শুরুর মুখটা হল আদ্য, শব্দের একেবারে শেষ অংশটা হল অন্ত্য, বাকি অংশটুকু মধ্য, দুটি স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী অংশ হল স্বরমধ্যগত প্রতিবেশ ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতিবেশ, অর্থাৎ আলোচ্য ধ্বনিমূলটির ঠিক পূর্ববর্তী বা ঠিক পরবর্তী ধ্বনিটি কী? অন্যভাবে বলা যায়, আলোচ্য ধ্বনিমূলটি কোন্ কোন্ ধ্বনির পরে বা কোন্ কোন্ ধ্বনির আগে উচ্চারিত হতে পারে।

ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিমূল শনাক্তকরণের পাশাপাশি সেই ধ্বনিমূলটি কোন্ কোন্ অবস্থানে উচ্চারিত হয় সে খবরও দিতে হয়। যেমন — বাংলা স্বরধ্বনি [ই, উ, ও, ও, আ] শব্দের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য সব অবস্থানেই উচ্চারিত হয়। কিন্তু [অ্যা] এবং [অ] শব্দান্তে কখনোই উচ্চারিত হয় না। আবার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির মধ্যে [ঙ্], [ড়] ও [ঢ়] কখনোই শব্দের আদ্য অবস্থানে উচ্চারিত হয় না। [ড্] ও [ঢ্] শব্দের অন্ত্য অবস্থানে উচ্চারিত হয় না। এছাড়া বাকি ধ্বনিমূলগুলি শব্দে আদ্য, মধ্য, অন্ত্য ও স্বরমধ্যগত অবস্থানে উচ্চারিত হয়। পূর্বে উল্লেখিত বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পাশে দেওয়া শব্দতালিকায় ধ্বনিমূলগুলির বিভিন্ন অবস্থানে উচ্চারণের উদাহরণও দেওয়া আছে।

কোন্ প্রতিবেশে কোন্ ধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে বা পারে না সে খবর পাওয়া যাবে ধ্বনির সমাবেশ থেকে।

ধ্বনির সমাবেশ : বিভিন্ন ধ্বনির সমাবেশের ফলে বিভিন্ন ধরনের যুগ্মধ্বনি তৈরি হয়। স্বরধ্বনির সঙ্গে অর্ধস্বরের সমাবেশে তৈরি হয় দ্বিস্বরধ্বনি। অর্ধস্বরের জন্যে কোনো বর্ণ নির্দিষ্ট নেই। তাই উচ্চ ও উচ্চমধ্য চারটি অর্ধস্বরকে বোঝাবার জন্যে এগুলির পালটি স্বরধ্বনিতে হসন্ত চিহ্ন তৈরি করে নেওয়া হল। স্বরধ্বনির সঙ্গে এই চারটি অর্ধস্বরের সমাবেশে বিভিন্ন দ্বিস্বরধ্বনি তৈরি হয়। এইরকম চারটি দ্বিস্বরধ্বনি হল [ওউ্], [ওই্], [অএ্], [অও্] যেমন উচ্চারিত হয় যথাক্রমে মৌ, কই, হয় ও হও শব্দে।

ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি সমাবেশে দু-ধরনের যুগ্মধ্বনি তৈরি হয়— গুচ্ছধ্বনি ও যুক্তধ্বনি। বাংলায় যে-কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যে-কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশ ঘটে না। এক্ষেত্রে যথেষ্ট বিধিনিষেধ দেখা যায়। তবে গুচ্ছধ্বনির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের মাত্রা কম, ফলে সমাবেশের সংখ্যা অনেক বেশি। অপরপক্ষে যুক্তধ্বনির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের মাত্রা অনেক বেশি হওয়ায় সমাবেশের সংখ্যা অনেক কম।

গুচ্ছধ্বনি : পাশাপাশি উচ্চারিত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশকে গুচ্ছধ্বনি বলে। যাদের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি নেই। এই দুই ব্যঞ্জনের মাঝে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলেও দলসীমা থাকে, অর্থাৎ দুটি ব্যঞ্জনের প্রথমটি পূর্ববর্তী দলের ও শেষেরটি পরবর্তী দলের অংশ বলে গণ্য হয়। গুচ্ছধ্বনির সমাবেশ যুক্তধ্বনির তুলনায় বেশ আলগা কারণ এখানে ধ্বনির গুচ্ছটি ভেঙে দুটি ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যায়। যেমন, উত্তর শব্দটিতে পাশাপাশি দুটি [ত্] উচ্চারিত হয়ে একটি গুচ্ছধ্বনি তৈরি করলেও আসলে দুটি [ত্] দুটি পৃথক দল বা সিলেবলের অন্তর্ভুক্ত। সেই রকমই পাওয়া যায় নিশ্বাস, বস্তা, অক্ষয়, শঙ্কা, দেখতে, করছি—এই গুচ্ছধ্বনিগুলি। গুচ্ছধ্বনি শব্দের অভ্যন্তরে থাকে, সীমানায় নয়।

বাংলায় দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে তৈরি গুচ্ছধ্বনির সংখ্যা ২০০টির বেশি।

তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশেও গুচ্ছধ্বনি তৈরি হয়। যেমন— অস্ত্র ও যন্ত্র শব্দে। তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে তৈরি গুচ্ছধ্বনির তৃতীয় ব্যঞ্জনটি সদাসর্বদাই [র্] এবং বাংলায় এরকম গুচ্ছধ্বনির সংখ্যা ৮টি।

চারটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে তৈরি গুচ্ছধ্বনি বাংলায় মাত্র ১টি ক্ষেত্রে, তা হল 'সংস্কৃত' শব্দটি।

যুক্তধ্বনি : যে ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশগুলি শব্দের আদ্য অবস্থানে বা দলের আদিতে উচ্চারিত হতে পারে সেগুলিকে যুক্তধ্বনি বলে। যুক্তধ্বনির সমাবেশ গুচ্ছধ্বনির তুলনায় বেশি পাকাপোক্ত কারণ এই ধ্বনিগুলির মাঝে কোনো দলসীমা থাকে না। দুই ব্যঞ্জন সমাবেশের যুক্তধ্বনিতে হয় প্রথম ব্যঞ্জনটি [স্], নয়তো দ্বিতীয় ব্যঞ্জনটি [র্] বা [ল্] হয়। বাংলা শব্দে এই রকম যুক্তধ্বনির সংখ্যা ২৮টি। কয়েকটি হল— প্র, ত্র, তৃ, ধ্র, স্প, স্ফ যেমন পাওয়া যায় প্রাণ, ত্রাণ, তৃণ, ধ্রুব, স্পষ্ট, স্ফীতি ইত্যাদি শব্দে। যুক্তধ্বনিগুলিকে বাংলা বর্ণে লিখে দেখানো যায়, কিন্তু গুচ্ছধ্বনিকে সব ক্ষেত্রে বর্ণে লেখা যায় না। বাংলায় অন্য ভাষা, প্রধানত ইংরেজি থেকে আগত ঋণশব্দে আরও ১৮টি যুক্তধ্বনি পাওয়া যায়। কয়েকটি হল ফ্র, ফ্ল, ট্র ইত্যাদি, যেমন পাওয়া যায় ফ্রাই, ফ্ল্যাট, ট্রাম ইত্যাদি শব্দে। শব্দের অন্তেও কয়েকটি যুক্তধ্বনি উচ্চারিত হয়, তবে সে রকম সব শব্দই ঋণশব্দ, বাংলার নিজস্ব শব্দ নয়। যেমন— ট্যাক্স, ব্যাংক, দোস্ত ইত্যাদি।

তিন ব্যঞ্জনের সমাবেশে তৈরি যুক্তধ্বনির সংখ্যা ২টি, স্ত্র ও স্পৃ যেমন পাওয়া যায় স্ত্রী, স্পৃহা ইত্যাদি শব্দে।

অবিভাজ্য ধ্বনি

বিভাজ্য ধ্বনিকে মুখের কথার ধ্বনিপ্রবাহ থেকে কৃত্রিমভাবে হলেও খণ্ড খণ্ড করে বিভাজন করা যায়। যেমন— তুমি কথাটার উচ্চারণের খণ্ডগুলি হলো ত্+উ+ম্+ই। কিন্তু ভাষায় আরো কিছু ধ্বনি উপাদান থাকে যেগুলিকে এই রকম কৃত্রিমভাবেও খণ্ড করা যায় না। কারণ এই রকম উপাদানগুলি কোনো বিভাজ্যধ্বনির অংশ নয়, বরং এগুলি একাধিক ধ্বনিখণ্ড জুড়ে অবস্থান করে। এগুলিকে অবিভাজ্য ধ্বনি বলে। বাংলাতেও এই রকম কয়েকটা অবিভাজ্য ধ্বনি আছে। তবে বাংলায় এই অবিভাজ্য ধ্বনিগুলির উপস্থিতির কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয় না। তাই এগুলি বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিমূলের ভূমিকা পালন করে না, যদিও এগুলি মুখের ভাষার অপরিহার্য অংশ। মুখের কথায় এগুলি ঠিক জায়গায় ঠিক মতো না থাকলে বাংলাকে বাংলা বলে চেনা যাবে না। নীচে কয়েকটি অবিভাজ্য ধ্বনির পরিচয় দেওয়া হল।

শ্বাসাঘাত : শ্বাসাঘাত হল একাধিক দলযুক্ত শব্দের কোনো একটি দলকে অপেক্ষাকৃত বেশি জোর দিয়ে উচ্চারণ করা। বাংলায় সাধারণত শব্দের প্রথম দলটিতে শ্বাসাঘাতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যান্ত্রিক নিরীক্ষাতেও প্রথম দলে শ্বাসাঘাতের উপস্থিতি দেখা যায়। শ্বাসাঘাতের উপস্থিতি পুরো দল জুড়ে, কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনিতে নয়। তাই এটি অবিভাজ্য ধ্বনি। যেমন— মাখন, আরতি, লোকবল, শব্দের প্রথম দল মা, আ, লোক, শব-এর ওপর শ্বাসাঘাত পড়ে। (-চিহ্ন দিয়ে শ্বাসাঘাত দেখানো হয়েছে।)

দৈর্ঘ্য : দৈর্ঘ্য বলতে সাধারণত বোঝায় দলের উচ্চারণে স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য। বাংলায় বহুদল শব্দের স্বরধ্বনির তুলনায় একদল শব্দের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য বেশি, ফলে একদল শব্দের দৈর্ঘ্যও বেশি। যেমন— 'আমার' শব্দের [আ] -এর চেয়ে 'আম' শব্দের [আ] বেশি দীর্ঘ।

যতি : যতি হল দল বা শব্দসীমায় অপেক্ষাকৃত লম্বা ছেদ। যেমন, 'রহিম একা দশজনকে চ্যালেঞ্জ করেছে' এবং 'রহিম একাদশজনকে চ্যালেঞ্জ করেছে'। প্রথম বাক্যে 'একা' শব্দ উচ্চারণের পরে আমরা যতি ব্যবহার করি, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে 'একাদশজনকে' যতি ছাড়াই উচ্চারণ করি।

সুরতরঙ্গ : বাক্যে সুরের ওঠাপড়াকে সুরতরঙ্গ বলে। যেমন— বিবৃতিবাক্য 'মিঠু কাল স্কুল যাবে'। এবং প্রশ্নবাক্য 'মিঠু কাল স্কুলে যাবে ?' এই দুটি বাক্যের উচ্চারণে সুরের ওঠাপড়া দু-রকমের। অর্থাৎ এই দু-ধরনের বাক্যে আমরা নীচের মতো দু-রকমের সুরতরঙ্গ ব্যবহার করি।

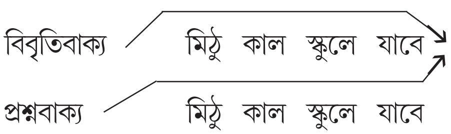

তৃতীয় অধ্যায়

শব্দার্থতত্ত্ব

শব্দার্থতত্ত্বের একমাত্র আলোচ্য বিষয় মানবভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের অর্থ বা মানে এবং তার কার্যক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে 'অর্থ' বা 'শব্দার্থ' বলতে কী বোঝায় তা জানা দরকার। সাধারণত শব্দার্থ বলতে আমরা বুঝি তা হল এক শব্দের সঙ্গে আরেক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সম্পর্ক। অবশ্য ভাষাতত্ত্বে এবং শব্দার্থতত্ত্বে একটি শব্দ কেবলমাত্র একটি অর্থ ছাড়া অন্য কিছু অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। শব্দার্থতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় 'শব্দার্থ' কথাটির বিভিন্ন ব্যবহার এবং তা বিশ্লেষণের নানা পদ্ধতি নিয়ে এই অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হবে। কিন্তু তার আগে নিত্যব্যবহৃত সাধারণ ভাষায় 'মানে' বা 'অর্থ' কথাটি যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার কিছু নমুনা নীচে দেওয়া হল। যেমন,

''মেঘ মানেই বৃষ্টি''

''পরীক্ষায় ভালো ফল মানেই বড়ো চাকরি''

''ঘনাদা মানেই দারুণ আড্ডা''

''জীবনের অর্থ কী ?''

''এসবের মানে কী ?'' (রাগের সঙ্গে)

উপরের উদাহরণগুলির কোনোটিতেই ''অর্থ'' বা ''মানে'' কথাটি শব্দার্থের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কোনোটিতে ইঙ্গিত বোঝাচ্ছে (মেঘ-বৃষ্টি), কেনোটিতে বোঝাচ্ছে কার্যকারণ সম্পর্ক (ভালো ফল-চাকরি), কোনোটিতে বোঝাচ্ছে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য (ঘনাদা-আড্ডা), কোনোটি দার্শনিক চিন্তা (জীবনের অর্থ) আবার কোনোটি আবেগ প্রকাশের রূপ (ক্রোধান্বিত বচন)।

প্রতিদিনের ব্যবহৃত সাধারণ ভাষায় 'অর্থের' বা 'মানে'র এই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের আলোচনা কৌতুহলোদ্দীপক হতে পারে। ভাষাচর্চার কোনো কোনো শাখায় একই শব্দের ব্যবহার ভাষাতত্ত্বের শব্দার্থতত্ত্বের অংশ নয়। শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্র কেবলমাত্র ভাষার কোনো অংশের অর্থের আলোচনায় সীমাবদ্ধ।

এখানে খেয়াল রাখা দরকার যে পরিভাষাটি ''শব্দার্থতত্ত্ব'' হলেও এর আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র শব্দের অর্থের আলোচনার মধ্যে সীমিত নয়। মানুষের ব্যবহৃত ভাষার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ যে-কোনো অর্থযুক্ত অংশই এই আলোচনার মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শব্দের অর্থ-ও যেমন পড়ে, তেমনই এই বিষয়ের অন্তর্গত কোনো বাক্যের অর্থ বা বহু বাক্য সম্মিলিত কোনো বচনের বা উক্তির অর্থের আলোচনাও পড়ে। মানবভাষায় উচ্চারিত অর্থযুক্ত যে-কোনো উচ্চারণের অর্থের নিয়মানুগ বিশ্লেষণ এই বিষয়ের অন্তর্গত।

শব্দার্থের সংজ্ঞা এবং তার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের বিভিন্ন মতামত আছে। এ সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে প্রধানত শব্দার্থকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর প্রথমটিকে বলা হয় সাধারণ অর্থ এবং দ্বিতীয়টি— নিদর্শন। অভিধানে আমরা যেভাবে অর্থকে পাই তা প্রথম প্রকার, অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর মতে এটি-ই প্রকৃত অর্থ,বাংলায় এর জন্য কোনো আলাদা প্রতিশব্দ নেই। একে সাধারণভাবে অর্থ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই ক্ষেত্রে 'অর্থ' শব্দটি এক শব্দের সাথে অপর এক বা একাধিক শব্দের সম্পর্ককে বোঝায়। অভিধানে শব্দের অর্থ এইভাবেই সাজানো থাকে। অভিধানে মুখ্যশব্দগুলির (headwords) পাশে তাদের অর্থ হিসাবে দেওয়া থাকে আরও কিছু শব্দ বা শব্দসমষ্টি।

যেমন—

আকাশ - গগন, অন্তরিক্ষ, ব্যোম, শূন্য।

বিড়াল - ইঁদুর-শিকারে দক্ষ চতুষ্পদ প্রাণী, মার্জার।

শব্দার্থতত্ত্বে 'অর্থ' প্রধানত এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাষার প্রতিটি শব্দের অর্থ থাকে। 'শব্দার্থ'-এর অপর একটি

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এটি হল একটি শব্দ এবং সেই শব্দ যে বস্তুকে নির্দেশ করে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। যেমন উপরোক্ত শব্দগুলির (আকাশ, বিড়াল) অর্থ বোঝাতে গেলে সেই বস্তুগুলির দিকে নির্দেশ করা যেতে পারে। অর্থের এই ধারণাটিও গুরুত্বপূর্ণ এবং শব্দার্থতত্ত্বে বহু ব্যবহৃত। তবে সাধারণ ভাষায় প্রতিটি শব্দের নির্দেশন নাও থাকতে পারে। যেমন 'কোনো', 'এবং', 'এতএব' এই শব্দগুলির অর্থ থাকলেও নির্দেশন নেই।

আমরা এখানে স্বতন্ত্র শব্দগুলির অর্থের বিশ্লেষণ এবং এক শব্দের সঙ্গে অপর শব্দের অর্থভিত্তিক সম্পর্ক অর্থাৎ শব্দভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। এছাড়া প্রয়োগতত্ত্ব ও শব্দার্থের পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শব্দার্থকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা যায়—

সমার্থকতা, বিপরীতার্থকতা, ব্যাপকার্থকতা

সমার্থকতা : সমার্থকতা শব্দটি অর্থের অভিন্নতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য থাকলে শব্দগুলিকে সমার্থক শব্দ বলা হয়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে অভিধানে শব্দগুলি সমার্থকতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। এখানে এক শব্দ অপরের সমার্থক। নীচে কিছু সমার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল —

ঘোড়া : অশ্ব, ঘোটক	**আনন্দ :** হর্ষ, হরষ, পুলক
মা : জননী, মাতা	**পর্বত :** শৈল, গিরি
ঝগড়া : দ্বন্দ্ব, বিরোধ	**নদী :** তটিনী, তরঙ্গিনী
চোখ : চক্ষু, নয়ন	**ছেলে :** পুত্র, তনয়, সুত, আত্মজ
সূর্য : রবি, দিবাকর	**পাখি :** পক্ষী, খেচর, বিহঙ্গ

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার দুটি শব্দের অর্থ কখনও সম্পূর্ণ এক হয় না। উপরের উদাহরণের দুটি শব্দের অর্থ অনুরূপ হলেও হুবহু এক বলা যায় না। সমার্থক শব্দগুলির মধ্যেও খুব সামান্য হলেও পার্থক্য থাকে। উপরোক্ত শব্দগুলির মধ্যে ভাষার প্রকারে পার্থক্য দেখা যায়। বাঁদিকের স্তম্ভের শব্দগুলি চলিত কথ্যভাষার অন্তর্গত। ডান দিকের স্তম্ভের শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত আনুষ্ঠানিক বা কাব্যিক ভাষার অংশ। সুতরাং শব্দগুলি সমার্থক হলেও তাদের মধ্যে ব্যবহারিক দিক দিয়ে পার্থক্য থাকবে। সব ক্ষেত্রে একটি শব্দের বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

এছাড়া অনেকসময় দেখা যায় সমার্থক শব্দগুলি আলাদা উপভাষার অংশ, যেমন—

নৌকা – নাও	বিড়াল – মেকুর
কুড়ি – বিশ	কাকা – চাচা
জল – পানি	ঈশ্বর – আল্লাহ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সম অর্থের শব্দগুলি সব প্রসঙ্গে সমার্থক নয়। যেমন 'অপূর্ব' শব্দের সমার্থক শব্দ 'অদ্ভুত, আশ্চর্য, অলৌকিক, অপরূপ, অভিনব, বিস্ময়কর' ইত্যাদি। কিন্তু নীচের একই বাক্যে এর ব্যবহার দেখলে বোঝা যাবে যে তা সমার্থক বাক্য তৈরি করছে না।

এ তো অপূর্ব ব্যাপার! এ তো আশ্চর্য ব্যাপার! এ তো অদ্ভুত ব্যাপার!

প্রথম বাক্যটিতে 'অপূর্ব' শব্দের ব্যবহারের অর্থ প্রশংসাসূচক বলে মনে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'আশ্চর্য' শব্দটির ব্যবহার কিছুটা বিরক্তিসূচক। তৃতীয় বাক্যটিতে 'অদ্ভুত' শব্দের ব্যবহার কিছুটা বিস্ময়সূচক হতে পারে। চতুর্থ বাক্যটিতে 'অলৌকিক' শব্দের ব্যবহার 'অবিশ্বাস্য' বা 'অবাস্তব' অর্থে হতে পারে।

বিপরীতার্থকতা : দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে অর্থের বৈপরীত্য থাকলে তাদের বিপরীতার্থক শব্দ বলা হয়। বাংলায় অনেক সময় নেতিবাচক উপসর্গ যোগ করে বিপরীতার্থক সব্দ সৃষ্টি করা যায়। যেমন,

আবশ্যক – অনাবশ্যক	ইচ্ছুক – অনিচ্ছুক
বৃষ্টি – অনাবৃষ্টি	শান্তি – অশান্তি
কারণ – অকারণ	আত্মীয় – অনাত্মীয়
অভিজ্ঞ – অনভিজ্ঞ	আবাদী – অনাবাদী
আগত – অনাগত	আর্য – অনার্য

আবার অনেক ক্ষেত্রে একটি শব্দের শুরুতে ইতিবাচক এবং তার বিপরীত শব্দের শুরুতে নেতিবাচক উপসর্গ বসে বৈপরীত্য তৈরি করে।

সক্ষম – অক্ষম	সবল – দুর্বল
সকর্মক – অকর্মক	সঠিক – বেঠিক
সচল – অচল	সসীম – অসীম

এছাড়া স্বতন্ত্র বিপরীত অর্থের শব্দের মাধ্যমেও বৈপরীত্য তৈরি হয়। যেমন,

অগ্রজ – অনুজ	ভালো – মন্দ
অতীত – ভবিষ্যৎ	আলো – আঁধার
আর্দ্র – শুষ্ক	উত্তর – দক্ষিণ
দুরন্ত – শান্ত	কঠিন – সোজা
সুখ – দুঃখ	

ব্যপকার্থকতা বা অর্থান্তরভুক্তি : এক্ষেত্রে একটি শব্দের অর্থ অপর শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি শব্দের অর্থ ব্যাপকতর হয়, যখন তার মধ্যে অন্য এক বা একাধিক শব্দের অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন,

আসবাবপত্র – টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি ইত্যাদি

রং – লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কমলা ইত্যাদি

ফুল – গোলাপ, জুঁই, পদ্ম, টগর, জবা ইত্যাদি

ফল – আম, জাম, কাঠাল, কুল, পেয়ারা ইত্যাদি

জন্তু বা জানোয়ার – হাতি, বাঘ, শেয়াল, হরিণ, কুকুর, ছাগল ইত্যাদি

পাখি – কাক, চড়ুই, ময়ূর, টিয়া, দোয়েল, কোকিল ইত্যাদি

উপরের উদাহরণগুলিতে বাঁদিকে স্তম্ভের শব্দগুলির অর্থ ব্যাপকতর এবং ডানদিকের শব্দগুলির অর্থ বাঁদিকের শব্দগুলির অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বাঁদিকের শব্দগুলিকে অধিনাম এবং ডানদিকের শব্দগুলিকে উপনাম বলা হয়। অন্তর্ভুক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় পার্থক্য দেখা যেতে পারে। যেমন 'আলু' শব্দটিকে বাংলা এবং আরও বিভিন্ন ভাষায় তরকারি বা সবজি অধিনামের উপনাম হিসাবে ধরা হয়, কিন্তু জার্মান ভাষায় এটি ফলের অধিনাম হিসাবে স্বীকৃত।

থিসরাস : শব্দার্থের এই বিশাল জগৎকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যাস করার একটি নিদর্শন হল থিসরাস। 'থিসরাস' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো রত্নাগার। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'অমর কোষ' এর উদাহরণ। ১৮০৫ সালে পিটার মার্ক রজেট এই ধরনের অভিধান রচনা করলেন এবং ১৮৫২ সালে তা প্রকাশিত হল। এই 'রজেটের থিসরাস'ই প্রথম আধুনিক থিসরাস। রজেট যাবতীয় শব্দকে অর্থ অনুযায়ী কতকগুলি গুচ্ছে ভাগ করেছিলেন। ধরা যাক, আমি খুঁজছি apple শব্দটা। আমার মাথায়

ফলটা থাকলেও নামটা মনে করতে পারছি না। সেক্ষেত্রে থিসরাসে 'fruits' গুচ্ছের মধ্যে অনায়াসেই পাওয়া যাবে apple শব্দটা। অর্থাৎ থিসরাস অভিধানের মতো শব্দের অর্থ বলেই ক্ষান্ত হয় না বা শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকে না। থিসরাস এমন একটা রেফারেন্স বই যেখানে কাছাকাছি অর্থের শব্দগুলি (সমার্থক হতে পারে, আবার বিপরীতার্থকও হতে পারে) একটি গুচ্ছের মধ্যে থাকে। apple, orange, banana ইত্যাদি শব্দগুলি সেক্ষেত্রে চলে আসবে 'fruits' গুচ্ছের মধ্যে। এর ফলে সহজ হয়ে যাবে কোনো শব্দ খোঁজা বা তার সম্বন্ধে কোনো ধারণা তৈরি করা। রজেটের ভাষায় থিসরাস সাহায্য করে "to find the word, or words, by which idea may be most fitly and aptly expressed." (Thesaurus of English Language Words and Phrases 1852)।

প্রয়োগতত্ত্ব : সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার ভাষার অর্থের উপর যে প্রভাব ফেলে তার আলোচনা হয় প্রয়োগতত্ত্বে। কেবলমাত্র ভাষা-ই নয়, আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু বচনের অর্থ নির্মাণে সাহায্য করে প্রয়োগতত্ত্ব। বচনের শ্রোতা সেই অনুষঙ্গের সাহায্যে বচনের অর্থ আত্মস্থ করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের সাহায্য ছাড়া অর্থ নির্মাণ অসম্ভব হয়ে যায়।

"আমি তোমাকে যেতে বলেছি, তোমাকে নয়।"

উপরের উক্তিটিতে বক্তা একজনকে যেতে বলেছেন এবং অপরজনকে থাকতে বলছেন। কিন্তু কাকে কোনটা বলছেন তা ভাষা ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিগোচর ইঙ্গিত, যেমন অঙ্গুলি নির্দেশন ইত্যাদির সাহায্য ছাড়া বোঝা অসম্ভব। অতএব কেবলমাত্র ভাষার বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্তিটির অর্থ বোঝা সম্ভব নয়।

"কটা বাজে?"

"রবি তো বাড়ি এসে গেছে।"

উপরোক্ত কথোপকথনে প্রশ্নের সাথে উত্তরের আপাত যোগাযোগ কেবলমাত্র ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা অসম্ভব। কেবল ভাষা দেখলে প্রশ্ন এবং উত্তরের কোনো যোগাযোগ নেই বলেই মনে হবে। কিন্তু এই ধরনের কথোপকথন সাধারণ ভাষায় প্রায়শই শোনা যায়। কারণ এই ক্ষেত্রে বক্তা এবং শ্রোতা কিছু সাধারণ বিষয় অবগত থাকার ফলে উক্তির অর্থ নির্ধারণ সম্ভব হয়। উপরের উদাহরণে বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই জানেন রবি কখন আসে, তাই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে "রবি এসে গেছে" যথার্থই অর্থপূর্ণ।

শব্দার্থের পরিবর্তনের স্বরূপ : সময়ের সাথে ভাষার প্রতিটি বিভাগ পরিবর্তিত হয়। শব্দার্থও এর বাইরে নেই। একই শব্দ সময়ের সাথে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। আবার একই অর্থ বিভিন্ন আলাদা শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পারে। এই পরিবর্তনগুলিকে তিনটি সাধারণ ভাগে ভাগ করা যায়। শব্দার্থের প্রসার, শব্দার্থের সংকোচ ও শব্দার্থের রূপান্তর।

শব্দার্থের প্রসার : সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে যখন কোনো শব্দের পূর্বতন অর্থের সাথে সেই অর্থ ছাড়াও নতুন অর্থ বা অর্থসমষ্টি যোগ হয় তখন তাকে অর্থের প্রসার বলে। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় শব্দটির একটি মূল অর্থ এবং এক বা একাধিক সহযোগী অর্থ থাকে।

যেমন 'কালি' শব্দটির আদি অর্থ ছিল "কালো রঙের তরল বস্তু"। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে লাল, নীল, সবুজ নানা রঙের কালিকে এই শব্দের সাহায্যে বোঝানো হয়। 'কুমোর' শব্দের উৎপত্তি 'কুম্ভকার' শব্দ থেকে, যার অর্থ "যিনি কুম্ভ বা কলসি তৈরি করেন"। কিন্তু কুমোর শুধু কলসিই নয়, মাটির নানা জিনিস তৈরি করেন। 'গাং' শব্দের উৎপত্তি 'গঙ্গা' থেকে। কিন্তু এর অর্থ প্রসার হওয়ায় তা "যে-কোনো" নদী বোঝায়। 'ধনী' শব্দের আদি অর্থ "ধনবান বা বিত্তশালী" এবং পরিবর্তিত অর্থ "সৌভাগ্যবান"। 'পরশু' শব্দটির আদি অর্থ ছিল "আগামীকালের পরে দিন", কিন্তু পরিবর্তিত অর্থ "আগামীকালের পরের দিন এবং গতকালের আগের দিন"।

শব্দার্থের সংকোচ : কোনো কোনো সময় একটি শব্দের আদি অর্থের তুলনায় পরিবর্তিত অর্থের ব্যাপকতা কমে যায়। যেমন 'অন্ন' শব্দের আদি অর্থ ''খাদ্য''। কিন্তু বর্তমান অর্থ এক প্রকার খাদ্য—ভাত। আদি অর্থটি এখনও কিছু শব্দে রয়ে গেছে যেমন, 'মিষ্টান্ন' শব্দের অর্থ ''মিষ্টি খাদ্যবস্তু''। 'মৃগ' শব্দের অর্থ ছিল ''বন্য জন্তু'', যার ফলে 'শাখামৃগ' শব্দের অর্থ ''বানর'', 'মৃগয়া' শব্দের অর্থ ''বন্যপ্রাণী শিকার''। বর্তমানে তার অর্থ সংকোচ হয়ে কেবল ''এক বিশেষ বন্যপ্রাণী'' বা ''হরিণ'' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'মুনিশ' শব্দটির উৎস 'মানুষ' বা 'মনুষ্য' থেকে। এই অর্থের সংকোচন হয়ে বর্তমানে ''মজুর'' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'প্রদীপ' শব্দের আদি অর্থ ''আলো বা দীপ'', বর্তমানে তার অর্থ সংকোচনের ফলে অর্থ এক বিশেষ ধরনের দীপ।

শব্দার্থের রূপান্তর : অনেক সময় শব্দের অর্থের পরিবর্তন এমনভাবে হয় যে আপাতদৃষ্টিতে আদি অর্থের সঙ্গে পরিবর্তিত নতুন অর্থের কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায় না। যেমন 'ভাত' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'প্রাপ্য' খাদ্যের অংশ। 'উজবুক' কথার আদি অর্থ ছিল 'উজবেগ জাতির লোক'। 'সহসা' শব্দের মূল অর্থ ''সবলে''। 'গোষ্ঠী' শব্দের আদি অর্থ ''গবাদি পশুর থাকার জায়গা'' এবং বর্তমান অর্থ ''সমূহ''। 'কলম' শব্দের আদি অর্থ ''শর বা খাগ''। এখন তার অর্থ ''লেখনী''। 'গবেষণা' শব্দের অর্থ ছিল ''গরু খোঁজা''। তার পরিবর্তিত অর্থ ''কোনো বিষয়ে নিয়মানুগ বিশ্লেষণ''। 'দারুণ' শব্দের আদি অর্থ ''দারু বা কাষ্ঠনির্মিত''। পরিবর্তিত অর্থ ''অত্যন্ত''।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে আদি ও পরিবর্তিত অর্থের মধ্যে মিল বিরল হলেও অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস দেখলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ দেখা যায়। যেমন 'দারুণ' শব্দের অর্থ ''কাষ্ঠনির্মিত'', তার থেকে অর্থ প্রসারণের ফলে অর্থ হল ''কাষ্ঠনির্মিত বস্তুর মতো শক্ত'', এর থেকে ''অত্যন্ত শক্ত'', এর পর অর্থ সংকোচের ফলে অপর অর্থ দাঁড়ায় ''অত্যন্ত''। 'সহসা' শব্দের আদি অর্থ ''সবলে''। এবং এর পর অর্থ প্রসারের ফলে অপর অর্থ যোগ হয় — ''সবলে এবং চিন্তাহীনভাবে''। পরে তা আরও প্রসারিত হয়ে দাঁড়ায় ''সবলে এবং চিন্তাহীনভাবে বা আকস্মিকভাবে''। এর পর অর্থ সংকোচের ফলে মূল অর্থগুলি (সবলে এবং চিন্তাহীনভাবে) বিলুপ্ত হয়ে যায়। রয়ে যায় শুধু পরবর্তী নতুন অর্থগুলি।

উপরে উল্লিখিত ধারাগুলি ছাড়া শব্দার্থ পরিবর্তনের আরো দুটি ধারার কথা বলেছেন কেউ কেউ। সেই দুটি হল— শব্দার্থের উৎকর্ষ ও শব্দার্থের অপকর্ষ।

শব্দার্থের উৎকর্ষ — শব্দ যেখানে মূল অর্থ পরিত্যাগ করে উন্নততর অর্থ বহন করে সেখানে শব্দার্থের উৎকর্ষ হয়েছে বলা হয়।

সম্ভ্রান্ত : মূল অর্থ — সম্যক্ ভ্রান্ত, কিন্তু প্রচলিত অর্থ—মর্যাদাসম্পন্ন।

মন্দির : মূল অর্থ —গৃহ, কিন্তু প্রচলিত অর্থ দেবালয়।

শব্দার্থের অপকর্ষ — মূল অর্থ পরিহার করে শব্দ যখন নিম্নমানের অর্থ বহন করে, তখন শব্দার্থের অপকর্ষ হয়।

মহাজন : মূল অর্থ — প্রাচীন পদকার বা ধার্মিক ব্যক্তি, কিন্তু প্রচলিত অর্থ — ঋণদাতা।

ইতর : মূল অর্থ — অন্য, কিন্তু প্রচলিত অর্থ—নীচ।